সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

জয়শ্রী প্রকাশন
কলিকাতা-৪৭

নিবেদন

এই গ্রন্থের প্রথমেই সুভাষচন্দ্রের লেখা একখানি চিঠির অংশ বিশেষের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। তিনি চিঠিখানি লিখেছিলেন ৩১. ৮. ১৯১৫ তারিখে তাঁর বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে। তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। সে সময়েই তিনি নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছিলেন। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি এটা বেশ বুঝিতেছি দিন দিন যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে, তারই জন্য আমার শরীর ধারণ and I am not to drift in the current of popular opinion. লোকে ভালমন্দ বলিবে জগতের এটা রীতি but my sublime self consciousness consists in this that I am not influenced by them. যদি জগতের ব্যবহারে আমার attitude পরিবর্তন অর্থাৎ দুঃখ নৈরাশ্য প্রভৃতি আনে, তাহা হইলে বুঝিব যে আমার দুর্বলতা কিন্তু যে রকম আকাশের দিকে যার লক্ষ্য সম্মুখে পর্বত আসছে, কি কূপ আসছে তার যেমন জ্ঞান থাকে না—সেই রকম যার একমাত্র লক্ষ্য mission-এর দিকে, আদর্শের দিকে—তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। I must move about with the proud self consciousness of one imbued with an idea.

যাক আমি এখন বুঝিতেছি যে মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিষ চাই—

(1) Embodiment of the past

(2) Product of the present

(3) Prophet of the future

(1) I must assimilate the past history, in fact, all the past civilisations of the world.

(2) I must study myself—study the world around me—both India and abroad and for this foreign travels are necessary.

(3) I must be the prophet of the future. I must discover the laws of progress—the tendency of both the civilisation and therefrom to settle the future goal and progress of mankind. The philosophy of life will alone help me in this.

(4) This ideal must be realised through a nation—to begin with India.

Is not this a grand idea?" (পত্রাবলী, পৃঃ ৫৫-৫৬)

এই আলোকেই সুভাষচন্দ্রের জীবনকে আমি বিচার করেছি। তাঁর আত্মবিশ্লেষণের সূত্র ধরেই তাঁর জীবনকাহিনী রচনা করতে চেষ্টা করেছি বলেই ইতিহাস, জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, আধুনিক যুগ ও সুভাষচন্দ্রের সমকালীন ঘটনাধারা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছি।

এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে প্রথম থেকে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছি পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের কাছে। তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'জয়শ্রী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই গ্রন্থের বহু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে তিনি দীর্ঘকাল-যাবৎ রোগ শয্যায় শায়িতা, তাঁর বাহ্য চেতনাও লুপ্ত। বাংলার এই বরেণ্যা নেত্রী একদা ছিলেন দেশমুক্তি ও বিপ্লবের পথে সুভাষচন্দ্রের সহযাত্রিণী,—সুভাষচন্দ্রের, আদর্শের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ও নিষ্ঠা শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকতেই দেখেছি। তাঁর সুস্থ অবস্থায় গ্রন্থখানির রচনা ও প্রকাশের কাজ সমাপ্ত করতে পারিনি বলে আজ গভীর বিষাদ অনুভব করছি।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসুর নাম তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ অশোকনাথ বসু তিনটি মূল্যবান অপ্রকাশিত চিঠি দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। এজন্য এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে কোনো কোনো বিষয়ে পরামর্শ দানে বাধিত করেছেন অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার ও অধ্যাপক রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার। বন্ধুবর শ্রীবিজয়কুমার নাগ আগ্রহী ও উদ্যোগী না হলে এ গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশ সম্ভব হত না। সুভাষচন্দ্রের আদর্শের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও নিষ্ঠা দর্শনে আমি মুগ্ধ। অভিন্ন হৃদয় বন্ধু শ্রীঅমলেন্দু সরকার তাঁর নীরব সাহায্য ও সমর্থন দানে বহু জটিল সমস্যাকে সহজ করে দিয়েছেন। এঁদের সকলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এত নিবিড় যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নেই। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভাওয়াল এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় গুহ প্রকাশ ও মুদ্রণের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন—সেজন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

দোলপূর্ণিমা ১৩৭৫

লেখক

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

['ভারতপথিক'—আত্মজীবনী রচনার পূর্বে ভিয়েনা থেকে প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে সুভাষচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রশ্ন করে পাঠান। এই চিঠি তিনটিতে সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী রচনার প্রস্তুতির আভাস পাওয়া যায়।]

১ ঃ জন্মলগ্ন

সুভাষচন্দ্রের যখন জন্ম হয় ভারতবর্ষের ইতিহাস তখন নতুন পথে মোড় নেবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকাল যে ভারতবর্ষ ছিল মন্থরগতি, সকল পরিবর্তনের প্রতি উদাসীন, এমন কি শ্লথ ও অলস হয়ে এসেছিল যার জীবনযাত্রা,—তার সারা দেহে তখন শক্তি সঞ্চারের লক্ষণ পরিস্ফুট এবং তার চলার ছন্দও বেশ কিছুটা গতিময়। সুভাষের জন্ম পরাধীন ভারতের কোলে, কিন্তু পুরানো স্থবির ভারত সে নয়:—জননীর আনন নবীন প্রত্যাশার আলোয় তখন ঝলোমলো। কাল বদলের সময় যে আগত তা তখন অনুভবগম্য হয়ে উঠেছে। দেশের সম্মুখে উপস্থিত সেই মহৎ সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করে নিতেই যেন জন্ম হল সুভাষচন্দ্রের। একটা শতাব্দীই শুধু তখন শেষ হতে যাচ্ছে না, একটা বিপুল তপস্যা ও আত্মপ্রস্তুতির কালও তখন সমাপ্ত প্রায়। সম্মুখেই এক নতুন শতাব্দীর অভ্যুদয়-সম্ভাবনা—যে শক্তির উন্মেষ মাত্র এতদিন লক্ষ্য করা গেছে, তারই মহৎ আত্মপ্রকাশ যেন ঘটবে; ইতিহাস সেই প্রতীক্ষা বুকে নিয়েই স্তব্ধ হয়ে আছে। সুভাষ জন্মালেন সেই ক্ষণে, অতীতের সকল বেদনা ও সমস্যার ভার যখন বর্তমান, কিন্তু বিশাল সংগ্রামের মন্ত্রোচ্চারণে সমস্ত অবসাদ, গ্লানি ও কাতরতাকে পরাভূত করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞাও যখন জাগরণোন্মুখ। জাতির মূল ব্যথা ও পিপাসাটা কোথায় ও কিসের সুভাষের পক্ষে তা জানা যেমন সম্ভব ছিল, সেই ব্যথার উপশম ও পিপাসার শান্তি কী মূল্যে পেতে হবে তা অনুভব করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়নি। সত্যই তাঁর জন্মলগ্ন ছিল ইতিহাস-পুরুষের আবির্ভাবের উপযুক্ত সময়।

ভারতবর্ষে একটা নতুন চেতনার জাগরণ তখন ঘটে গেছে,—অনেক দিকে অনেক ভাবে অনেক মূর্ত্তিতে সেই চেতনা প্রকাশিত হচ্ছে। সেই চেতনার জাগরণকাহিনীর ভিতরই সুভাষচন্দ্রের জীবন-রহস্যের সূত্রপাত; সুতরাং আমাদের বিষয়বস্তুর অবতারণাও সেই কাহিনীকে অনুসরণ করেই করতে হবে।

সুভাষচন্দ্রের যখন জন্ম, উনিশ শতকের সেই শেষ সময়ে, ব্রিটিশ শাসন গোটা ভারতে বেশ দৃঢ় বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ইংরেজের সাম্রাজ্যও তখন বিশ্বব্যাপ্ত; তার সমকক্ষ শক্তি তখন পৃথিবীতে আর নেই। তার সেই অপরিমেয় শক্তির ভিত্তি ছিল তার অপরিমেয় সম্পদ। আর সেই সম্পদের ডালা অনেকখানি ভরে উঠেছিল ভারত থেকে আহৃত তথা লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যে। কিন্তু লুণ্ঠিত প্রতারিত পদানত ভারত আরেক দিক থেকে নিজেকে পূর্ণ করে তুলেছে তখনঃ সে ফিরে পাচ্ছে তার আত্মসম্বিৎ। সম্ভবত ঐ একটি কারণে ইংরেজের ভারতে আগমন ও রাজ্যশাসন বিস্তারেরও অমোঘ প্রয়োজন ছিল।

বস্তুতঃ ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজের যে বিজয়কে আমরা এত বড় করে দেখি তা এক অর্থে ইংরেজ কর্তৃক ভারতের বিজয় নয়, তা ভারতবর্ষেরই ভারত বিজয়। এ দেশ জয় করার পক্ষে উপযুক্ত কোনো সৈন্যবাহিনী বা প্রস্তুতি ইংরেজের ছিল না। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে এসেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। আলেকজাণ্ডার, নাদির শাহ, বাবর প্রভৃতি সম্রাটদের মতো বিজয়াভিযাত্রী বাহিনী নিয়ে তারা ভারতে আসেনি। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রাধান্য খণ্ডিত ও লুপ্ত হওয়ায় সারা দেশে রাজন্যবর্গের আঞ্চলিক অভ্যুদয় ও তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ঘোরতর রূপ নেয়। এ দেশে বাণিজ্য ব্যাপারে আগত ইংরেজ সেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং কূটনীতির সহায়তায় রাজনৈতিক

ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এক প্রতিযোগী পক্ষকে আর এক প্রতিযোগী পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সূচনা করে। দাক্ষিণাত্যে ও বাংলায় এই হচ্ছে তার রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, এমনকি বাংলায় সাম্রাজ্য পত্তনের ইতিহাস। ভারতবর্ষীয়দের দ্বারাই ভারতবর্ষীয়দের তারা পরাজিত করে এবং সেই বিজয়ের লভ্যাংশ তারা নিজেরা আত্মসাৎ করে।

কিন্তু ১৭৫৭ সালের পর প্রায় দেড় শতাব্দী যখন কেটে গেল, ইংরেজের ভারত বিজয় যখন প্রায় সম্পূর্ণ—তখন ভারতেও নতুন জাতীয় মুক্তির আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল ;—আমাদের কাহিনী সুরু হবে ভারতের সেই আত্মজাগরণ ও আত্মশক্তি বিকাশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় থেকে।

যে বছর সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম হয় কটকে সে বছরই কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসেছিল। জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় আর কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল জানুয়ারির একেবারে গোড়াতেই। এই উপলক্ষে কলকাতার একখানি বিশিষ্ট সংবাদপত্র লিখেছিল : "এবার যাঁরা কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলের এই প্রতীতি জন্মেছে যে এ বৎসরে জাতীয় কংগ্রেসের বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে। আমাদের ইচ্ছা হয় যে প্রতি বৎসরের প্রারম্ভেই কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হোক। কলকাতা হচ্ছে ভারত সরকারের পীঠস্থান এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্র ; এবং বাংলাদেশ হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে অগ্রগণ্য প্রদেশ। শিক্ষিত লোকেরাই কংগ্রেস পরিচালনা করে থাকেন, এবং ভারতের আর কোনো প্রদেশে বাংলার মতো এত শিক্ষিত লোকের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব নয়। এ বৎসর এই বিশাল উপমহাদেশের চারদিকে দেখা দিয়েছে নানারকম দুর্যোগ, তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস যে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে,

নিঃসন্দেহে তার কারণ হচ্ছে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের অনুষ্ঠান।" (অমৃত বাজার পত্রিকা, ৫ই জানুয়ারি ১৮৯৭, প্রধান সম্পাদকীয়)।

এই উদ্ধৃত বাক্যগুলির সাহায্যে তদানীন্তন বাংলার ও কলকাতার গুরুত্ব স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ভারতবর্ষ; আর সেই ভারতের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ভাবধারার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। কলকাতা তখন আর নতুন শহরও নয়, তাব বয়সও হয়েছে যথেষ্ট: একটা গোটা জাতির নব অভ্যুত্থানের সমস্ত উদ্বেগ ও উল্লাস, সংঘাত ও সমন্বয়, বিষাদ ও প্রত্যাশার অভিজ্ঞতাব ভিতব দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। সুভাষ জন্মালেন এই শহবে নয়, বাংলা দেশেও নয়—কিন্তু তাঁর জন্ম প্রদেশ ওড়িশা তখনো বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি; আর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মানসিক আত্মীয়তা বাংলা ও কলকাতার সঙ্গে যতটা নিবিড় ছিল সে-সময়, পৃথিবীর আর কোনো স্থানেব সঙ্গেই সে আত্মীয়তা তারা বোধ করেনি।

১৮৯৭ সালের প্রথম দিকটায় বছরটাকে দুর্যোগময় বলেই মনে হয়েছিল। কারণ তার আগের বছরের অক্টোবব মাস থেকেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। নভেম্বর মাসে রাজস্থান থেকে বিহাব পর্যন্ত এবং মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশেও দুর্ভিক্ষের অবস্থা ঘনিয়ে ওঠে। সরকার ছিল এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এ দেশেব জমিদার ও শিক্ষিতশ্রেণীব নিকট চাঁদা চেয়েছিল সরকার; প্রজাসাধারণের দুর্দিনে নিজের রাজকোষ থেকে অর্থ ব্যয় করতে রাজি হয়নি তাবা।

বাংলা দেশে এই সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল, কিন্তু সে বিক্ষোভ সরকারের কাছ থেকে ন্যায় বিচার ও সুযোগ সুবিধা বেশি পরিমাণে না পাবার দরুণ। আমরা ইংরেজি বিদ্যায় ইংরেজের সমকক্ষ হয়ে উঠেছি, অথচ ইরেজ যে অধিকার ও সুযোগ সুবিধা

ভারত সরকারের কাছ থেকে পায়, আমরা তা পাইনা কেন? দুর্ভিক্ষের মতো দুরবস্থার দিনে সঙ্কট ত্রাণের উদ্দেশ্যে আমরা তো অতিরিক্ত কর দিই, সরকার সে করের টাকাও দুর্ভিক্ষকালে প্রজার হিতার্থে খরচ করে না কেন? এই সকল বাস্তব প্রশ্ন সেদিন এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তুলত।

কলকাতায় কংগ্রেসেব অধিবেশনে নিখিল ভারতের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিগণ সমবেত হয়ে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করেছেন, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছেন। ইংরেজি ভাষায় ভারতবাসীর পারঙ্গমতা এতেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। ডব্লিউ. সি. বোনার্জী (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ চার্লু, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রমুখ নেতাদের মতো ইংরেজি ভাষায় শুদ্ধ ও অনর্গল বক্তৃতা দিতে কজন ইংরেজই বা পারে? অথচ এমন ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ভারতবাসীবাও ইংরেজ সবকারের কাছ থেকে মর্যাদা ও সুবিচার পান না। একটি সংবাদপত্র তাই রুষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল যে বাবুব বাড়ির দারোয়ান লেখাপড়া শিখলে বাবু তাকে মর্যাদাসম্পন্ন পদে উন্নীত করে দেন, অথচ ইংরেজ সরকার বিশিষ্ট বিদ্বান ভাবতীয়দেরও সম্মান দিতে বাজি নন কেন?

এই রোষ ও ক্ষোভের সঙ্গে জড়িত থাকে জাতীয় অহংবোধের প্রশ্ন। এই বিস্তীর্ণ ধরাধামে আমরা যে কারও চেয়ে কম নই, কোনো উন্নত জাতি অপেক্ষা তুলনায় আমরা নিকৃষ্ট নই—এই কথাটা অনুভব করতে পারার একটা তাগিদ সে সময়ে এদেশেব শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। ইংলণ্ডে বাসরত ভারতীয়রা ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কেম্ব্রিজে ভারতীয় মজলিসের একটি অনুষ্ঠান করেছিল। সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে রঞ্জিৎ সিং ও অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কারণ রঞ্জিৎ ক্রিকেট খেলার

ইতিহাসে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন এবং অতুলচন্দ্র ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আই. সি. এস) পরীক্ষায় ইংরেজ পরীক্ষার্থীদেরও হারিয়ে প্রথম স্থান দখল করে ভারতীয়দের মধ্যে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। ইংলণ্ডে যেয়ে ইংরেজকেই হারানো—তাও তাদের নিজেদের খেলা ও নিজেদের ভাষা ও বিদ্যার ক্ষেত্রে,—এ সংবাদে এদেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল।

বিদেশে বাঙালীর সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভে বাঙালীর হৃদয়ে যে সেদিন কতখানি উল্লাস জেগে উঠত, তদানীন্তন সংবাদপত্রগুলিতে তার সাক্ষ্য আছে ছড়িয়ে। অমৃত বাজার পত্রিকা লিখেছিল, শুধু রঞ্জিৎ সিং বা অতুলচন্দ্রই নন, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ ও লেফটেন্যাণ্ট (পরে কর্ণেল) সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসকেও সম্বর্ধনা জানানো উচিত ছিল কেম্বিজের ভারতীয় মজলিসের অনুষ্ঠানে। প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে যন্ত্র ও উপকরণের স্বল্পতা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের গবেষণায় যে আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন ও বিস্ময়কর ফললাভ করেছেন সারা জগতে তা স্বীকৃত হচ্ছে গৌরবের সঙ্গে; আর স্বামী বিবেকানন্দ তো অসভ্য বর্বর পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে সভ্যতার মন্ত্রে ও মানবতার দর্শনে দীক্ষা দিয়েছেন; সমগ্র ভারত এই দুই আচার্যের কাছে তাই কৃতজ্ঞ। আর সুরেশ বিশ্বাসই একমাত্র বাঙালী যিনি সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন—এবং সুযোগ পেলেই সামরিক ক্ষেত্রে বাঙালী যে কী করতে পারে তাও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি ব্রাজিলের সৈন্যবাহিনীতে সাধারণ সৈন্য-হিসাবে ভর্তি হয়ে লেফটেন্যাণ্ট পর্যন্ত হয়েছেন ও সারা ইয়োরোপে তাঁর সমকক্ষ সাহসী ও বীর তখন আর নেই। সুযোগ পেলে বাঙালীর প্রতিভা যে অসামান্য কীর্তি স্থাপন করতে পারে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস সেদিন সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

ইংরেজ সরকারকে এক সময়ে প্রগতির দূত ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ

রূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিল বাঙালীরা। কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগে সেই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়ে গেল। জাতীয় চেতনা ও মর্যাদাবোধ যখন ক্রমে জাগ্রত হল তখন বিদেশীর অধীনতা, বিশেষত তাদের উন্নাসিক মনোভাব ও আচরণ এদেশের লোকদের পক্ষে বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সেদিনের সেই ক্ষোভের মূলে অবশ্যই অর্থনৈতিক স্বার্থচিন্তাও ছিল—বড় বড় চাকরিগুলির ওপর উচ্চশিক্ষিতদের ছিল সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কটের বোধ সেদিন আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেনি—তার একটা কারণ হয়তো এই যে জনসাধারণের দারিদ্র্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা উপলব্ধি করতে চায়নি, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগও তাদের বিশেষ নিবিড় ছিলনা। মধ্যবিত্তের সহজ জীবনযাত্রাও তখন ব্যাহত হয়নি। খাদ্যের মূল্য তালিকা থেকেই কথাটা বোঝা যায়। যেমন, ১৮৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বাংলার নানা স্থানে মণপ্রতি চালের দাম ছিল এইরকম: কলকাতা ৭৷৷০ টাকা, বর্ধমান ৩৸০, মেদিনীপুর ৩৸৶০, পাবনা ৪৷০, রংপুর ৩৸৬ পাই, ঢাকা ৩৷৷৵০, চট্টগ্রাম ৪৲, পাটনা ৩৸/০, মজঃফরপুর ৪৷৶০, ভাগলপুর ৩৸৵০, কটক ৩৶৩ পাই, রাঁচি ৭৲। সে বছর দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তাতেই চালের দাম ছিল এই। অনুমান করতে পারি দেশের জনসাধারণের অধিকাংশ, —চাষী সমাজ,—বিত্তহীন ছিল। ধান চাল ও কৃষিজাত দ্রব্যের নিম্নমুখী দাম থাকলে জমিদার-জোতদার শ্রেণীর পরিতুষ্টির পর তারা আর কত পয়সাই বা পেতে পারত? কিন্তু মধ্যবিত্ত, বিশেষত শহরের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পক্ষে অবস্থাটা ছিল খানিকটা সন্তোষজনক; দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সুলভ থাকলে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কটের চেহারা তাদের কাছে স্পষ্ট হবার কথা নয়। তার ফলে তখন ইংরেজ-বিরোধী বিক্ষোভটা অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের আন্দোলনে পর্যবসিত হতে পারেনি; আমাদের নবজাগ্রত জাত্যাভিমানের প্রেরণায় আবেগের স্তরে ও ভাবলোকেই সেদিনের

ক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করতে পারত। আজকের দিনে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত উভয় শ্রেণীই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে যেমন অর্থনৈতিক স্বার্থসচেতন হয়ে ওঠে ও অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকেই করে তোলে জীবনের মুখ্য বিসম্বাদের বিষয়, উনিশ শতকের শেষে বাঙালীর মানসিকতা ঠিক সে খাতে প্রবাহিত হয়নি। অর্থনীতির চেয়ে তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল রাজনীতির প্রশ্ন—রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের সমস্যা। কিন্তু তার চেয়েও গভীরতর যে আকাঙ্ক্ষা সেদিন জাতিকে আন্দোলিত করেছিল সে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠা লাভের, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষার আবেগময় আকাঙ্ক্ষা।

অর্থনৈতিক সমস্যা যে দেশে ছিল না তা নয়:—মাঝে মাঝে সেই সমস্যা এত প্রকট হয়ে পড়ত যে জাতীয় নেতারাও সরকারের কাছে অর্থনৈতিক দাবী পেশ করতে বাধ্য হতেন। যেমন ১৮৯৬—৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত রূপকে খানিকটা উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। তাই ১৮৯৭ সালের কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত প্রস্তাব (ঐ অধিবেশনের ১২নং প্রস্তাব—বিষয়টির প্রতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা প্রস্তাবের নম্বর দেখেই হয়তো অনুমান করা যায়) উত্থাপন করে বলেন: "আজ যে বিরাট সর্বনাশের ছায়াতলে আমরা মিলিত হয়েছি, কংগ্রেসের জন্ম সময় থেকে এত বড় সর্বনাশ আর এদেশে দেখা দেয়নি। এখন এদেশে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটছে এবং কোটি কোটি লোক তার ফলে মারাও যাচ্ছে। ভারতে ইংরেজশাসনের ইতিহাস দুর্ভিক্ষেরই ইতিহাস। দূর অতীতের কথা বাদ দিয়ে আমি বিগত কিছু কালের কথাই বলছি—১৮৬৬ সালে এদেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তারপর ১৮৭৩-৭৪ সালে, আবার '৭৭-'৭৮ সালে এবং এখন গত বছর থেকে চলছে দুর্ভিক্ষ। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল ওড়িশায়,

'৭৩-'৭৪ সালে বিহারে এবং '৭৭-'৭৮ সালে মাদ্রাজে। এবারের দুর্ভিক্ষ হয়েছে সারা ভারতব্যাপী—দেশের সমগ্র জনসাধারণ পড়েছে তার নির্মম কবলে। পথের পাশে, জঙ্গলে, ঘরে, অনাথাশ্রমে সর্বত্র হাজার হাজার নরনারীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। সরকার তাদের জন্য কিছুই করতে রাজি নন। এই দুর্ভিক্ষের আসল কারণ হচ্ছে জনসাধারণের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য—সে দারিদ্র্যভার আরও দুর্বহ হয়েছে সরকারের অত্যধিক কর ধার্যের ফলে। বর্তমান ভারত সরকারের মতো অপব্যয়বিলাসী সরকার জগতে আর হয়নি। দেশের ৪ কোটি লোক দিনে একবার মাত্র আহাব করে এবং মাথাপিছু যার বাৎসরিক আয় ১৭ টাকা মাত্র তাকেও শতকরা ৮ টাকা কর দিতে হয়। আকবরের রাজত্বকালের সঙ্গে তুলনা করলে দেখব যে যদিও এখন মজুরির হার বেড়েছে তবু মূল্যান্তর যে হারে ঊর্ধ্বগতি লাভ করেছে তাতে প্রকৃত আয় কমে গেছে, জনসাধারণ তাই বহুল পরিমাণে দরিদ্রতর হয়ে গেছে। এই দারিদ্র্য বৃদ্ধি অনিবার্য কারণেই ঘটেছে। এক শ বছর আগে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকরা এদেশে আসত আমাদের শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করে চালান দেবার উদ্দেশ্যে ;—তাবা নিত তখন এদেশে তৈরী সিল্ক, মসলিন, শাল, ধাতুদ্রব্য, বাসনপত্র। কাঁচা মালের সন্ধানে তারা আস না। এখন কোথায় গেল আমাদের সেইসব জিনিস—মিলিয়ে গেল কোন শূন্যে ? আমাদের শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য ইংবেজই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আজ সরকারের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল দেশেব সম্পদকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগ করা যাতে দেশবাসীর দারিদ্র্য দূর হয়, দুর্ভিক্ষ আর কখনো না ঘটে। ভারত সরকারের ওপর আমার অগাধ আস্থা আছে, তার প্রাজ্ঞতা ও ন্যায়পরায়ণতায় আমার বিশ্বাস অটুট। সরকার অগ্রসর হন ধীর গতিতে, কিন্তু প্রজাহিত ও প্রগতির পথ অনুসরণ করেই তাঁরা সব সময় চলেন। আমরা যাঁরা কংগ্রেসে আছি আমরা হচ্ছি সরকারের বেসরকারী পরামর্শদাতা। সরকারের কাছে

আমাদের আবেদন তাঁরা আমাদের শিল্পকে রক্ষা করুন, আমাদের সম্পদকে বিনিয়োগ করুন, যাতে দুর্ভিক্ষের বদলে দেশ সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে ভরে ওঠে। যদি তাঁরা তা করেন তবে সমগ্র জাতি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।"

উনিশ শতকের শেষভাগের ভারতীয় রাজনীতির মূল সুরটি এই বক্তৃতাতেই ধরা পড়ে। দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বোধ অনুপস্থিত নয়, কিন্তু সে বোধ যে খুব তীক্ষ্ণ তা বলা যায় না। ইংরেজই যে আমাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী সেকথা সর্বস্বীকৃত—তবু ইংরেজের ন্যায়, নীতি ও প্রজ্ঞায় আছে অগাধ আস্থা; সরকার যে প্রগতি ও জনহিতের পথ অনুসরণ করবেন সে বিষয়ে কোনো সংশয়ই নেই, এবং এদেশের সুখ-সমৃদ্ধি যে ইংরেজ শাসকরা এনে দিতে পারেন ও দেবেনও সে বিষয়েও নেতাদের মন দ্বিধাগ্রস্ত নয়। কংগ্রেস তাই দেশের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাধানের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দান করা ও সরকারের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানানোতেই সমস্ত কর্তব্যের ইতি মনে করে! সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক যে কী বলে নেতারা মনে করেন সুরেন্দ্রনাথ তাও খোলাখুলিই বলেছেন, .

We in the Congress are the unofficial advisers of the Government.

এই হচ্ছে তদানীন্তন বাংলার রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয়।

দেশের ভাবজগতের সংবাদও এই প্রসঙ্গে নেওয়া চলে। মিসেস অ্যানি বেশান্ত এই সময় (১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাস) কলকাতায়, —ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রশ্নাদি সম্পর্কে তিনি নিয়মিত উপদেশ দান করছেন। ১নং ঝাঁমাপুকুর লেনে রায় বাহাদুর মন্মথনাথ মিত্রের বাড়িতে নিয়মিত শনি ও রবিবার বসে তাঁর আসর। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন সেসময় অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। কেশবচন্দ্র

সেন লোকান্তরিত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হিন্দু সমাজে ফিরে গেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃদ্ধ;—শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুসারীরা রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। বিদেশে বিবেকানন্দের সাফল্যের ফলে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের প্রতি শিক্ষিত বাঙালী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিদেশী বিদ্বজ্জনরাও রামকৃষ্ণের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করায়—কেননা ম্যাক্সমূলারের রামকৃষ্ণ-জীবনী ১৮৯৬ সালেই প্রকাশিত হয়েছে—রামকৃষ্ণের প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি,—তার মুখ্য কারণ স্বামীজী তাঁর প্রথম বারের পাশ্চাত্যাভিযানের পর বাংলাদেশে তখনো এসে পৌঁছাননি, রামকৃষ্ণ মিশন তখনো গড়ে ওঠেনি, নিবেদিতাও আসেননি এদেশে। বাংলায় ধর্মান্দোলনের বেগ ঠিক সেই সময়টায় কতকটা প্রশমিত,—যদিও কোনো কোনো অঞ্চলে কোনো কোনো লোকগুরুর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, যেমন ঢাকায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাব।

ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের স্থিতাবস্থা ঘটলেও ব্রাহ্ম সমাজ লুপ্ত হয়নি এবং রামমোহন রায়ও বিস্মৃত হননি। কলকাতায় রামমোহন রায়ের অনুরাগীবৃন্দ একটি রামমোহন রায় ক্লাব স্থাপন করেছিলেন এবং ১০ই জানুয়ারি তারিখে কলকাতায় সেই ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দুটি সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তাদের আলোচনার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে ঃ

পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত তর্কভূষণ—উপনিষদের ঈশ্বরবাদ
বাবু গোবিন্দ নাথ গুহ এম. এ.—বুদ্ধ
বাবু বিপিন চন্দ্র পাল—যীশুখৃষ্ট
ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়—ইসলাম
পণ্ডিত তারক কুমার কবিরত্ন—চৈতন্য
বাবু অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার—নানক

বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়—রাজা রামমোহন রায়

বিষয়বস্তুর তালিকা দেখে বোঝা যায়, রামকৃষ্ণের ভাবধারার প্রতি অনুগত হয়ে কেশব চন্দ্র সেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন বাংলার বিদ্বৎ সমাজ সেই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু যুগটা ছিল শুধু ধর্মচেতনার জাগরণের যুগ নয়, বিজ্ঞান-চেতনারও উদ্বোধনের যুগ। আগেই বলেছি আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা তখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। লণ্ডনের 'পিয়ার্সন ম্যাগাজিন' ১৮৯৬ সালেব ডিসেম্বর সংখ্যায় জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রত্যয়গুলির পরিচয় দান করে। সেই প্রবন্ধে ছিল এই মন্তব্যটি :

> Professor Bose is undoubtedly on the edge of a very great discovery indeed—far greater than those which, as it is, will be associated with his name in future generations.

অর্থাৎ, অধ্যাপক বসু নিঃসন্দেহে এমন এক মহান আবিষ্কারের সম্ভাবনাদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন যে আবিষ্কার, তাঁর ইতিপূর্বেব যে সকল আবিষ্কারের জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে, সে সব আবিষ্কারকেও ম্লান করে দেবে! কী সার্থক এই মন্তব্য!

জগদীশচন্দ্র যখন এইভাবে ভারতের বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে নতুন গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি স্থাপন করেছেন ও তার ফলে আমাদের বিজ্ঞান-চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছেন তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গবেষণা ও আবিষ্কারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও বাঙালীর মনকে বিজ্ঞানের সাধনায় নব নব সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে তুলল। ইংলণ্ডের কেমিক্যাল সোসাইটির সভায় (১৮৯৬ সালের ১৯শে নভেম্বর) আচার্য রায়ের তিনটি আবিষ্কার সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয় :

1. Mercury Hyponitrites.
2. The Nitrites of Mercury and the Conditions under which they are formed.
3. On the Interaction of Mercurous Nitrite and the Alkyl Iodides.

এই আবিষ্কারগুলির সঙ্গে আরও নয়টি নতুন আবিষ্কার মাত্র বারো মাসের গবেষণাতেই আচার্য রায় নিষ্পন্ন করেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার উদ্বেলিত হয়ে বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাসে এ একটি আশ্চর্য ও অভূতপূর্ব ঘটনা। ইংরেজ ও জার্মান রসায়নবিদ্‌গণ আচার্য রায়ের আবিষ্কারগুলিকে যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে অভিনন্দন জানাতে সেদিন দ্বিধা করেননি।

১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাস এইভাবে বাঙ্গালীর জীবনে নানা-দিক থেকে গৌরব বহন করে এনেছিল। মাসটাকে সেই অর্থে শুভই বলতে হয়। এমন কি দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাও বৃথা যায়নি—বড়লাট লর্ড এলগিন সরকারের দুর্ভিক্ষ নীতি বদল করে সুরেন্দ্রনাথের বক্তব্য অনেকাংশে মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু ১৮৯৭ সালের গোড়াতেই ঘটেছিল ভারতে সে বছরের শ্রেষ্ঠ ঘটনা—স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য বিজয়ের পর প্রথমবার ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। সিংহলের সংবাদপত্র "সিলোন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট"—এ লেখা হল: "স্বামী বিবেকানন্দ ১৫ই জানুয়ারি প্রিন্স হেনরি লিওপোল্ড জাহাজে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে কলম্বোয় এসে পৌঁছাবেন। হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ও তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেছেন। ..তিনি আমেরিকায় দু বছর কাজের পর লণ্ডনে গিয়েছিলেন—সেখানেও তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। বর্তমানে তাঁর সহধর্মীদের জরুরী আহ্বানে স্বল্প কালের জন্য তিনি স্বদেশে ফিরে আসছেন। আমরা জানতে পেরেছি যে স্বামীজী এই সুযোগে দুটি ধর্মালোচনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন,

যেখান থেকে গুরুগণ ভারতে ও জগতের সর্বত্র বেদনিহিত সত্য প্রচার করবেন। গত নববর্ষের দিনে বহু হিন্দু সমবেত হয়ে স্থির করেছেন কী ভাবে স্বামীজীকে যোগ্য সম্বর্ধনা জানানো যায়। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অংশ হতে প্রতিনিধি নিয়ে একটি অভ্যর্থনা কমিটিও গঠিত হয়েছে। সভাস্থলেই এই উদ্দেশ্যে ৮০০ টাকা সংগৃহীত হয়—আরও প্রায় ৮০০ টাকা সংগৃহীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।"

'সিলোন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টে'র সংবাদ যে কতদূর সত্য ছিল তা অচিরেই প্রমাণিত হয়ে গেল। কলম্বোয় স্বামীজীকে দেওয়া হল বিজয়ী বীরের সম্বর্ধনা। তিনি আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে ঠিক কী করেছিলেন, সেসব স্থানে তাঁর কর্মসূচী কী ছিল সে সম্বন্ধে সঠিক খবর যে সবার জানা ছিল তা নয়। কিন্তু শিকাগো ধর্মসম্মেলনে তাঁর বিজয়লাভ ও পরবর্তীকালে তাঁর অভূতপূর্ব সম্মান ও প্রতিষ্ঠা-লাভের সংবাদ এদেশে পৌঁছেছিল। শোনা গিয়েছিল যে পাশ্চাত্ত্যের বহু নর নারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। এ যেন ভারতের পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতা বিজয়ের প্রতীক। অন্তত দেশ সেভাবেই তাঁর সাফল্যকে সেদিন গ্রহণ করেছিল।

অন্যান্য স্থানের মতো কলকাতায়ও স্বামীজীর সম্বর্ধনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায়। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এই কমিটির সভাপতিত্বের পদ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী বাংলায় এসেছিলেন অনেক দেরিতে—ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি মাদ্রাজ থেকে বাংলার দিকে রওনা হন স্টীমার যোগে।

সুভাষচন্দ্রের জীবন আলোচনা করতে যেয়ে বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাগমনের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ১৮৯৭ সাল শুধু এই ঘটনাটির জন্যই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি শুভ ও উল্লেখযোগ্য বৎসর হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকত। কারণ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে

এসেছিলেন একজন বিজয়ী ব্যক্তি মাত্র রূপে নয়,—তিনি এসেছিলেন ভারতের বিজয় শক্তি রূপে; সমগ্র ভারতে একটা অদৃষ্টপূর্ব শক্তির চাঞ্চল্য তাই তাঁকে অভ্যর্থনার মারফৎ আত্মপ্রকাশ করেছিল। সুভাষচন্দ্রের যেদিন জন্ম হয় সেই ২৩শে জানুয়ারি তারিখে ভারতের সর্বত্র একটা আনন্দস্রোত বইছিল, তার সঙ্গে জাতীয় চিত্তে জেগেছিল আত্মশক্তির অনুভব। সিংহলে নানাস্থানে স্বামীজীকে যে বিশাল ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল ভারত তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করবে। বহুদিন আগে আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে কথা প্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী আবেগভরে বলেছিলেনঃ "ভারতকে আমার বাণী শুনতেই হবে! আমি ভারতের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দেব! আমি আমার জাতির শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ শক্তি ছড়িয়ে দেব।...ভারত আমাকে দেবে বিজয়-সম্বর্ধনা।"

বিবেকানন্দের জীবনী-লেখক লিখেছেনঃ "স্বামীজীর কলম্বো নগরে পদার্পণ ভারতের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা—সেদিন আরম্ভ হইল ভারতের সক্রিয় নব জাগরণ, নবীন উৎসাহে নবতর সাফল্যের প্রতি অভিযান।" (স্বামী গম্ভীরানন্দঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮)

অতিরঞ্জিত ভাষণ একে বলা যায় না—কেননা কথাটা নিগূঢ় অর্থেই সত্য। আমরা শুধু সেই সঙ্গে এটুকুও বলতে পারি যে সুভাষচন্দ্র ভারতের সেই সক্রিয় নব জাগরণ-লগ্নের জাতক—নবীন উৎসাহে নবতর সাফল্যের অভিমুখে ভারতের অভিযানের ভবিষ্যতের পরিচালক হওয়াই ছিল তাই তাঁর নিয়তির নির্দেশ।

সুভাষচন্দ্রের যখন জন্ম হয় সে সময়ে বাঙালীর চিত্ত যে কতখানি জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছে তার নিঃসংশয়যোগ্য সাক্ষ্য মিলবে সে সময়কার বাংলা সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ই বাংলার সাহিত্য-অধিনায়ক—যদিও হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যরথীবৃন্দ তখনো

জীবিত। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাঁইত্রিশ, কিন্তু তাঁর রচনাবলীর আয়তন তখনই স্ফীত। প্রাজ্ঞ সমালোচকগণ তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে তীব্র সমালোচনায় মুখর হলেও দেশের আর এক অংশে, বিশেষত তরুণ সমাজে তাঁর সাহিত্যের সমাদরও বহু বিস্তৃত হয়ে গেছে! তাঁর অনুকারী ও অনুসারী সাহিত্য-সম্প্রদায়ও সে সময় গড়ে উঠেছে।[৭] তাঁর যে সকল গ্রন্থ তখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে আছে সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, ভানুসিংহের পদাবলী, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, নদী, চিত্রা, বিদায় অভিশাপ ও চৈতালি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ; প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাল্মীকির প্রতিভা, মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা ও মালিনী প্রভৃতি কাব্যনাট্য; রাজা ও রাণী, বিসর্জন প্রভৃতি নাটক: গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, হাস্যকৌতুক প্রভৃতি প্রহসন; বউ ঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি প্রভৃতি উপন্যাস এব য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, চিঠিপত্র, পঞ্চভূত প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ। এই সকল বিচিত্র রচনার মধ্যে তখন পর্যন্ত যে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তিনি কবি, রসিক, সৌন্দর্যপিপাসু রবীন্দ্রনাথ, কোমল ও ভাববিহ্বল তাঁর রূপ। উদ্দীপ্ত স্বদেশভাবনার দিনগুলি তখনো তাঁর আসেনি, তাঁর চরিত্র ও কল্পনার মধ্যে নিহিত ওজঃ ও দার্ঢ্য তখনো অপ্রকট। তাই সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুকারীদের সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের অভিযোগ ছিল এই: "ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়ে মানুষের মত বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের ওপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন—"

তবে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-ভাবনার এই বিশুদ্ধ কোমল রূপটি তখন যেন সমাপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে—তাঁর কণ্ঠেও রণধ্বনি উচ্চারিত হবার লগ্ন আসন্ন। তাই 'চৈতালি'র শেষের দিকের একটি কবিতায় আছে এই ঘোষণা:

চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে।
সংসারবিপ্লবধ্বনি শ্বাসে দূর হতে। (আশিস-গ্রহণ)

'চৈতালি'র আর একটি কবিতাও উল্লেখযোগ্য—এবং স্বদেশী যুগের বাংলায় এই কবিতাটি বহুল আবৃত্তির মারফৎ অতিশয় সুপরিচিতও হয়ে গেছে :

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহ ক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়োনা ধরে।
... ...
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে। (বঙ্গমাতা)

কোমল, শান্ত, সৌন্দর্যমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে মধ্য-যৌবন অতিক্রান্ত হবার পর কেন যে পরিবর্তন এসেছিল এবং এক আশ্চর্য বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের উদ্বোধনের জন্য নানাবিধ কর্মে পর্যন্ত নিজেকে তিনি কেন নিয়োজিত করেছিলেন—তা ব্যাখ্যা করা শক্ত; হয়তো পদ্মাতীরের সাধারণ বাঙালী জীবনের সঙ্গে এই সময় তাঁর যে পরিচয় ঘটছিল তা তাঁকে নাড়া দিয়ে থাকবে, হয়তো বা জাতীয় জাগরণের স্রোত তাঁকেও নীরবে বসে থাকতে দেয়নি, কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবও হয়তো তাঁর চিত্তের ওপর ক্রিয়াশীল হয়েছিল। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের হৃদয় ও মনে যে স্বদেশচিন্তা ও জাতি গঠনাত্মক কর্মৈষণার তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ে তাঁর মতো নিঃসঙ্গতাবিলাসী কবিকেও পরিবর্তিত করে তুলেছিল, তা থেকেই জাতির নবজাগৃতির ব্যাপকতা ও তীব্রতার একটা পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রজীবনের এই পর্বে—যে সময়টাকে চিহ্নিত করতে যেয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার

লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথের···আলসে বিলাসে, ভাব-উচ্ছ্বাসে, সৌন্দর্যচর্চ্চায় দিন যায়" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬) সেই সময়েও দরিদ্র দেশের জন্য বেদনাবোধ মাঝে মাঝে তাঁকে আনমনা করে দিয়েছে এবং বিবেকাহত ব্যক্তির মতো যেন স্বপ্নের ঘোর ভেঙে জেগে উঠে তিনি বলেছেন:

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
.. ..
সারাদিন বাজাইলি বাঁশী। ওরে তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ জনে?

(এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা)

রবীন্দ্রনাথের এই বহু-উদ্ধৃত কবিতাটির কোনো কোনো পংক্তি সুভাষচন্দ্রের জীবন প্রসঙ্গে পুনরায় স্মরণযোগ্য মনে হয়। কারণ কবি তাঁর কল্পনাদৃষ্টিতে যে মহাপ্রাণ জীবনের ছবি দেখেছিলেন তাতে যেন সেদিনের ভাবী জাতক সুভাষের মহৎ জীবনের প্রতিবিম্বখানি ধরা পড়ে গিয়েছিল:

বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজল ধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

... ...

সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,...

(রচনাকাল ১৮৯৪)

কবির এই কল্পনাই পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্রের জীবনে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল। যুগে যুগে এরকমই ঘটে থাকে। যেমন, বাংলা দেশেই ইতিহাসের আর এক পর্বে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি তাঁদের কাব্যে যে জীবনরূপকে আহ্বান করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে সেই রূপই পরে শতধারে ফুটে উঠেছিল। সেই কারণেই আবার বলি, সুভাষের আবির্ভাব একটা আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়,—বাঙ্গালীর চিত্তভূমিতে ঐরূপ মানুষের আবির্ভাবের জন্য একটা প্রস্তুতি চলছিল বহু দিন থেকে ;—সুভাষ যেন তাই জাতীয় চিত্তের ঘনীভূত আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি।

আগেই বলেছি, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তখনো জীবিত ছিলেন। কিন্তু ১৮৯৭ সাল নাগাদ হেমচন্দ্র শুধু বৃদ্ধ নয়, শোক দুঃখের আক্রমণে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বয়স তখন উনষাট (জন্ম ১৮৩৮), অস্ত্রোপচার করা সত্ত্বেও চক্ষু দৃষ্টিহীন—কবিকণ্ঠ প্রায় নীরব। একদিন মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যকে তিনিই বাঙালীর কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন, আবার মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁরই কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেনঃ "কিন্তু বঙ্গ কবি-সিংহাসন শূন্য হয় নাই! এ দুঃখসাগরে সেইটি বাঙালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র! মধুসূদনের বীণা নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গ কবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্ত ধামে যাত্রা করিয়াছেন,—কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গ মাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখনো রোদন করিব না।"

হেমচন্দ্রের যে সকল কাব্য বাঙ্গালী সমাজকে আমোদিত

করেছিল তার মধ্যে ছিল চিন্তাতরঙ্গিনী, বীরবাহু কাব্য, বৃত্রসংহার, দশমহাবিদ্যা, কবিতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ। আমাদের দেশে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের উদ্বোধক তাঁর কয়েকটি কবিতা ও কাব্যাংশ বিশেষ প্রেরণাদায়ক ও বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল ; যেমন, ভারতবিলাপ, পদ্মের মৃণাল, ভারত-কামিনী, কাল-চক্র, ভারত-সঙ্গীত, বিন্ধ্যগিরি প্রভৃতি। 'বীরবাহু' কাব্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন :

মাগো ও মা জন্মভূমি ! আরো কত কাল তুমি
এ বয়েসে পরাধীন হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবনদল, বল আর কত কাল,
নিদয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।
কতই ঘুমাবে মা গো, জাগো গো মা জাগো জাগো
কেঁদে সারা হয় দেখ পুত্র কন্যা সকলে।

(রচনাকাল : ১৮৬৪)

যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি, সুভাষের সেই জন্ম-বৎসরে, স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধক কবি হেমচন্দ্র অন্ধ ও নীরব হয়ে যান : কিন্তু নবীনচন্দ্র সেন তখনো সজীব ও সৃষ্টিশীল। নবীনচন্দ্রের সে কাল পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে অবকাশরঞ্জিনী, পলাশির যুদ্ধ, রঙ্গমতী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'অবকাশরঞ্জিনী'তেই তিনি ভারতের সমকালীন অবস্থাকে মহাশ্মশানের মতো বর্ণনা করে লিখেছিলেন :

কি ভয় !—আবার হৃদয় ভরিয়া,
কর উদ্দীপনা—মহাসুরা পান :
করতালি দিয়া, নয়ন মুদিয়া,
কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান ;—

ভারত-সন্তান! দেখ না মাতার
লোলজিহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারংবার;
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি বিদারণ
করে, জননীর পিপাসা নিবারি'
ভারত-শ্মশানে শক্তি আরাধন?

(রচনাকাল: ১৮৭১)

নবীনচন্দ্রের এই আশা সফল হয়েছিল তাঁর জীবৎকালেই। ১৯০৯ সালে তাঁর মৃত্যুর আগেই তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন বাংলায় বিপ্লববাদের অভ্যুত্থান এবং নিজের বুক বিদীর্ণ করে দেশ-জননীর পিপাসা নিবারণ করার মতো মহাবীর সাধক দলের আবির্ভাব। ভারত-শ্মশানে শক্তি আরাধনার যে স্বপ্ন কবি দেখেছিলেন—সে স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। জাতির মনোমধ্যে যে আশা, কল্পনা ও স্বপ্নের জাগরণের পরিচয় আমরা পাই উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে--বাংলায় বিশ শতকের প্রথম ভাগে যেন সে সবই বাস্তবের মাটিতে রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়েছিল। সুভাষের জন্ম এই স্বপ্নের শেষ ও বাস্তবের আরম্ভের মধ্যবর্তী লগ্নে—ভাব ও রূপের সঙ্গম কালে। সেই কারণেই আমরা সময়টাকে বিশিষ্ট ক্ষণ বলে অনুভব করতে পারি। কালপুরুষের ওই তো উপযুক্ত জন্মের কাল!

সুভাষচন্দ্রের জন্ম সময়ে বাংলা দেশে আরও যে সব কীর্তিমান সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক জীবিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি। এবং ১৮৯৭ সালের অল্প পূর্বে দেহরক্ষা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৯১) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪)। উনিশ শতকের বাংলার ভাব-

পরিমণ্ডল রচনায় এঁদের দান ছিল অসামান্য; বিশেষত বাংলার নবজাগৃতির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে এই মনীষীরা ছিলেন প্রধান নায়ক। উনিশ শতক ক্রমে সমাপ্তির দিকে এগোল,—বাঙ্গালীর ইতিহাসের এক পরম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হল। এমন উত্থান বাঙালীর আর কবে ঘটেছে? তুলনা করতে বসলে মনে পড়ে এক শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন ও অব্যবহিত পরবর্তী যুগের কথা; স্মরণযোগ্য ইতিহাসে আর কোনো কালের দৃষ্টান্ত তো খুঁজে পাই না! অতএব উনিশ শতককে বলব বাংলার দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের যুগ। শ্রীচৈতন্যের ভাবান্দোলনে আলোড়িত বাঙালী গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল সন্দেহ নেই,—কিন্তু সর্বভারতীয় স্বীকৃতি বা প্রভাবের দিক থেকে বিচার করিলে উনিশ শতকে বাঙালীর অভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে হয়েছিল বৃহত্তর ও ব্যাপকতর; জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশও এ সময়ে ঘটেছিল উন্নততর, ব্যাপ্ততর, সমৃদ্ধতর রূপে। সুতরাং অনস্বীকার্য এই সত্য যে বাঙালীর ইতিহাসে পূর্ব পূর্ব যুগের তুলনায় উনিশ শতকই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ—ভাব জগতে এ যুগে ঘটেছে বাঙালীর আত্মবিজয়, ভারতবিজয় এমনকি বিশ্ববিজয়ও! সুভাষ সেই বিজয় যুগের সমস্ত ফলশ্রুতি বহন করে জন্মালেন সে যুগের অন্তিম লগ্নে। বাংলার ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণই তাকে বলব। ইতিহাসের এই উত্তুঙ্গ মুহূর্তে যে নবজাতকের জন্ম হয়েছিল তাঁর দায় ও দায়িত্ব ছিল তাই অতি গুরুভার, তাঁকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল অতি কঠিন প্রশ্নের; সেই দায় বহন ও সেই প্রশ্নের যথার্থ সমাধান করার সামর্থ্যের ভিতরই ছিল নবযুগের নবজাতকের সিদ্ধি ও মহত্ত্বের রহস্য।

২ ॥ ইতিহাস ও ব্যক্তি

ব্যক্তিজীবনের বিকাশ রহস্য যেমন নিহিত থাকে ব্যক্তির চরিত্রের ভিতর, তেমনি কতকাংশে দেশের ইতিহাসের প্রবহমান গতির ভিতরও। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিজীবনকে স্থাপন করে না দেখলে সে দেখা সম্পূর্ণ হয় না। ব্যক্তি ইতিহাসের দ্বারা গঠিত বলেই ব্যক্তির ভিতর ইতিহাসের প্রকাশ ঘটে;—কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ইতিহাসের ধারা ও প্রবণতাগুলিকে নিজের ভিতর আত্মস্থ ও সংহত করেন, ফলে তাঁদের জীবন-দর্পণে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারা ঘনীভূতরূপে মূর্ত ও প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু যিনি দেশনায়ক, যুগমুক্তি-সাধক ঐতিহাসিক পুরুষ, তিনি শুধু ইতিহাসের ধারাগুলিকে নিজের ভিতর ধারণই করেন না, ইতিহাসকে দান করেন নতুন গতিভঙ্গী, নতুন প্রবাহ পথ। একজন ব্যক্তি দেশের মহৎ অধিনায়ক রূপে বৃত হন কখন? যখন দেশবাসী অনুভব করে যে জাতীয় ইতিহাসের সারাংসার তাঁর মধ্যে বিধৃত ও প্রকাশিত, এবং শুধু তাই নয়, ঐ ইতিহাসের ভিতর জাতির যে সকল সঙ্কট, দুর্বলতা ও ত্রুটি জমে ওঠে সেগুলি থেকেও জাতিকে মুক্ত করবেন তিনি—তখনই দেশ একজন মানুষকে অধিনায়করূপে বরণ করে। সুভাষচন্দ্রের মধ্যে জাতির আত্মদর্শন ঘটেছে বলেই তাঁকে দেখে আমাদের আত্ম-সম্বিৎ জেগে ওঠে; এবং তিনি আমাদের জাতীয় অপূর্ণতাগুলি মোচন করার মতো তেজস্বী ও সামর্থ্যবান পুরুষ বলেই তাঁর নিকট জাতির এত প্রত্যাশা। সুভাষচন্দ্রের জীবনকে তাই একবার বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে দেখা, বোঝা ও যাচাই করা দরকার; তার ফলে ব্যক্তি ও নেতা সুভাষের চরিত্র

বিকাশের কোনো কোনো গূঢ় রহস্যের মীমাংসা করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে।

বাংলার ইতিহাসের বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করলে যে সত্যটি প্রথমেই ধরা পড়ে তা এই যে ভারতের এই পূর্ব প্রান্তে বহু ভিন্ন জাতীয় উপাদান ও ঐতিহ্যের সমবায়ে একটা বিশিষ্ট জাতি ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার অবিরাম প্রয়াস ইতিহাস-পূর্ব কাল থেকে আজও পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে; ভারতীয় সভ্যতার বিশাল দেহের অঙ্গীভূত হয়েও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি অখণ্ড বাঙালী জাতির প্রবর্তনা যেন আমাদের ইতিহাসের গূঢ় নির্দেশ। আদিতে পরিস্থিতি ঠিক কী ছিল তা হয়তো নির্ণয় করা আজ দুঃসাধ্য, কিন্তু ঐতিহাসিকের মনে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই যে দু-হাজার বা এমন কি এক হাজার বছর আগেও বাংলা দেশ নামে কোনো দেশ ছিল না এবং বাঙালী নামেও কোনো জাতি ছিল না। মুসলমান রাজত্বের আগে বাংলা দেশের কোনো একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না। বাংলার এক একটি অংশ এক এক নামে তখন পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিকের মতেঃ "উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র (অথবা বরেন্দ্রী), পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। এতদ্ভিন্ন উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল। এই সমুদয় দেশের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিক নির্ণয় করা যায় না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়াছে।" (রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, পৃঃ ১)।

এই অঞ্চল বা জনপদগুলি প্রত্যেকেই ছিল স্ব-প্রধান ও পৃথক, কেউ কারও পদানত হতে চাইত না, সম্মিলিতভাবে একটা দেশ বা রাষ্ট্র গড়ে তোলার চিন্তাও তাদের ছিল না।

বাংলা দেশটাই যে শুধু এইভাবে স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত বহু জনপদে বিভক্ত ছিল তাই নয়, আমাদের জাতি-পরিচয়ের গোড়ার কাহিনীতে

পাই বহু ভিন্ন ভিন্ন জাতি, জন ও কোমের সংঘাতের কথা। কোন সময়ে বাংলা দেশে মানুষের বসতি আরম্ভ হয় তা জানার কোনো উপায় নেই। তবে প্রত্ন, নব্য প্রস্তর ও তাম্রযুগে এখানে লোক বসতি ছিল, বোলপুর অঞ্চলে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তিন হাজার বছর বা তারও আগে বাংলা দেশে সভ্যতা বর্তমান ছিল। বাংলায় প্রথম স্তরে এসেছিল নেগ্রিটো বা নিগ্রবটুগণ, তারপর মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর একটি শাখা—কিন্তু বাঙালী জাতি গঠনে এই উভয় গোষ্ঠীরই প্রভাব সামান্য। বাঙালীর ধমনীতে যাদের রক্ত আজও মুখ্যত প্রবাহিত তাদের মধ্যে বিশেষভাবে চারটি ভিন্ন জাতির নামই উল্লেখনীয়। ঐতিহাসিক লিখেছেন: "আদিমতম স্তরে আদি-অস্ট্রেলীয়, তারপর দীর্ঘমুণ্ড ভূমধ্য নরগোষ্ঠী, গোলমুণ্ড অ্যালপো-দীনারীয় নরগোষ্ঠী এবং সর্বশেষে উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশের মিশ্র আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর ক্ষীণ ধারা—এই কয়েকটি ধারার মিলনে বাঙালী জনের সৃষ্টি। অ্যালপো-দীনারীয় প্রবাহ-পূর্ব আদিম বাঙালী মুখ্যত অনার্য; আর্য-প্রবাহ প্রথম আনিল অ্যালপো-দীনারীয় জাতিই; তারপর দ্বিতীয় প্রবাহ ক্ষীণ ধারায় আনিল আদি-নর্ডিকেরা, কিন্তু উত্তর-ভারতেই সেই প্রবাহ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক উত্তর ভারতের মিশ্র আদি-নর্ডিকদের এবং কিয়ৎ পরিমাণে অ্যালপো-দীনারীয়দের আর্যভাষাই সৃজ্যমান বাঙালীজনকে একটা নূতন মানসরূপ দান করিল; আদিম বাঙালীর আদি-অস্ট্রেলীয় ও দ্রবিড় মন ও প্রকৃতির উপর ব্রাত্য অ্যালপো-দীনারীয় এবং মিশ্র আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর মন ও প্রকৃতির চন্দনানুলেপন পড়িল এবং তাহাই বাঙালীকে, বাঙালী-চরিত্রকে একটা স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য দান করিল।" (ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ৭৮-৭৯)

সুতরাং বাঙালী একটা মিশ্র বা সংকর জাতি, বহু ধারার সম্মিলনে গঠিত;—উপরে যে সব নরগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে,

পরবর্তীকালে তাদের সঙ্গে এসে আবার মিলেছে মুসলমান, পর্তুগীজ, ইংরেজের ধারা ; কম পরিমাণে হলেও এখনও বাঙালী সমাজের মধ্যে বাইরের রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে, আধুনিক যুগের সকল জীবন্ত জাতির পক্ষেই সেটা হতে বাধ্য। আদি কাল থেকে আজও পর্যন্ত বাংলার দরজা কারও জন্য রুদ্ধ হয়নি, ভারতের নানা প্রান্তবাসী মানুষ দলে দলে বাংলায় এসে এখনও তাই নিজেদের স্থান করে নিচ্ছে।

কিন্তু বহু জাতির এই আগমন, আদান-প্রদান ও মিলন-মিশ্রণ সত্ত্বেও বাঙালী তার আপন বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। যে সমন্বিত বাঙালী জাতি বাংলায় আবির্ভূত হয়েছে তার আধারে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, জন ও কোমের বৈশিষ্টাগুলি রক্ষিত হলেও সুসমঞ্জস ভাবে সেগুলি মিলে গেছে ; এবং সমস্ত মিলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের অধিবাসীদের থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র চরিত্র, প্রকৃতি, মানসিকতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অধিকারী জাতি 'বাঙালী' নাম ধারণ করে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

এইটি হল বাংলার ইতিহাসের অন্তর্লীন গূঢ় নির্দেশ—বহু বিচিত্র. বিশিষ্ট, এমনকি ভিন্নমুখী উপাদানের সমন্বয়ে একটি অখণ্ড বাঙালী জাতির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। বাংলায় ইতিহাসের এই জাতিগঠন-প্রয়াসী ধারা প্রাচীনতম কাল থেকেই বইছিল, কিন্তু শশাঙ্কের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার (৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ) সময় থেকে বাঙালীর একজাতিত্ব লাভ যেন সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। পাল ও সেন রাজাদের আমলে এই ঐক্যের ধারাটিই বেগ ও ব্যাপকতা লাভ করেছিল। পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ এই তিনটি ক্ষমতাকেন্দ্র দেশ ও জাতির এই সংহতি সাধনের দায়িত্ব নিয়েছিল—পরে গৌড় ও বঙ্গের হাতে সে দায়িত্ব চলে যায়। এবং তারপর একসময় গৌড়ের সাংস্কৃতিক প্রাধান্যতলে সমগ্র বাংলাদেশ একত্রীভূত হয়েছিল।

বাঙালীর ইতিহাসের এই পৃষ্ঠপটে সুভাষচন্দ্রের জীবনকে স্থাপিত করে দেখা দরকার। কারণ বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির

ভাঙা-গড়ার ধারা আজও পরিসমাপ্তি লাভ করেনি। বাস্তব সত্য এই যে এক অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতি গঠনের কাজ আজও শেষ হয়নি, শেষ হবার পথে বাধাও রয়েছে অনেক। গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ যে প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সেদিক থেকে তা হল হিন্দু ও মুসলমানের সমস্যা। বাংলায় এই দুইটি সম্প্রদায়ের বিরোধ এই শতাব্দীতে চূড়ান্ত আকার নেওয়ায় নতুন করে দেশ খণ্ডনও স্বীকার করে নিতে হয়েছে। বাঙালী জাতির ঐক্যের পথে এই বিরাট বাধার প্রশ্নটিকে একটু গভীর দৃষ্টি নিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। কেননা সুভাষের চেতনায় অখণ্ড বাংলা ও বাঙালীর শাশ্বত রূপই বিধৃত ছিল, তাঁর জীবনের সম্বেগও ছিল বাঙালীর জাতীয় ঐক্য সাধনের দিকে। তাঁর ইতিহাস-চেতনা কি তবে ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল?

আমাদের দেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের আবির্ভাব-রহস্যের ভিতর একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। মুসলমানরা যখন বাংলায় প্রথম এসেছিল তার আগেই বাঙালী তার জাতিবৈশিষ্ট্য লাভ করে গেছে, হিন্দু সমাজ ও সভ্যতার বিকাশও পরিণতি লাভ করেছে। বাংলায় বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য—এখানকার জনপ্রবাহের মধ্যে তাদের পক্ষে মিলে মিশে যাওয়াটাই স্বাভাবিক হত, কি : তা হয়নি। পাঠানরা তো সম্পূর্ণ বাঙালী বনে গিয়েছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক ইসলাম ধর্ম এখানে প্রসার লাভ করেছিল—বাঙালী হিন্দু দলে দলে ভয়ে, অত্যাচারে অথবা প্রলোভনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সমাজের অনুদারতা ও উৎপীড়নও ইসলামের কোলে নিম্নশ্রেণীদের ঠেলে দিয়ে থাকবে।

সমাজের নিচু স্তরের লোকরা ছিল গরীব ও অনাদৃত;—ধর্ম পরিবর্তন রূপ বিদ্রোহের পরও সে ভাগ্য তাদের কিন্তু পালটায়নি। মুসলমান শাসনকালে কোনো কোনো নব দীক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিগত ভাবে হয়তো ভাগ্যোন্নতি ঘটিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সম্প্রদায়রূপে

নব মুসলমানরা পূর্বেও যে তিমিরে ছিল পরেও সেই তিমিরেই থেকে গিয়েছিল। কারণ রাজা মুসলমান হলেও ভূস্বামী ও জমিদাররা চিরকাল হিন্দুই ছিলেন আর জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত ক্ষমতার মালিক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। পাঠান, মুঘল ও ইংরেজ এই তিন আমলেই কেন্দ্রীয় রাজশক্তি যারই হাতে থাকুক না কেন হিন্দুই ছিল অর্থবান, প্রতিষ্ঠাবান ও শিক্ষিত এবং জমিদারি, তালুকদারি, জায়গীরদারি তাদেরই করায়ত্ত থাকায় সারা দেশে তাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। বাংলার নিম্নশ্রেণী, বর্ণ হিন্দুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যেই যদি ইসলাম ধর্ম বরণ করে থাকে তবে বলতেই হবে যে সে বিদ্রোহের কোনো সুফল দেখা দেয়নি, কারণ বর্ণ হিন্দুর প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে তারা নষ্ট করতে পারেনি বরং নিজেরা দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অসমাদৃতই থেকে গিয়েছিল।

মুসলমান সমাজের সত্যকার জাগরণ এদেশে কখনোই ঘটেনি—মুসলমান নবাবদের আমলেও না, ইংরেজ আমলেও নয়। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগৃতির আলো তাদের সমাজের অন্তর্দেশ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখ হয়ে থাকার কারণে বাঙালী মুসলমানদের ভাগ্য আধুনিক কালে বরং আরও বিড়ম্বিত হয়ে গিয়েছিল। মধ্যযুগের বাংলায় যে একটা বিপুল জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল তার নায়ক ছিলেন চৈতন্য ও তৎপরিকরবৃন্দ; মুসলমানরা তদ্দ্বারা প্রভাবিত হলেও তারা নিজস্ব কোনো প্রগতিশীল আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেনি বা বৈষ্ণব আন্দোলনের ব্যাপক অংশীদারও হতে পারেনি। উনিশ শতকের বাংলার ব্রাহ্ম আন্দোলন, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষা, নারীমুক্তি প্রভৃতি কোনো কালোচিত আন্দোলনেই মুসলমানরা ব্যাপকভাবে অংশ নেয়নি, বিশ শতকের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেও তাদের উপস্থিতি কুণ্ঠিত ও খণ্ডিতই ছিল।

যে নবজাগৃতি হিন্দু সমাজের পক্ষে আবশ্যকীয় ছিল, মুসলমান

সমাজের পক্ষেও তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। হিন্দু বরাবরই এদেশের সমাজে—রাষ্ট্রে না হলেও—উচ্চাসন দখল করে বসেছিল; বিদ্যা, শিক্ষা ও ধন ছিল তাদেরই করতলগত। তাই তাদের প্রগতিভাবনা যতটা সুস্পষ্টভাবে আকারিত হয়েছে, মুসলমানরা স্বভাবতই অনগ্রসর, শিক্ষাবঞ্চিত ও দরিদ্র থাকায় নবজাগৃতির ভাবধারাকে তারা সে তুলনায় মূর্ত করতে পারেনি। কিন্তু অগ্রগতির আকৃতি ও বিকাশের আতি তো তাদের মধ্যেও ছিল। সেই আকৃতি ও আতি আত্মপ্রকাশের কোনো স্পষ্ট পথ পায়নি। তাই মুসলমান সমাজের মধ্যে একটা অবরুদ্ধ কামনার জ্বালা সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনাচক্রে সেই সময়েই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াবার আয়োজন হয়েছিল এদেশে; বাঙালী মুসলমানরা তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

বাংলাদেশ বিভাগের ফলে হিন্দু ও মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে অখণ্ড বাঙালী জাতি গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে বলে আপাততঃ মনে হয়,—কিন্তু বাংলার ইতিহাসের ইঙ্গিত এই ব্যর্থতার অভিমুখে নয়। দেশ খণ্ডনের ফলে বাঙালী মুসলমান লাভ করেছে একটা আপন ভূমি, নিজেদের একটা রাষ্ট্র; আত্মবিকাশের অভূতপূর্ব একটা সুযোগ তারা সেখানে পেয়েছে। শিক্ষা, সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা তারা লাভ করেছে, আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলে জাত আভিজাত্যও তারা ফিরে পেয়েছে। যে হীনমন্যতার বোধ একদা এদের আক্রমণ করে ভারাক্রান্ত ও পীড়িত করে তুলেছিল ক্রমেই তা থেকে তারা মুক্ত হবে—এটাই প্রত্যাশিত। তার ফলে হিন্দুর যে অগ্রগতির ধারা তার সঙ্গে মুসলমানের অগ্রগতির ধারা মিলে মিশে যাবার এমন একটা সুযোগ ও সম্ভাবনা দিগন্তের কোলে দেখা দিতে পারে, ইতিপূর্বে যা হয়তো কখনো কল্পনাই করা যায়নি। দুটি আত্মপ্রত্যয়শীল, বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মিলন ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে শক্তিশালী বাঙালী জাতির প্রতিষ্ঠা ঘটা ইতিহাসের দিক থেকে অযৌক্তিক বা অসিদ্ধ নয়।

দেশ ভাগের অভিজ্ঞতাও আমাদের সমাজে নতুন নয়। বখতিয়ার খিলজীর কাছে পরাস্ত হয়ে লক্ষ্মণ সেন যখন নদীয়া পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে এসে আশ্রয় নেন তারপর অর্ধ শতাব্দী কাল পূর্ববঙ্গে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব ছিল। বস্তুতঃ সে সময় বাংলা দেশ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়ঃ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ—একদিকে হিন্দু রাজত্ব অন্য দিকে মুসলমান রাজত্ব। কালক্রমে এই বিভাগের রেখা মুছে গিয়েছিল। ভবিষ্যতের গর্ভে কোন সম্ভাবনা নিহিত আছে সে অনুমান না করেও বলা যায় বাংলার ইতিহাসে দেশভাগের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে তাতে দেশভাগের স্থায়িত্ব সমর্থিত হয় না। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত পার হয়ে গেলেও, না।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে বাংলার ইতিহাসের অন্তঃশায়ী ঐক্যমুখী প্রবণতা ও অখণ্ড বাঙালী জাতি প্রতিষ্ঠার গূঢ় আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্বন ঘটেছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অসাম্প্রদায়িক। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই জাতির বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে ডাক দিয়েছিলেন হিন্দু ও মুসলমান রূপে নয়, এক অখণ্ড জাতির প্রতিভূরূপে। তাঁর গঠিত জাতীয় সরকার ও জাতীয় সৈন্যবাহিনী হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে এক অখণ্ড জাতীয় সত্তার বোধে উদ্দীপিত করেছিল ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমান অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়কে তার সাম্প্রদায়িক স্বার্থের নামে ডেকে আনার প্রচেষ্টা দেখা দেয়। তাতে সাম্প্রদায়িক চেতনাই ব্যাপক হবার উপায় প্রশস্ত হয়েছিল, প্রকৃত জাতীয় বোধ জন্ম নেয়নি। সুভাষ ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে তুষ্ট করার মনোভাবের কঠোর সমালোচক। তিনি দেশের সকল সমস্যাকে জাতীয়তাবাদের দৃষ্টি কোণ থেকে দেখতেন, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীকে রূপান্তরিত করে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর স্থাপনা করতেন। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলন যখন তিনি আরম্ভ করেন তখন ভারতের বিখ্যাত জাতীয়

নেতারা বিদ্রূপ ও বিরোধিতা করেছিলেন! কিন্তু তিনি সেই আন্দোলনেও মুসলমানকে মুসলমানরূপে ডাক দেননি,—যদিও যে কোনো চতুর রাজনীতিকের পক্ষে সেটা করাই হত স্বাভাবিক। মুসলমান নবাবদের নামে মিথ্যা আরোপিত কলঙ্কের চিহ্ন রূপে নয়, তিনি জাতির অবমাননার প্রতীক রূপেই ঐ মনুমেণ্টটিকে অপসারণ করার দাবী জানিয়েছিলেন।

সুভাষ ছিলেন অখণ্ড বাংলা ও অখণ্ড ভারতের সাধক,—কোনো সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের যূপকাষ্ঠে অন্য সম্প্রদায়কে বলি দিয়ে সে অখণ্ডতা ও ঐক্য আনা যাবে, এ মত তাঁর ছিল না। দেশবন্ধুর নিকট হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমদৃষ্টির দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম-প্রাঙ্গণে উভয় সম্প্রদায়ের সমঝোতার ভিতর দিয়ে এক অখণ্ড বাঙালী জাতি গঠনের স্বপ্ন ও সাধনা ছিল দেশবন্ধুর ; সুভাষ নিজের দায় স্বরূপ সেই সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন যে জিন্না ও মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেস যদি সমঝোতায় আসত তাহলে সাম্প্রদায়িকতা বিকট আকার নিয়ে মাথা তুলত না, পাকিস্তানের চিন্তা জন্মলাভ করত না, জিন্না দেশভাগের দাবী জানাতেন না। বৃটিশের ষড়যন্ত্র ছিল, কিন্তু গান্ধীজীর ভ্রান্তি ও নেহরুর অবিবেচনা ও দম্ভ পাকিস্তান দাবী ওঠার জন্য অনেকাংশে দায়ী। বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার ছোবলকে শান্ত ও বিষমুক্ত করার শেষ চেষ্টা করেছিলেন সুভাষ, ফজলুল হকের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন প্রস্তাব তুলে ; কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড সে প্রস্তাবের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে হক মুসলিম লীগের ছত্র তলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রান্ত থেকে সুভাষ অক্লান্ত কণ্ঠে দেশভাগের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আমাদের সাবধান করেছিলেন, আমাদের জাতীয় সত্তার অখণ্ড রূপ রক্ষার জন্য তাঁর ছিল জ্বলন্ত

আহ্বান। সুভাষের জীবনে ও কর্মে বাংলার ইতিহাসের কোন ইঙ্গিত রূপ পেয়েছে সে বিষয়ে সংশয় পোষণ করার কারণ নেই।

২

বাঙালীর যে মিলন ও ঐক্যের সাধনা তা নিজ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকেই তৃপ্ত হতে পারেনি। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলা আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই মিলতে চেয়েছে। এই মিলন প্রয়াসের পরিচয় আছে পুরাণের নানা কাহিনীতে, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈনদের শাস্ত্রে। ঐতিহাসিক কালে দেখি আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন তখন বাঙালী রাজা উগ্রসেন বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।—রাজ্যটির নাম ছিল গঙ্গারিদি ও প্রাচ্য যুক্তরাষ্ট্র। উগ্রসেনের ঐশ্বর্য, শক্তি ও সৈন্যবলের কথা শুনেই আলেকজাণ্ডার বিপাশা অতিক্রম করেন নি।

আর্যাবর্তে বাঙালীকে দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন শশাঙ্ক। ৬০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন গৌড়ের স্বাধীন রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত হন বাংলা তখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে, তার দৃষ্টি হয়েছে দূর প্রসারিত, তার হৃদয়ে ঘটেছে শক্তির জাগরণ। তাঁর সময়ে বাংলা দেশ পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল: কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। সমতট সম্পর্কে সংশয় থাকলেও আর চারটি জনপদ নিঃসন্দেহে শশাঙ্কের অধীনে এসেছিল এবং এই সমস্ত মিলিয়ে তিনি একটি অখণ্ড গৌড়তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাংলার আত্মশক্তি এইভাবে মূর্তি লাভ করার পর আত্মবিস্তারে ব্রতী হয়েছিল: শশাঙ্ক প্রথমে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মৌখরিরাজ-শক্তিকে কূটনীতি ও বাহুবলে সমূলে ধ্বংস করেন, তারপর সকলোত্তরপথনাথ হর্ষবর্ধনকে সার্থক প্রতিরোধ দান করে বঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার সমবায়ে একটি পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। শশাঙ্ক বাংলা দেশকে নতুন করে উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করিয়েছিলেন। শশাঙ্কের আমলে বাংলার আরও

যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল তা হল এই: গৌড়তন্ত্র বা বাঙালীতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সুস্পষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজাদর্শ, দৃঢ় ও মজবুত প্রশাসনিক কাঠামো, সামন্ততন্ত্র, সওদাগরী ধনতন্ত্রের বদলে ভূমি ও কৃষি নির্ভর সমাজ, গ্রামকেন্দ্রিক জীবন ও সংস্কৃতি এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের প্রসার। গুপ্ত যুগে বাংলায় যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পত্তন ঘটেছিল সেই সংস্কৃতিকে দানা বাঁধতে ও বাঙালী সমাজকে তার দ্বারা জারিত করতে অবকাশ দিয়েছিলেন শশাঙ্ক—সংস্কৃতির এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দেবার মাধ্যমে তাঁর দূরদৃষ্টি ও সমাজ-বোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আসল কথা এই যে বাংলার তখন একটা নতুন গঠন চলছিল—সেই গঠনের পক্ষে বিপত্তিজনক কোনো কাজ শশাঙ্ক করেননি। বাংলাব আত্মগঠনের মূল সূত্রগুলি যেন ছিল সেদিন শশাঙ্কের করবিধৃত—সেই হিসাবে তিনি বাংলার আদিযুগের অন্যতম ইতিহাস-পুরুষ এবং নিঃসন্দেহে সুভাষচন্দ্রের পূর্বসূরী। শশাঙ্ক ও পরবর্তী পাল ও সেন রাজাদের জীবন ও কীর্তির আলোয় আধুনিক কালের সুভাষচন্দ্রের জীবন আমি কেন বুঝতে চাইছি, আশা করি, বাংলার ইতিহাসের ইঙ্গিত এতক্ষণ অনুসরণ করে এসে পাঠকের কাছে সে কাবণ আর অস্পষ্ট নেই।

শশাঙ্কের মৃত্যু হয় ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দের কিছু আগে। তারপর পুরা এক শতাব্দী বাংলা দেশে এক অভিনব ভাঙা-গড়ার কাজ চলেছিল। ঐতিহাসিকরা তাকে অন্ধকারময় যুগ ও মাৎস্যন্যায়ের কাল বলে বর্ণনা করলেও সে যুগটা যে ক্ষয়-ক্ষতিতেই শুধু পূর্ণ ছিল তা বলা যায় না। বাংলার জাতীয় জীবন গড়ে ওঠার মুখেই সৃষ্টিকর্তা যেন তাকে মূল শুদ্ধ একবার নেড়ে দিয়েছিলেন—শিকড়টা যাতে ভবিষ্যতে আরও শক্ত ও পুষ্ট হয় সেই উদ্দেশ্যে। শশাঙ্কের আসনে বসার উপযুক্ত রাজা একশ বছরেও আর মেলেনি; এমন কি কোনো রাজাই পুরোপুরি এক বছরও গৌড়ের সিংহাসনে বসতে পারেননি। ফলে সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত

বাংলায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় ছিল না, ব্যবসা-বাণিজ্য তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণেও দেশ জর্জরিত হয়েছিল। এই দুর্দশার সময়ে বাঙালী জনসাধারণের কষ্টের কথা অনুমান করতে পারি ; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যাকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বলে মনে হয় তার অন্তরালে যে একটা সমন্বয়ের কাজ চলছিল সে সময়ে, সে কথাই বা অস্বীকার করি কিভাবে? দেখছি এই সময়ে সংস্কৃত ভাষার চর্চা বাংলায় অভূতপূর্ব ভাবে বেড়ে গেছে, অপূর্ব ছন্দ লালিত্যময় কাব্যময় ভাব প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে সংস্কৃত, বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছে, তার সঙ্গে বাংলায় এসেছে বৌদ্ধ সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বিহার। অথচ ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসারও ক্রম-বর্ধমান, হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা ক্রমব্যাপক। বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির মিলনভূমি হয়ে দাঁড়াল বাংলা দেশ এবং সেই মিলনের অন্যতম ফলশ্রুতি হল বাংলায় তন্ত্রের বিকাশ ও প্রসার।

মাৎস্যন্যায়ের একটা শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে সম্পূর্ণ ব্যর্থ যায়নি। জাতির আধারটাকে শুদ্ধ ও ধারণক্ষম করে নেবার জন্যই যেন দেশটাকে ওলট-পালট করে নেওয়া হয়েছিল। তারই ফলে বাংলার নিজস্ব স্বভাব ও নিজস্ব ধর্ম যেন আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেই ধর্মকেই এক কথায় বলা যায় তন্ত্র।

বাংলার আত্মশক্তি যে শত দুর্যোগেও বিনষ্ট হয়ে যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল বাংলার নেতাদের এক অসাধারণ ত্যাগ ও দুঃসাহসপূর্ণ কাজে। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি, আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নেতৃবৃন্দ গোপাল নামে এক ব্যক্তি, যিনি রাজা ছিলেন না, যাঁর বংশ মর্যাদাও ছিল না, তাঁকে বাংলার রাজা নির্বাচিত করেছিলেন। ইতিহাসে এরকম ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল। যে শক্তি ইতিপূর্বেই বাঙালীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছিল সেই শক্তিই এই নির্বাচনের মাধ্যমে একটা কেন্দ্রীভূত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল : গোপাল সমগ্র বাংলা দেশকে তাঁর শাসন তলে এনে সকল বিশৃঙ্খলা

ও নৈরাজ্য দূর করলেন, এক অখণ্ড শক্তিশালী বাংলা গড়ে তুললেন। বাংলায় এই পাল রাজত্ব চারশ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

গোপালের পুত্র ধর্মপাল (আ ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ) শশাঙ্কের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন। ভারতে তখন তিনটি প্রধান রাজবংশঃ উত্তর-ভারতে গুর্জর প্রতীহার, দক্ষিণভারতে রাষ্ট্রকূট এবং পূর্বভারতে পালবংশ। সকলেরই লক্ষ্য ছিল কনৌজ-রাজলক্ষ্মী বা মহোদয়শ্রীর অধিকার লাভ—কেননা আর্যাবর্তের প্রভুত্ব লাভের সেটাই ছিল প্রতীক। ধর্মপাল বীরত্ব, বুদ্ধি ও কতকটা অনুকূল পরিস্থিতির সংযোগে এই অধিকার লাভ করেছিলেন। ধর্মপালের সাম্রাজ্য সিন্ধুনদ ও পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদভূমি পর্যন্ত, উত্তরে নেপাল থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতও অতিক্রম করে আরও দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁকে বলা হত উত্তরাপথস্বামী, কিন্তু গৌড়-বঙ্গ-মগধই ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল। ঐতিহাসিকের মতেঃ "অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে দেশ পরপদানত এবং অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল, সেই দেশ সহসা প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া সমগ্র আর্যাবর্তে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিবে, ইহা অলৌকিক কাহিনীর মতোই অদ্ভুত মনে হয়। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়।···ধর্মপালের রাজ্য বাঙালীর জীবন-প্রভাত।" (রমেশচন্দ্র মজুমদারঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৪২)

ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক আধুনিক বাংলার ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের কর্মধারার ফলাফলনির্ণয় করতে গিয়ে অনুরূপ কথাই হয়তো লিখবেন। নতুন যুগের নতুন পরিবেশে 'সাম্রাজ্যবিস্তার' শব্দটি অবশ্য ব্যবহার করা চলবেনা। কারণ সুভাষচন্দ্রের জীবনকে আশ্রয় করে বাংলা দেশ সাম্রাজ্য বিস্তার করতে যায়নি,—কিন্তু আপন প্রভাব বিস্তার ও নিজ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই করেছে। এবং অনুরূপ ব্যাপারে ধর্মপালকে যে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সুভাষচন্দ্রকেও ঠিক সেই একই বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, ধর্মপাল যেখান থেকে সাহায্য

পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রও ঠিক সেই স্থান থেকেই সাহায্য পেয়েছেন। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সুভাষের বিরুদ্ধ শক্তি ছিলেন গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের নেতারা বা সংক্ষেপে বলা যায় এলাহাবাদ + আমেদাবাদ চক্র। তাঁর সহায় ছিল দক্ষিণ ভারত। এ ছাড়া বাংলা সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবেই তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি আত্মনিবেদিত ছিল। ধর্মপালেরও জীবনে ঘটেছিল তাই। তিনি ছিলেন বাংলার নাথ, বাধা পেয়েছিলেন গুর্জর-প্রতীহার বংশের নিকট থেকে (উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট), সাহায্য পেয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজ্যের নিকট থেকে। তাঁর পুত্র দেবপালের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ধর্মপাল-দেবপাল বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারকে প্রসারিত করতে পারায় সমগ্র বাঙালী জাতির হৃদয়ে যে শক্তির উল্লাস ও পরিপূর্ণতার বোধ এসেছিল, সুভাষের সাফল্যে বাঙালী সেই একই উল্লাস ও পরিপূর্ণতার তৃপ্তি অনুভব করেছে—এবং বাঙালীর শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে বাংলার অধিনায়ক রূপে প্রকাশ্যে বরণ করেছিলেন ঐ অনুভবের প্রেরণায়।

একালের সুভাষচন্দ্র সেকালের ধর্মপাল-দেবপাল-মহীপালের মতো সাম্রাজ্য বিস্তার করেননি, বাংলার সীমারেখাকেও প্রসারিত করেননি। বস্তুতঃ তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা ছিলও না। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি; বিশেষ-ভাবে বাঙালীর জন্য কিছু করার মতো সময় ও সুযোগ তাঁর ছিল না। তবু সুভাষকে অবলম্বন করে ভারতের রাজনীতিতে বাংলার একটা উত্থান ঘটেছিল। সে উত্থান অবশ্য সুরু হয়েছিল আরও আগে থেকে—সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিন পাল, দেশবন্ধু ভারতের রাজনীতিকে ইতিপূর্বেই প্রভাবিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল ব্যক্তিগত; আর সুভাষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল সমগ্র বাংলার সংহত ইচ্ছাশক্তি। তাঁর এক একটি পদক্ষেপের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকত সারা বাংলা; তাঁর এক একটি জয় বঙ্গ

জননীর কণ্ঠে পরিয়ে দিত নব নব জয়মাল্য। এমন করে আর কোনো যুগে কোনো নেতার সঙ্গেই বাঙালী জাতির identification বা অভেদ-বোধ ঘটেনি। যেদিন সুভাষকে কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে সেদিন অখণ্ড বাঙালী জাতি একত্রে ও স্বতঃসিদ্ধভাবে পরাজয় ও অপমানের ভারে যে ভাবে বিষণ্ণ, বেদনাহত, ক্রুদ্ধ হয়েছিল সেই দৃশ্য বাঙালীর জীবনেতিহাসে আর কখনো দেখিনি। একদিন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা পলায়নপর হয়েও কোনো বাঙালীর ঘরে আশ্রয় পাননি, তারও আগে একদিন বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনকে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে ফেলে সমস্ত বাঙালী স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল এবং লক্ষ্মণ সেনেরই কোনো কোনো স্বদেশীয় বখতিয়ার খিলজীকে আহ্বান করে, পথ দেখিয়ে, গোপন ষড়যন্ত্র করে নিয়ে এসেছিল :—নেতার সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ কতখানি ক্ষীণ ও দুর্বল হতে পারে সে দৃষ্টান্তে ইতিহাসের পাতা এমনি করেই ভরে আছে। কিন্তু সুভাষ আর বাংলা এমন একটা অভেদ্য নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছে যে আজও কোনো অবাঙালীর মুখে সুভাষের প্রতি একটিও নিন্দাবাক্য উচ্চারিত হলে বাঙালী জাতি যেন মুহূর্তে প্রতিশোধ-পরায়ণও হয়ে উঠতে পারে।

সুভাষের জীবনকথা আলোচনা করতে গিয়ে শশাঙ্ক-ধর্মপাল-দেবপালের কথা কেন যে উল্লেখ করেছি সে কারণ এতক্ষণে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সুভাষের মধ্যে বাংলার জীবনাকাঙ্ক্ষা প্রতিবিম্বিত হয়েছে শুধু নয়, সুভাষ যেন বাংলার জাগ্রত চেতনার প্রতিমূর্তি। তাই সমগ্র ভারতের মুক্তি ও কল্যাণের উদ্দেশে আত্মনিবেদিত সুভাষের কর্মধারায় বাংলার স্বার্থসিদ্ধি কতখানি ঘটেছে বা ঘটেনি সে প্রশ্ন আদৌ বিচার্য নয়,—সে প্রশ্ন কেউ কখনো তোলেও নি। বাঙালী সমাজে সমকালীন প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাপিয়ে সুভাষের মাথা যেদিন উচু হয়ে উঠেছিল, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত ক্ষণতরেও বাঙালী একথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনি যে তুমি আমাদের

কী দিয়েছ,—বরং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তারা, কঠোর সংগ্রামের পথে তাঁর যে অমোঘ আহ্বান তাতে সাড়া দিয়েছে তারা প্রাণভয় তুচ্ছ করে, আর তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে ভারতের মুক্তি পতাকা তুলে ধরেছে উর্ধে গর্বোদ্ধত ভঙ্গীতে। পরিণামে যখন জুটেছে সর্বনাশ ও ভাগ্যের কুটিল বিদ্রূপ তখন ওই ভাগ্যকেই বাঙালী দোষ দিয়েছে ; কিন্তু দুঃখের তিমিরতলে ডুবতে বসেও, সুভাষের আহ্বান বৃথা ছিল, ভুল ছিল,—আনেনি এ অভিযোগ। বরং সুভাষ লোকান্তরিত হয়েছেন এ সংবাদ প্রচারিত হবার পরও সর্বদাই আকুল আগ্রহে ও নিবিড় শ্রদ্ধায় বাঙালী ওই নামটিকে, ওই ব্যক্তির স্মৃতিটাকেই আঁকড়ে ধরেছে। সে পারেনি মন্বন্তরের মারকে প্রতিহত করতে, যুদ্ধের অরাজক লীলাকে দমিত করতে, পারেনি দেশভাগকে রোধ করতে—এবং বাঙালী পারেনি তার ওপর অনুষ্ঠিত অবহেলা, অন্যায় ও অত্যাচারজাত মর্মন্তুদ অবস্থার প্রতিকার করতে ; কিন্তু একটি জায়গায় তাকে কেউ পারেনি টলাতে,—সে সুভাষের প্রতি তার অটল শ্রদ্ধা। সুভাষের যে অমর রূপখানি বাঙালী জাতির হৃদয়ে ও মানসে বিধৃত হয়ে আছে, বহু কুচক্রীর চেষ্টা ও উগ্র মতবাদের আক্রমণ একযোগেও সে রূপখানিকে এতটুকুও ম্লান করে দিতে পারেনি। কেন সুভাষকে বাঙালী এমন শাশ্বত ভালোবাসা দান করল,—এই অকম্পিত অনুরাগের উৎস কোথায় ? সে রহস্য খুঁজতে হবে ওই নেতার সঙ্গে জনতার আইডেন্টিফিকেশন তথা সহৃদয়হৃদয়-সম্বাদের মধ্যে। আর জাতি ও নেতার এই যে অদৃষ্টপূর্ব অভিন্নতাবোধ এরও মূল জাতির সমগ্র চিত্তের প্রতিবিম্বন নেতার মধ্যে ঘটাতেই নিহিত। একদিন শশাঙ্ক-ধর্মপাল-দেবপালকে অবলম্বন করে বাঙালীর যে আত্মশক্তির ও আত্মবোধের স্ফূর্তি ও তজ্জনিত মানসোল্লাস ঘটেছিল ;—এযুগে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সুভাষচন্দ্রের জীবনকে কেন্দ্র করে। বাংলার ইতিহাস নতুন করে কথা বলেছে, তার হারানো লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে সুভাষের মধ্যে।

ইতিহাসের চলমান প্রবাহের আলোয় সুভাষজীবনকে না দেখতে শিখলে আমাদের দৃষ্টি খণ্ডিত, তাই ভ্রান্তই থেকে যাবে। তাহলে বৃথা হবে সেই চরিত্রের আলোচনা, অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর হবে তাঁর জীবন-কাহিনী উদ্ধারের প্রয়াস। ইতিহাস ও ব্যক্তি যেখানে এসে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে যায় সুভাষ দাঁড়িয়ে আছেন তেমনই একটা ক্ষেত্রে —তাই তাঁর জীবনী জাতির এক যুগের জীবনীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কে এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করবে?

৩

শুধু বাংলার ইতিহাসের ধারাই নয়, বাঙালীর যে মৌল জীবনধর্ম, যে গূঢ় জীবনান্বেষা ও আকূতি, সুভাষচন্দ্রের মধ্যে তারও প্রতিবিম্বন দেখতে পাই। ঐতিহাসিকের আহৃত তথ্যকে অবলম্বন করে প্রাচীন বাঙালীর ধর্মীয় প্রত্যয় ও সাধনার যে চিত্র আমরা কল্পনা করতে পারি তাতে দেখা যায় যে গোড়া থেকেই বাঙালী ধর্ম ও জীবন, ইহলোক ও পরলোক, তত্ত্ব ও বাস্তব, ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরোধী ছিল: একটা সামগ্রিক দৃষ্টিতে সে মৃত্যু ও জীবন, ইহতত্ত্ব ও পরতত্ত্বকে একত্রে গ্রথিত, সমন্বিত তথা অবিনাভ:ব বদ্ধ রূপে দেখেছে। আজকের মতো প্রাচীন কালেও কৃষিকর্মই ছিল বাঙালীর প্রধান জীবিকা:—কিন্তু মাঠে গিয়ে হল চালনা, বীজ ছড়ানো, ধান বোনা, ফসল কাটা, নতুন ধান বাড়ির গোলায় তোলা,—প্রভৃতি বাস্তব কর্মকে শুধু জৈবিক তাগিদে সম্পন্ন করার বদলে তার সঙ্গে সে মিশিয়ে দিয়েছে তার জীবনোৎকণ্ঠা, তার ইহ পর লোকের বিশ্বাস, তার তত্ত্ববোধ। তার তত্ত্বভাবনাকে লোকগ্রাহ্য রূপ দিতে যেয়ে সে উদ্ভাবন করেছে নানা আচারানুষ্ঠান, ব্রত, পূজা ইত্যাদি। আজও গ্রাম বাংলায় সেগুলির প্রচলন অব্যাহত। প্রতিটি অনুষ্ঠানই বিচিত্র শিল্পসুষমায় ও জীবনের সুসম আনন্দে মণ্ডিত! শুধু কৃষিজীবনকে অবলম্বন করেই নয়, শিল্পজীবনেও বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাঁপর,

কুমোরের চাকা, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙ্গল, ছুতোর-রাজমিস্ত্রীর কারুযন্ত্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করে এক ধরণের ধর্মকর্মানুষ্ঠান আজও প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিকের মতেঃ "এই সব গ্রাম্য কৃষি ও কারুজীবনের পূজাচারকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালীর ধর্মকর্মময় জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, শিল্পময় জীবনের অনেক মাধুর্য ও সৌন্দর্য, এই সব আচারানুষ্ঠানের অনেক আবহ ও উপচার আমাদের 'ভদ্র' স্তরের আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত হইয়া গিয়াছে।" (ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ঃ বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৫৭৯)

অর্থাৎ বাংলায় আর্যদের আগমনেরও পূর্বে যে বাঙালী জাতির সূচনা হয়েছিল তাদের ধর্মবোধ জীবনবিচ্যুত বা জীবনবিমুখ ছিলনা, এমনকি মৃত্যুকেও তারা জীবনের বিপরীত বলে ভাবেনি, মৃত্যুতে জীবনের ছেদ পড়ে যায় একথাও তারা স্বীকার করেনি। বাঙালীর ধর্মীয় প্রত্যয় জীবনকে একটা প্রবাহ রূপে স্বীকার করে নিয়েছে—জোয়ার ভাঁটার নিয়মে যার চলাচল এবং এই মর্ত্যলোকে তার যে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা তা মিথ্যাও নয়, মায়াও নয়; পৃথিবীর ধূলিকে চুম্বন করেই লোকোত্তর, অপার্থিব, দিব্য সত্য আপনার পূর্ণভাব আস্বাদন লাভ করে—কেননা সত্যের পরিণাম ও সার্থকতা রসে, আনন্দে; দুঃখময় এ জগৎ রসসিন্ধুর দ্বারও বটে। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের এই যে সম্মিলন, লোক ও লোকোত্তরের এই যে যৌগপদ্য—সকল রসের এই হচ্ছে আদি উৎস, আর রসের আধার বলে রূপ নশ্বর হয়েও মধুর, শাশ্বতের মর্যাদাভিলাষী। বাঙালীর চিত্তে রসের তৃষ্ণা বা আকূতি অতি আদিম, সেই তৃষ্ণার নির্বাণ রূপলোকের মধ্যে অসীম ও অনির্বচনীয়ের মধুর প্রকাশ আস্বাদনে। তাই বাঙালীর নিত্য কর্ম ও স্থূল জীবনোপকরণ নেহাৎ স্থূল ও জড়ই নয়; চেতনার আবেশে সেগুলিও চিন্ময়। আবার পক্ষান্তরে পরম চৈতন্যও বাস্তবের সম্পর্কচ্যুত হয়ে আনন্দিত নন, তিনিও সমস্ত সাধারণ বস্তু,

কর্ম ও রীতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে রসমধুর হয়ে উঠেছেন। সত্যের এই দ্বিবিধ বা যুগ্ম রূপকে আলিঙ্গন করেই বাঙালী স্থাপন করেছে তার ধর্ম ও সাধনার ভিত্তি।

বাংলার আদিম ধর্ম কী ছিল আজ তার সব পরিচয় উদ্ধার করা যায় না, তবে হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতার উদবর্তনের ভিতর দিয়ে বাঙালীর ধর্মসাধনা দুটি প্রধান রূপ নিয়েছে: তন্ত্র ও বৈষ্ণব। তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্ম ভারতের অন্যান্য স্থানেও প্রচারিত হয়েছিল, কিন্তু বাংলায় এই দুটি ধর্মপথের বিকাশ অভূতপূর্ব—বাঙালীর ধর্মসাধনা আজও পর্যন্ত এই দুটি যুগ্ম পথেই প্রবাহিত হয়েছে।

বাঙালীর ধর্মীয় বোধ ও ধর্ম সাধনা সুভাষচন্দ্রের জীবনে কীভাবে ও কতখানি প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা একবার দেখা দরকার। তিনি ছিলেন রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ, রাজনৈতিক কলাকৌশলে অভ্যস্ত মানুষ, পোশাকে, কথাবার্তায় ও আচরণে ছিলেন একান্ত আধুনিক, বিজ্ঞানে ছিল তার দৃঢ় আস্থা। গান্ধীজীর মতো একটা ধর্মীয় বেশ ও ভঙ্গী রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি পছন্দও করেননি;—কোনোদিন কাউকে তিনি ধর্মোপদেশ দান করেছেন বলেও শুনিনি। কিন্তু তার ছিল নিজস্ব একটা দৃঢ় ধর্মীয় প্রত্যয়। এমন কি একটা সাধারণ বিশ্বাসও লোকচিত্তে গড়ে উঠেছে যে তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরসূরী—রাষ্ট্রনায়ক সুভাষকে লোকে সন্ন্যাসী বলেই মনে করে। তাঁর শৈশব থেকে জ্ঞাত জীবনের শেষ অবধি একটা সাধনার ধারা লক্ষ্য করা যায়: সেই সাধনা মাতৃসাধনা। সেই সাধনা আবার শক্তিমানের সাধনা: এক উন্নত উজ্জ্বল মহা তেজস্বী পুরুষের সাধনা। এই হচ্ছে বাংলার নিজস্ব বিশিষ্ট তন্ত্রসাধনার ধারা। তন্ত্রশক্তির উপাসনা, শক্তিমানের দ্বারা উপাসনা। এর মধ্যে দৌর্বল্যের কোনো স্থান নেই তন্ত্র মতে সাধক তিন শ্রেণীর—পশু, বীর ও দিব্য। পশু নিম্নাধিকারী, বীর মধ্যমাধিকারী, দিব্যই শ্রেষ্ঠ। বীর ও দিব্য সাধকের মধ্যে পার্থক্য এই যে বীরভাবের সাধকের

জীবনে রজঃগুণ প্রধান, তৎসঙ্গে গৌণভাবে মিশ্রিত থাকে সত্ত্বগুণ। দিব্যভাবের সাধক সত্ত্বগুণ প্রধান, কিন্তু রজঃগুণকে তিনি স্বীকার করে নেন দিব্য কর্মের জন্য—তাত্ত্বিক ভাষায়, তাঁকে বলে spiritual man. তন্ত্রসাধনায় বীরভাবের সাধকের জন্য পঞ্চ তত্ত্ব তথা পঞ্চ মকারের ব্যবহার আবশ্যক বলে শাস্ত্র বিধান দিয়েছেন। কিন্তু দিব্যভাবের সাধকের সাধনায় ঐ সব উপচার অপ্রয়োজনীয়, তাঁর নিঃস্বার্থ শুদ্ধ হৃদয় মাতৃপ্রেমে উল্লসিত, তাঁর কর্ম ও ধ্যানই মায়ের পূজার একমাত্র উপচার। সুভাষ ছিলেন জগজ্জননীর আরাধক, দেশের প্রতিমার মধ্যে সেই পরমা জননীর নিত্য আরাধনা ছিল তাঁর সকল কর্মের মৌল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য। জীবনের কুরুক্ষেত্রে, বিশাল কর্মযজ্ঞের মাঝে মাকে কিভাবে ভালবাসতে হয়, আত্মদান করে সেই মায়ের প্রসন্ন আননের হাসিটি ফুটিয়ে তুলতে হয়—সুভাষ বাঙালীকে সেই অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। বাঙালীর মাতৃপূজা ছিল ব্যক্তিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক; ভাবের গভীরতার তাতে অভাব হয়নি, কিন্তু সামূহিক বা গোটা জাতির হয়ে এবং সমগ্র দেশের জন্য যজ্ঞযূপকাষ্ঠে আত্মবলিদান করে, হৃদয়ের নির্মল নিঃস্বার্থ প্রেমে যজ্ঞবেদীকে পরিশুদ্ধ করে, এই বাস্তব জীবনের রূঢ় রুক্ষ কর্মভূমিতে দাঁড়িয়ে এই অপরূপ মাতৃপূজা—বাংলার তন্ত্রসাধনার এ এক অভিনব, আশ্চর্য সার্থকতায় মণ্ডিত, একটা সমগ্রতায় পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ। রামপ্রসাদের গানে ছিল এই পূর্ণতার আহ্বান, রামকৃষ্ণে তারই সিদ্ধি;—সুভাষচন্দ্র সেই সিদ্ধিকেই প্রয়োগ করলেন স্থূল জনজীবনের কাজে ও আক্ষরিক অর্থেই বৃহৎ রণাঙ্গনে। তন্ত্র সাধনার এত বড় সাধক—রামকৃষ্ণের কথা বাদ দিলে—বাংলায় আর জন্মাননি। সুভাষের জীবনের মধ্য পর্বে এসে মাতৃশক্তির অবতরণ প্রকট হয়ে উঠেছিল তাঁর আধারে, জগৎ তখন স্তম্ভিত হয়েছে তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখে। যেন জীবন্ত জাগ্রত চলমান শিব সুভাষের নাম ধরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। সুভাষের জীবনকথা তাই

একটি মানব জীবনে শিব চৈতন্যের পূর্ণ উন্মেষের কথা। ভারতীয় দৃষ্টিতে তো সুভাষ চরিত্রকে অন্যভাবে দেখা যায় না।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র তো শুধু তন্ত্র সাধক নন, তিনি বৈষ্ণবও বটে। বস্তুতঃ বাংলায় বৈষ্ণব সাধনা তন্ত্রের ওপরই প্রতিষ্ঠিত, আর সেই কারণেই এই আর্য ধর্ম ও দর্শন ও সাধনাটি সারা ভারতে যেভাবে প্রচলিত বাংলায় এসে তা থেকে পৃথক ও অভিনব একটি রূপ লাভ করেছে ও একটা সম্পূর্ণ নতুন দার্শনিক কাঠামো বাংলার বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামীগণ এই নব বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সেই দর্শন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ষড় দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি নতুন দর্শন, ভারতের প্রতি বাংলার দান—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন। এই দার্শনিক মতবাদের মূল কথা অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ,—অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয়েরই সমান স্বীকৃতি দান করে এই মতবাদে বলা হয়েছে যে দুই-ই শুধু সত্য নয়, দুইই এক সঙ্গে, সম সময়ে সমানভাবে সত্য ;—অভ্যস্ত দার্শনিক সংস্কার ও চিন্তায় সেটা বাধ-বাধ ঠেকে বা অসম্ভব বলে প্রতীত হয় বলেই গোস্বামীগণ একে অচিন্ত্য আখ্যা দিয়েছেন। দুই-ই সত্য,—অর্থাৎ পুরুষও সত্য প্রকৃতিও সত্য ; এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাও সত্য, জীব জগৎও সত্য। বৈদান্তিক মায়াবাদের বিরোধী এই দর্শন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের কেন্দ্র পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব মায়াবাদীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেছেন কয়েকবার,—নীলাচলে সার্বভৌম ও কাশীতে প্রকাশানন্দের সঙ্গে বিতর্কে তাঁদের পরাস্ত করার কাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসলে বাঙালীর তান্ত্রিক প্রকৃতি মায়াবাদকে কখনো স্বীকার করতে চায়নি, তন্ত্রের বিশ্ববীক্ষা শিব ও শক্তিবাদের মধ্যে আত্মা ও অনাত্মা, চৈতন্য ও জগৎ উভয়কেই সমমূল্যে স্বীকৃতি দিয়েছে। তন্ত্র বলেছে অপরাপর দর্শন ও ধর্ম শুধু মুক্তিবাদী কিন্তু তন্ত্র যুগপৎ মুক্তি ও ভুক্তিবাদী। তন্ত্র ঐ যে তার প্রধান উপাস্যের আসনে বসিয়েছে বিশ্বজননীকে, এমন কি বিশ্বাত্মা শিবও যাঁর গতি মুখরিত পদতলে শববৎ শয়ান,—এই বিশ্ব সেই বিশ্বমায়ের

সৃষ্টি ; শুধু তাই নয়, তিনিই এই বিশ্বরূপে আকারিতা। জগৎ ও জগজ্জননী একই বটে। তাই তন্ত্রশাস্ত্র পরমারাধ্যা জগজ্জননীর উপাসনার বিধান দিয়েছে পঞ্চতত্ত্বসহ পূজা : এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডই দ্যোতিত হয়েছে। বিশ্বজননীর পূজার উপচার ও নৈবেদ্য জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া আর কী হতে পারে ? পঞ্চতত্ত্বের অর্থ হচ্ছে, মদ = বিশ্বের অগ্নি ও তেজময় উপাদান। মৎস্য ও মাংস = সমস্ত জলচর ও স্থলচর জীব। মুদ্রা = উদ্ভিদের জীবন। মৈথুন— পরমাপ্রকৃতির ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি, যদ্দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি হয় এবং যে সৃষ্টিকর্ম আনন্দের সঙ্গে উদযাপিত হয়। বিশ্বের যে চঞ্চল জীবন, আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বৈদান্তিক দৃষ্টিতে যা ঘৃণার্হ, মায়ামাত্র ও মোহের কারণ,—তাকেই সমগ্রতঃ বিশ্বমায়ের পূজার শ্রেষ্ঠ নিবেদনোপকরণ রূপে স্বীকৃতি দিয়ে তন্ত্র আরও বলেছে পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত শক্তিপূজা অসম্ভব, অবৈধ, অর্থহীন।

তন্ত্র মানুষের জীবনতৃষ্ণাকে অন্যায় ও অসঙ্গত বলে প্রচার করেনি, শুধু সেই জীবন তৃষ্ণাকে বলিষ্ঠ, সংস্কারমুক্ত, শোধিত ও গাঢ়তর করতে চেয়েছে। তাই তন্ত্রের সাধনার ফল চারটি,—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। প্রথম তিনটা অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ বাস্তব জীবনাকৃতির পূর্ণতা বিধায়ী। তন্ত্র এদের প্রবৃত্তি মার্গের অন্তর্ভুক্ত করেছে কিন্তু নিন্দনীয় মনে করেনি। মোক্ষ এর পরের ধাপ : কিন্তু সেও একটা নিরানন্দ ও শূন্যের অবস্থা নয়, জীবনের ঊর্ধ্বেও তা অবস্থিত নয়। মোক্ষ হচ্ছে শিব ও শক্তির মিথুনাবস্থা—মানবদেহেই তার অনুষ্ঠান ; মস্তিষ্কে সহস্রার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী ও শিবের এই মিলন মানব দেহকেই অমৃত রসের খনি, নিত্য, মুক্ত, দিব্য মহিমময় করে তুলেছে। মানবদেহে মূলাধারে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বা শিব মূর্তিকে তিন পাকে বেষ্টন করে সুপ্তা ও শায়িতা রয়েছেন ভুজগাকারা পরমচৈতন্যাধিষ্ঠাত্রী,—তার ক্রমজাগরণ ও শিবাভিসারই সাধনার সার কথা ; এবং কোনো পর্যায়েই তা দেহকে

অতিক্রম, বর্জন, অগ্রাহ্য বা অবহেলা করে সিদ্ধ হয় না : দেহের অবলম্বনই তার প্রথম ও শেষ কথা। সুতরাং এই দেহ, যা ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ—তা আসলে জগজ্জননী ও বিশ্বাত্মা শিবের লীলাভূমি নর্মাঙ্গণ; অর্থাৎ সেই পরমচৈতন্যের আবাসস্থল, আধার স্থল; জীবদেহ চৈতন্যের দ্বারা জারিত—নিছক মায়াগার বা মোহাগার রূপে তাকে দেখা ভুল ও অন্যায়। অর্থাৎ রূপ সত্য,—জীবের, জগতের ও জগদ্ধাত্রীর সকলেরই। বেদান্ত যাকে বলেছে মায়া, তন্ত্র তাকেই বলেছে পরমাপ্রকৃতি,—আবার মায়ার অধীশ্বরী বলে মহামায়া। তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যা; বাচক শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতিতে চিতের প্রকাশিকা, আবার বাচ্য শক্তিও, অর্থাৎ চিৎ স্বয়ং। ব্রহ্মের মাতৃরূপই দেবী,—তিনিই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম যুগপৎ। মহাচিতের যজ্ঞাগ্নি হতে উত্থিতা তিনি মহাজননী, অম্বিকা : চন্দ্র সূর্য তাঁর ভূষণ; ললিত—কেননা তিনি লীলা করেন। তাঁর দিব্যানন্দ সায়রে মীনবৎ লীলাচঞ্চলা দুই চোখের আলোয় প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর অগণিত জগৎ, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে করাল তমিস্রায়; তাঁর বদন তাই কখনো প্রকাশমান, কখনো আবৃত।

তন্ত্রের এই যে জগৎ ও জগতাধিষ্ঠাত্রীর কল্পনা, রূপের এমন কি মায়ারও স্বীকৃতি এর মধ্যে পাই—যা আর্য ব্রাহ্মণ্য ভাবনায় অকল্পনীয়! শুধু রূপ নয়, নামও সত্য। কারণ প্রতি রূপের সারাৎসার রয়েছে এক একটি শব্দ বা ধ্বনি বা বীজে; তন্ত্রের মন্ত্র ও জপ সাধনার পরিকল্পনা এই রূপের বীজাত্মক, শব্দাত্মক অস্তিত্বকে স্বীকার করে—সেই বীজ ও শব্দ নাম রূপে প্রকাশিত। আদ্যাশক্তি দশ রূপে প্রকাশিত হন দশটি ভিন্ন নামকে গ্রহণ করেই। জগতের সর্ব উপাদান ও সর্ব জীবের বেলাই তাই। ১৮

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত এই তন্ত্রের ভিত্তির ওপর। তন্ত্রের শিব ও শক্তি বৈষ্ণবের কৃষ্ণ ও রাধায় পরিণত, নাম ও রূপের সাধনাকে বৈষ্ণব মুখ্য স্থান দিয়েছেন এবং লীলার রসাস্বাদন তাঁর

পরম কাম্য। ভগবানের এই বিশ্বলীলা মায়া নয়, মিথ্যা নয়; একান্ত ও পরম সত্য—বৈষ্ণব লীলার ভিতর দিয়েই পেতে চায় লীলা-বিগ্রহকে; তাই স্মরণ কীর্তন পাদবন্দন সেবা প্রভৃতি বৈষ্ণবের সাধনাঙ্গ। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর—এই যে পঞ্চভাব অবলম্বন করে পরমপুরুষকে একেবারে আপনতম, ঘরের মানুষটি করে নেওয়া, ভাব ও ভালবাসায় সিক্ত করে অনির্বচনীয় অকল্পনীয় বিশ্বতত্ত্বকে ক্ষুদ্র মানবমূর্তিতে পাওয়া ও নিষ্কাম সেবার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গী সহচর সমানধর্মা এমনকি তদপেক্ষা নিজেকে জ্যেষ্ঠের আসনেও বসানো;—উপনিষদের তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ পুরুষ, বেদান্তের নিরাকার অব্যক্ত অখণ্ডমণ্ডলাকার ব্রহ্ম—ব্রহ্ম নামটিও যাঁর সম্পর্কে কতখানি প্রযোজ্য সে বিষয়ে সংশয় আছে—বাংলার বৈষ্ণব তাঁকে নিভৃত নিকুঞ্জবনে ফুলশয্যায় আসীন করে নিজদেহ দানে নিবিড় সেবা ও পরিচর্যা করতে চেয়েছে;—পুরুষোত্তমের প্রতি সেই তীব্র গভীর প্রেমবাসনার প্রতিমূর্তিই বাধা; যাব নাম ভাগবতেও নেই, বাঙালীর মানসপদ্মে যার জন্ম।

ঐ যে তন্ত্র বলেছিলেন, জীবন ও জগৎকে বাদ দিয়ে কোনো সাধনা হয় না, জীবনকে পীড়িত করেও সাধনা নিরর্থক;—বৈষ্ণব সেই কথাটাকেই রূপে রসে গন্ধে মধুর করে, তন্ত্রের বলিষ্ঠ জীবনবাদকেই রসিকের তৃষ্ণায় জারিত করে রসাস্বাদনের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। কুলার্ণব-তন্ত্রে দেবীকে সম্বোধন করে বলছে: "তোমার মায়ায় উদ্‌ভ্রান্ত জীব আশা করে যে একাহারী হয়ে মুক্তি লাভ করবে। উপবাস ও দেহকে শীর্ণ করে তারা ভাবে মুক্তি হয়। কিন্তু কোন মূর্খ দেহকে কষ্ট দিয়ে পায় মুক্তি? গর্দভেরা নগ্নগাত্রে চলাফেরা করে বলেই কি তারা যোগী হয়? যদি গায়ে মাটি ও ছাই মেখে মুক্তি লাভ করা যেত তবে তো মাটি ও ছাইয়ের গাদায় যে গ্রাম্য কুকুররা গড়াগড়ি করে তারাও হত মুক্ত যোগী। হরিণ ও অন্যান্য পশুরা ঘাস পাতা খেয়ে থাকে—তারা কি তবে যোগী? হে

কুলেশ্বরী, এসব আচার পালন মানুষকে ভ্রান্ত করে।” এই হচ্ছে আর্যব্রাহ্মণ্য দর্শন ও সাধনার বিরুদ্ধে বাংলার জীবনবাদের বিদ্রোহ-বাণী। চর্যাপদের কবিগণ বহুকাল পূর্বে প্রাচীন বাংলায় এই জীবনবিমুখ আর্যব্রাহ্মণ ধর্মাদর্শ ও সাধনার প্রতি বিদ্রূপোক্তি করেছিলেন।

সরহপাদ একটী দোহায় বলছেন যে আর্য ব্রাহ্মণরা মাটী, জল, কুশ নিয়ে মন্ত্র পড়ে, ঘরে বসে আগুনে আহুতি দেয়, কার্যবিরহিত বা ফলহীন অগ্নিহোমের কটু ধোঁয়ায় চোখ শুধু পীড়িত হয়ঃ

মট্টি পাণী কুস লই পড়ন্ত
ঘরহিঁ বইসী অগ্‌সি হনন্তঁ॥
কজ্জে বিবহিঅ হু অবহু হোমেঁ।
অক্‌খি উহাবিঅ কুড় এ ধুমেঁ॥

জীবনবিমুখী, শ্রী ও সমৃদ্ধিময় জীবনবিকাশের বিরোধী ভাব ও সাধনার বিরুদ্ধে বাংলার এই যে বিদ্রোহ, তন্ত্র ও বৈষ্ণব মতবাদের প্রতিষ্ঠা এরই ওপর। উভয় দর্শনেরই মতে জগতাতিশায়ী ভাব বা লক্ষ্যেরও সাধনা করতে হবে বাস্তব জীবনেরই ভিতর দিয়ে,—তাকে অস্বীকার, অগ্রাহ্য বা অবহেলা করে নয়। তন্ত্র জোর দিয়ে বলছেন যে মানুষ তার প্রতিটি লক্ষ্য সাধন করতে পারে সসীম কিন্তু বাস্তব জগতের মধ্য দিয়ে ও এই জগতেই; ভোগকে পরিহার করে বা সংসারকে বর্জন করে নয়, ভোগকে যোগে রূপান্তরিত করে ও সংসারকে মুক্তির পীঠস্থানে পরিণত করে—যোগভোগায়তে ও মোক্ষয়াতে সংসারঃ—জীবনসাধনা সাধতে হবে, যার উদ্দেশ্য জীবনের নাশ বা নিঃশেষিত হওয়া নয়, জীবনের বিকাশ, শ্রী, সমৃদ্ধি, পূর্ণ সিদ্ধি। কে পারে সেই সাধনা করতে? দুর্বল নয়, বীরই পারে জীবনের মুখোমুখি হতে,—সকল বৃথা ভয় ও অজ্ঞানকে পারে সে জয় করে কীর্তিমান হতে। যে বীর সে অবিদ্যার সঙ্গে, এমনকি বিদ্যারও বন্ধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এই চূড়ান্ত বীর্যই আবার

স্ফুরিত হতে দেখি বৈষ্ণবের প্রেম ও ভাবে,—পরমতমকে যেখানে নিজের ক্ষুদ্র দুবাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে এমনকি মুখচুম্বনেরও সামর্থ্য ভক্ত রাখে।—যে ভক্ত তার নিকট জীবন ও জগৎ একান্তভাবে সত্য —কারণ সে তার আরাধ্যকেই শুধু সত্য বলে জানেনা, নিজেকেও সে সত্য বলে জানে, (ভক্তের বিনাশ নাই, ভগবানের মতো ভক্তও নিত্য, তার দেহও নিত্য—বৈষ্ণবের এমত বিশ্বাস) আর তার আরাধনা ও সেবাবাসনাও যে সত্য ও শাশ্বত এ বিষয়েও তার মনে কোনো সংশয় নেই।

বাঙালীর জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে জগৎ ও জীবনকে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ ও স্বীকারের ভিত্তিতে ;—বাংলার প্রাচীন যে লোকায়ত ধর্মের কথা বলেছি, ব্রত ও আচার সংস্কারের কথা উল্লেখ করেছি, তারপর বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের যে নানা রূপান্তর ঘটেছিল এবং এই সমস্তকে আত্মসাৎ করে যে তন্ত্র ও বৈষ্ণবধর্ম পরে গড়ে উঠেছিল,—তার ফলে আর যাই হোক ভাবের ঘরে চুরি করার প্রয়োজন বাঙালীর দেখা দেয়নি। জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে আবার সেই জগতে বসেই বাসনার চরিতার্থতাসাধনের যে আত্ম-প্রতারণার খেলা তাতে অংশ নেবার কোনো দায় তার ছিল না। মানুষের ভোগকামনা ও হৃদয়ের সহজ ভাব উভয়েরই স্ফূর্তি সাধনের মাধ্যমে তাদের ক্রম-শোধন ও রূপান্তর ঘটানোই ছিল বাংলার সকল ধর্মাদর্শের মূল কথা, বাংলা ভারতকে মায়াবাদের পরিবর্তে দান করেছে এই বলিষ্ঠ জীবনবাদ।

সুভাষচন্দ্রের দর্শনচিন্তা এই খাতেই বয়েছিল—কলেজের ছাত্র থাকাকালেই মায়াবাদ সম্পর্কে তাঁর মোহমুক্তির বিবরণ তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি দিয়েছেন। উত্তর জীবনে তাঁর দার্শনিক প্রত্যয় সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : "জীবনে যে আদর্শকে পাওয়া যায়না, বাস্তব জীবনে যার প্রয়োগ নেই, তাকে ত্যাগ করার দিকেই আমার প্রবণতা। কিছুকাল শঙ্করের মায়াবাদে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে শান্তি মিলল না।...আমার



পিতা ও মাতা   জানকীনাথ বসু ও প্রভাবতী দেবী

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে

ধারণায় যে বাস্তব ধরা দিচ্ছে সে যদি পরম না হয়ে আপেক্ষিকও হয় তবেই বা তার প্রকৃতি কি? প্রথমত তার একটা নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, সে মায়ামাত্র নয়। আমার এই ধারণা কারণবহির্ভূত ধরে-নেওয়া নয়, এর ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব ব্যবহারিক দৃষ্টি। মায়াবাদ কার্যক্ষেত্রে অচল। আমার জীবনের সঙ্গে তাকে মেলানো চলেনা যতই চেষ্টা করি (বহু চেষ্টা করেছিলাম)। সুতরাং তাকে বর্জন করা ভিন্ন উপায় কি? অপরপক্ষে জীবন যদি বাস্তব এবং সত্য হয় (পরম নয়, আপেক্ষিক অর্থে) তবে জীবনের অর্থ হয়, উদ্দেশ্য হয়, জীবনকে ভালো লাগে। ··বিশ্ব হচ্ছে আত্মার প্রকাশ, এবং আত্মার মতো সৃষ্টিও অমর। সৃষ্টি কোথাও থেমে যেতে পারেনা। বৈষ্ণবী নিত্যলীলা র ধারণার সঙ্গে এ ধারণার মিল আছে। সৃষ্টি পাপজাত নয়, শঙ্করবাদীর মতানুযায়ী অবিদ্যার ফল নয়। সৃষ্টি হচ্ছে অমর শক্তির অমর লীলা, দৈবলীলা বলতে চান বলুন।...আমার দৃষ্টিতে বাস্তবতার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। কি বিশ্বজগতের কি মানব-জীবনের, উভয়েরই মূলে প্রেম।···আমার সিদ্ধান্ত এসেছে কিছুটা জীবনের বুদ্ধিগত বিচার থেকে, কিছুটা বুদ্ধিবহির্ভূত প্রত্যক্ষ বোধ থেকে, কিছুটা ব্যবহারিক বিবেচনা থেকে। আমার চারদিকে দেখতে পাই প্রেমের লীলা, নিজের ভিতরেও দেখি তারই প্রকাশ। নিজের পূর্ণতার জন্য প্রেমের প্রয়োজন বোধ করি, জীবনকে গড়ে তোলার একমাত্র ভিত্তি পাই প্রেমে।···চেতনাই বাস্তব, আর চেতনার মূল হচ্ছে প্রেম, যার বিকাশ নিয়তই চলেছে সংঘাত ও সমাধানের মধ্য দিয়ে।" (আমার দার্শনিক প্রতীতি)

সুভাষচন্দ্রের জীবনের রহস্য সম্পর্কে এই আত্মবিবৃতি আমাদের নিকট দিশারীর মতো কাজ করে। শুধু দার্শনিক চিন্তা নয়, তাঁর অভিজ্ঞতা ও অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিও এই বিবৃতির মধ্যে বিধৃত। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে এই বিবৃতির মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে প্রথমত, তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন বাস্তব জীবন ও জগৎকে;

দ্বিতীয়ত, প্রত্যাখ্যান করেছেন মায়াবাদকে; তৃতীয়ত, আত্মা ও অনাত্মা, চিৎ ও জড় উভয়কেই একই সঙ্গে সত্যের মর্যাদায় তিনি গ্রহণ করেছেন; তাই বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর চিন্তাধারার মিল, শাঙ্কর বেদান্তের সঙ্গে নয়। কিন্তু শাশ্বত লীলা-তত্ত্বকেই তিনি স্থিরস্থিত ভাবে নয়, গতিবিধৃত তথা dynamic রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। বৈষ্ণবের দর্শনকে এইখানে তন্ত্রের মতবাদের সঙ্গে তিনি মিশিয়ে নিয়েছেন। গতিচেতনা তন্ত্রের দান, বৈষ্ণবের নয়। তন্ত্র মহাকালেশ্বরীর উপাসনা করে, বিনাশ ও সৃষ্টির উগ্রমধুর দ্বৈত রূপকে একত্রে ভজনা করে,—বিশ্ব যে নিত্য গতিধাবিত আর সেই গতির ভিতরই বিশ্বেশ্বরীকে প্রত্যক্ষ করতে হবে, তন্ত্রই একথা আমাদের শিখিয়েছে। সুভাষের ধ্যান-দৃষ্টিতে এই গতি-তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়েছিল বলেই তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রেমের ঐশ্বর্য নিয়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নেমে এসেছিলেন; কর্মের সার্থকতায় তাঁর প্রবল বিশ্বাসের হেতু ঐ dynamic বিশ্বদৃষ্টি। তিনি অসঙ্গ সমাধিলীন পুরুষ হতে পারতেন, অহম ও ইদম (জগৎ)-এর পরপারে যে নির্বিকল্প সমাধিলোক, বিশুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থা,—তাতেই তিনি স্থির হয়ে যেতে পারতেন। তাঁর সত্তার গঠন ছিল তদভিমুখীই বটে। কিন্তু ঐ যে তন্ত্রের ধাতু ও বৈষ্ণব-প্রকৃতি সেই গঠনের মধ্যে মিশ্রিত হয়েছিল তারই ফলে শুদ্ধ সম্বিৎকে নিয়ে সুভাষ সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে বাস্তব জীবনকর্মের মধ্যে—শুধু কর্তব্যের তাগিদে নয়, প্রেমের তাগিদে—উন্মুখ ভক্তির প্রেরণায়। তাঁর দেশপ্রেম আসলে মাতৃভক্তি ও বিশ্বদেবতার প্রতি নিবেদিত প্রেমেরই প্রকাশরূপ।

সুভাষচন্দ্র ভারতপুরুষ—ভারতের ইতিহাস ও সাধনার দিক থেকেই তাঁর জীবনকে দেখা আমাদের উচিত। কিন্তু বাংলার সুভাষ যে বাংলার ভাবরূপের প্রতিমূর্তি—এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার লক্ষ্যবস্তু ততটুকু পর্যন্ত। তাঁকে দেখেই বাঙালীকে আত্মস্থ হতে হবে।

শুধু বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারা নয়, আধুনিক যুগের বাঙালীর ভাব ও কর্মসাধনার ধারাও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে নতুন দিক-নির্দেশনা লাভ করেছে। বাংলার নবজাগৃতির ফলশ্রুতি মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনে। কথাটা বিচার সাপেক্ষ। বাঙ্গালীর আঠারো ও উনিশ শতকের সাধনা যদি মরুপথে হারানো ধারার মতো নিষ্ফলা বলে আমরা না স্বীকার করি তাহলে সেই সাধনার বিশ শতকে উত্তরণ কী ভাবে ও কোন কোন পুরুষের সহায়তায় ঘটেছিল তা অবশ্যই বিচার্য। বিশ শতকের বাংলার ভাব ও কর্ম জগতের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, অরবিন্দ, বিপিন পাল, অবনীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু; সুভাষচন্দ্রের সাধনা ও সংগ্রাম, প্রত্যয় ও সিদ্ধির গভীরতা এঁদের কারও অপেক্ষা ন্যূন নয়—বরং অনেকের চেয়ে অধিক। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা নন, তাই তাঁর চিন্তা ও উপলব্ধির দিকটি অপরিচিত রয়ে গেছে আমাদের কাছে। তাঁর কর্মীরূপ, নেতৃরূপ, যোদ্ধরূপ আমাদের বিস্ময়-স্তব্ধ করে; তাই ভিতরের মানুষটি কী বস্তু দিয়ে গড়া তা অনুসন্ধান করার অবকাশ সচরাচর আমাদের হয় না। বাঙ্গালীর ইতিহাস ও জীবন-বোধের আলোয় সুভাষ-চরিত্রের রহস্যোদ্ধার সামান্যভাবে আমরা করেছি; এখন দেখব গত শতাব্দীতে বাঙ্গালী যে সব আশা ও কল্পনা করেছে, স্বপ্ন দেখেছে, যেসব প্রতিজ্ঞা ও সাধনা করেছে তার একটা ফলশ্রুতি এযুগে আমরা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে পূর্ণাকারে পেয়েছি। সে জন্যই তাঁর চরিত্র দীর্ঘকাল ধরে বাঙ্গালীর চেতনাকে আবিষ্ট করে রেখেছে। সুভাষজীবনের কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করার আগে তাঁর দেশ ও

যুগের পরিচয় তাই নেওয়া দরকার—কারণ দেশের ও যুগের প্রয়োজনই তাঁর মতো ঐতিহাসিক পুরুষের আবির্ভাবকে অনিবার্য করে তোলে।

১

বাংলায় উনিশ শতকে নবজাগৃতি এসেছিল আঠারো শতকে বাঙালী জাতির গভীর সঙ্কটের অভিজ্ঞতার পর। হয়তো বা পতনই পুনরুত্থানকে ডেকে আনে, সঙ্কটই প্রস্তুত করে নবজাগৃতির ক্ষেত্র। অন্ততঃ বাংলার ইতিহাসের নির্দেশ যেন কতকটা তাই। প্রাচীন কালে বাংলায় যখন মাৎস্যন্যায়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তখন এক শতাব্দী বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার দুর্ভোগ ভুগে তার প্রতিকারের জন্য সমগ্র জাতি সংহত ইচ্ছা-শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—তারই ফলে আমরা পেয়েছি পাল আমলের সুদীর্ঘ চার শতাব্দী ব্যাপী অভূতপূর্ব জাগরণ। বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হবার পরও একটা জাতীয় সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল : বহু লোক ঘর ছাড়া, দেশ ছাড়া উদ্বাস্তু হয়েছিল, বহুজন স্বীকার করে নিয়েছিল ধর্মান্তর : হত্যা ও লাঞ্ছনা তবু যে সর্বত্র এড়াতে পারা গেছে তা নয়। কিন্তু মাৎস্যন্যায়ের আমলে যেমন, মুসলমানী শাসনের কালেও তেমনি,—সামাজিক বিপর্যয়কে পরিপাক করে নেবার মতো শক্তি সমাজে তখন জাগ্রত হয়েছিল : প্রথমবার বাংলার প্রজাপুঞ্জ গোপালকে রাজা নির্বাচন করে যুগ সঙ্কটের সমাধান করে, দ্বিতীয়বার বাঙালীর ভাববিগ্রহ শ্রীচৈতন্য দেশে যে ভাববন্যা এনেছিলেন তাতেই ধর্মাদর্শের সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক পীড়ন প্লাবিত হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আঠারো শতকে মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ায় একদিকে কেন্দ্রীয় শাসন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল—অন্য দিকে রাষ্ট্রনৈতিক নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে, নিম্নবঙ্গে পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের দাগ না মিলাতেই বাংলায় এসেছিল মারাঠাদের হাঙ্গামা, ইংরেজ ও

ফরাসীদের বাণিজ্য বিস্তার ছলে অসম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অরাজকতার বিস্তার এবং বাংলার সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র। বহির্জীবনে এই সব সংঘাতের অন্তরালে দেশের অন্তর্জীবনেও এসেছিল একটা অবসাদ ও অবক্ষয়: কোথাও কোনো আশা ছিল না, উদ্যম ও অধ্যবসায় সহযোগে কোনো মহৎ প্রচেষ্টা ছিল না, আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিবোধ একান্তই খণ্ডিত তথা অনুপস্থিত ছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত ভাবান্দোলন ততদিনে সম্পূর্ণ স্তিমিত হয়ে গেছে এবং তার সৃজনশীল ভূমিকাও তখন লুপ্ত। ইতিহাসের সমস্ত সঙ্কটকে আপন ব্যক্তিত্বের মধ্যে ধারণ করে জাতিকে নতুন অগ্রগামিতার পথনির্দেশ ও আহ্বান জানাতে পারে এমন কোনো পুরুষ সমাজের মধ্য থেকে আবির্ভূত হলনা, সমাজ নিজের ভিতর থেকে আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের কোনো শক্তিকেই জাগ্রত করতে পারল না। বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁ গত হলে নব যুবক সিরাজ যে সিংহাসন দখল করলেন তা ছিল ষড়যন্ত্রের মরু বালুর ওপর স্থাপিত;—সমস্যার তুলনায় সিরাজের সামর্থ্য ছিল স্বল্প এবং রাজশক্তিটাই তখন অত্যাচার, মিথ্যা, অন্যায়, স্বার্থগৃধ্নুতা ও ব্যভিচারের পাপপঙ্কে নিমজ্জমান। নবাব বা রাজশক্তির ধারক বাহকদের কেউই দেশকে সুস্থ ও সমর্থ নেতৃত্ব দিতে পারেনি, দেশের অন্য কোনো প্রান্ত থেকেও সে নেতৃত্ব আবির্ভূত হল না,—অথচ সঙ্কট দিনে দিনে গভীর ও ব্যাপকতর রূপ নিল। সর্বব্যাপী জাতীয় সঙ্কটের দিনে নতুন বোধন মন্ত্র উচ্চারিত হয় দেশের ভাবুকদের কণ্ঠে; কবি ও মনীষীরাই নতুন প্রত্যয়, মূল্যবোধ, আশা ও স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করেন জাতিকে। বাংলায় আঠারো শতকে সে রকম কোনো কিছুই ঘটল না, বরং দেশের কলুষিত ভাবমণ্ডল উচ্চ কোটির ভাবুক ও উপলব্ধিবান পুরুষদেরও পাঁকের মধ্যে নামতে বাধ্য করল। পূর্বতন ধর্মীয় প্রত্যয়ের প্রভাব জনসমাজে তখন অপসৃয়মান, সেকুলার তথা মর্ত্যকেন্দ্রিক জীবনভাবনা প্রসার লাভ করছে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন

উভয় স্তরে। আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে জাতির এই জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে: দেবদেবীর নাম ও স্তব সে কাব্যে আছে পুরনো প্রথার জের হিসাবে, আসলে সমস্ত কাব্যটাই নরনারীর প্রাকৃত প্রণয় ও সম্ভোগের চিত্রায়ণ। বিদ্যা ও সুন্দরের অবৈধ প্রণয় ও সম্ভোগ কাহিনী তখন জনসমাজে সর্বাপেক্ষা সমাদরণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে; সেই প্রণয় ও সম্ভোগের ইতিবৃত্তে বাংলার যৌবন দুর্বলতা, ভীরুতা, ক্লৈব্য, গোপন সুড়ঙ্গ পথে যাতায়াত, চুরি, আত্মরক্ষায় অসামর্থ্য, নারীর চোখের জলের মধ্যে আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণ, ভাগ্যের পায়ে আত্মসমর্পণ, জীবনযুদ্ধকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা—ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত দেখতে পাই; গোপনচারী অনায়াসলব্ধ সম্ভোগে প্রমত্ততা ভিন্ন আর কোনো আদর্শ সে যৌবনের সম্মুখে উপস্থিত ছিল না। আঠারো শতকের বাংলার ভাবমণ্ডলে একটি দুটি শুদ্ধ কণ্ঠস্বর উত্থিত হয়েছিল: কিন্তু সে স্বরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনার প্রকাশ ছিল—যত শুদ্ধই হোক, জাতিকে নতুন আশায় ও সমবেত মহৎ প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে এমন কোনো আদর্শ ও বাণী সে ভাবনার ফলে জাত হয়নি। আঠারো শতকের বাংলায় যে ঘন তমিস্রা জাতীয় মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এবং সমস্ত সংগ্রামচেতনা এমন কি কর্তব্যবোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে শুধু ক্ষুদ্র, আত্মতৃপ্ত, অসুস্থ কাম সম্ভোগকেই জীবনের কেন্দ্রীয় আদর্শ রূপে দেশ গ্রহণ করেছিল—তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী পথে যাত্রা করেছিলেন রামপ্রসাদ: তিনি ছিলেন শুদ্ধতার উপাসক ও অন্তরের চিরন্তন মহৎ অভীপ্সার বাণীকার। বস্তুত রামপ্রসাদের গানই ছিল সেদিন একমাত্র আলোর বাণী;—কিন্তু সে গানের আবেদন ছিল ব্যক্তির চিত্তে, জাতির সামগ্রিক কর্তব্য বোধকে উদ্দীপ্ত করার পক্ষে কোনো ভূমিকা রামপ্রসাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব ছিলনা। এবং ক্রমে পরিবেশের বিরুদ্ধে রামপ্রসাদের সেই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বিদ্রোহকেও নির্বাপিত করা গিয়েছিল,—রাজসভায়

রামপ্রসাদকে আহ্বান করে এনে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রাকৃত প্রণয় কাহিনী নিয়ে কাব্য লিখতে তাঁকেও প্রলুব্ধ করা হল। তিনি লিখলেনও; তাঁর শুদ্ধ চেতনা সাময়িকভাবে হলেও আচ্ছন্ন হল বিত্তৈষণা বা লোকাচারের দ্বারা; এই আপসকামী মনোভাবের প্রাবল্য বাংলায় আঠারো শতকে আদর্শের সমস্ত আলোকে নিভিয়ে দিয়েছিল।

বাঙালী সমাজ যখন নিজেদের ভিতর থেকে যুগ সঙ্কটের সমাধান করার উপযোগী শক্তি, সামর্থ্য, ভাব, কল্পনা ও আদর্শ সৃষ্টি করতে পারল না তখন জাতি অসহায়ের মতো তাকাল দুটি বহিঃশক্তির দিকে—এক, স্বর্গস্থ দেবতা; দুই, বিদেশী ইংরেজ। তাদের মনে হল এদেশে ইংরেজের আগমন দেবতারই দান। অতএব নিজেদের সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের আশায় এই বিদেশী শক্তিকে আহ্বান করলে তাতে অন্যায় কিছু ঘটবেনা। বাংলার নেতৃবৃন্দ এইভাবে নিজেদের বিবেককে শান্ত করে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের মাঝখানে নিয়ে এলেন ইংরেজকে; এবং তাঁদের ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা ও সহজাত কাপুরুষতার ফলে ষড়যন্ত্রের পথ ভিন্ন আর কোনো স্বাস্থ্যকর পথের সন্ধান তাঁরা পেলেন না। বস্তুতঃ তাঁদের সহযোগিতা ভিন্ন নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ইংরেজের পক্ষে বাংলায় অস্তিত্ব রক্ষা পলাশির যুদ্ধের পূর্বেই একবার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল: পলাশি যুদ্ধ নামক প্রহসনও ইংরেজের বিজয়ে পরিণত হল দেশীয় নেতাদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলে। সেই জন্য বলা যায় যে ভারতে ইংরেজের জয় আসলে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ভারতবাসীরই জয়।

২

পলাশি যুদ্ধের পর বাংলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার প্রতি কোম্পানীর লুব্ধ নজর প্রথম থেকেই পড়েছিল। বাংলার বাণিজ্যের আয়েই

তাদের সারা ভারতের প্রতিষ্ঠান-ব্যয় নির্বাহ হ'ত। পলাশি যুদ্ধের আগে "সকল জাতির সঙ্গে বাণিজ্যে জমার পাল্লাটা ছিল বাংলার দিকেই ভারী; সকল দেশের স্বর্ণ ও রৌপ্য বাংলার গহ্বরে এসে পড়ত, আর ফিরে যেতনা" (Lieut—Col. Alexander Dow : The History of Hindustan, voll. 1, c iii). সেকালে প্রত্যেক বছর পারসিক, আবিসীনীয়, আরব, চীনা, তুর্কী, মুসলমান, ইহুদী, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান ও এশিয়ার অন্যান্য স্থান থেকে দলে দলে বণিক বাংলায় ছুটে আসত, জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে যেত বাংলায় উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য, খাদ্য ও মশলা। লাক্ষা দ্বীপ, মালয়, চীন, পেগু, ফিলিপাইন, মালদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গেও ছিল বাংলাব নিয়মিত বাণিজ্য।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শুধু বাংলার এই বিশাল বহির্বাণিজ্যেই নয়, দেশের অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ছিল একজন প্রধান অংশীদার। কোম্পানীর প্রতিনিধিবা বাংলাব প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত বাংলার নিজস্ব দ্রব্যাদি কিনবার জন্য উপস্থিত থাকত। পলাশি যুদ্ধের পর কোম্পানী বাংলায় শুল্কমুক্ত অন্তবাণিজ্যের অধিকার লাভ করে তাদের নবার্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে এবং বাংলাব বহির্বাণিজ্যও তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের করতলগত করে ফেলে।

বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, এমনকি অংশতঃ কৃষিও ইংরেজেব হাতে চলে যাওয়ায় দেশের সঙ্কট আঠারো শতকের শেষভাগে এসে একটা ভিন্ন রূপ নিতে সুরু করে। ইংরেজ তখন বাংলার শাসকও বটে, এমন কি সারা ভারতে তার আধিপত্য ক্রমপ্রসারশীল। ইংরেজের নীতির ফলে শিল্প-নির্ভর, ব্যবসায়-নির্ভর ও কৃষি-নির্ভর বাংলার জনসাধারণ চরম দুর্বিপাকে পড়েছিল, কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল কলকাতা শহরের। মুর্শিদাবাদের মতো বহু প্রাচীন শহর মরে হেজে গেলেও কলকাতা তার রূপসী রূপ নিয়ে ক্লান্ত, পাণ্ডুর বাংলার বুকে ফুটে উঠেছিল ইতিহাসের নিগূঢ় ইঙ্গিতে। ১৮০২ সালেই

কলকাতার লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লক্ষ। কলকাতা শহর যাদের নতুন কর্মস্থল হয়ে ওঠে তেমন কিছু বাঙালী—বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দালাল ও গোমস্তা নামে যারা সেদিন পরিচিত হয়েছিল—তারাও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু তারা একটা বাঙালী পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে তুলতে পারেনি। তার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত ইংরেজরা দেশী পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে উঠতে দেয়নি। শিল্প ও বাণিজ্যের সুযোগ বঞ্চিত বাঙালী ধনিকবৃন্দ শিল্পপতি বুর্জোয়া বা বণিক বুর্জোয়া হবার পথ খোলা পায়নি। দ্বিতীয়ত এই নতুন বড়লোকরা ধন উপার্জন করেছে যেমন দুহাতে, সমাজে ধনিক ও বাবু হিসাবে নাম ডাক হবার কামনায় অর্থ ব্যয় করেছে তেমনি দশ হাতে। বিলাস-ব্যসন, ঘুড়িগাড়ি, প্রাসাদ অট্টালিকা এবং উৎসব পার্বণে ধন খরচ করে নষ্ট করে ফেলাই ছিল এদের শখ, ধন সঞ্চয় করে উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে তার নিয়োগ ছিল এদের পক্ষে স্বপ্নাতীত।

উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলার যে সামগ্রিক রূপ আমরা দেখতে পাই তা যুগপৎ করুণ ও হাস্যকর; জনসাধারণের দুঃখ ও দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান, গ্রাম বিত্তশূন্য, অথচ কলকাতায় পায়রা ওড়ানো, বিড়ালের বিবাহ, গণিকার মানভঞ্জনে লক্ষ লক্ষ টাকা জলের মতো খরচ করছেন বাঙালী বাবুরা। কৃষি ছাড়া কৃষকের আয়ের আর কোনো পথ ছিলনা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্ত চাপ পড়তে লাগল জমির ওপর; জমির চাহিদা বাড়ায় জমির খাজনাও বেড়ে চলল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত আইন-আদালত চাষীর বিন্দুমাত্র কল্যাণ সাধন করেনি, বরং জমিদারের হাতেই তুলে দিয়েছে কৃষক শোষণের মারাত্মক সব সুযোগ সুবিধা। আর এই জমিদাররা ছিলেন শহরবাসী, কলকাতাবাসী—সারা বাংলার রক্ত শোষণ করে উনিশ শতকের কলকাতা বাংলার বুকে ফুটে উঠল জ্যোতির কনকপদ্ম রূপে—জমিদার ও কোম্পানী উভয়েরই অবদান আছে সে বিষয়ে। কিন্তু কলকাতা গঠনের মূলে সারা বাংলার যে অশ্রু বর্ষণ ছিল

কলকাতার ভাগ্যদেবী ক্রমে বাঙালী জাতির সেই অশ্রুপাত ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসকে শোধিত করে কলকাতার কলঙ্ক কালিমাকে ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা কলকাতার সমাজতত্ত্বে এমন কয়েকটি উপাদান ছিল যাদের সমবায়ে বাংলায় একটা বৈপ্লবিক ভাঙা-গড়ার যুগের পত্তন হয়েছিল; বাঙালীর ইতিহাসে আধুনিক যুগে একটা নবতর জাগৃতির সূচনা ঘটে গিয়েছিল তারই ফলে।

নতুন বড়লোকদের শহর কলকাতায় জাতিপ্রথা ছিল, কিন্তু তার কঠোরতা ছিলনা। চার্লস গ্রাণ্ট লিখে গেছেন যে তখন টাকাই হয়ে উঠেছিল বাঙালী হিন্দুর উপাস্য দেবদেবী। সবাই ছুটছে টাকার অন্বেষণে, বংশানুক্রমিক জীবিকা ও সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে কে সেদিন বসে থাকবে? প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার ও প্রত্যয়গুলি শিথিল হয়ে যাচ্ছিল পূর্ব থেকেই, এখন ইংরেজের শক্তি ও সাফল্য দেখার পর, নতুন ভাবনা মনোদিগন্তে উদয় হবার ফলে এবং নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারও ক্রমে উন্মুক্ত হওয়ায় প্রাচীন বিশ্বাস আঁকড়ে থাকতে অনেকেই রাজি হয়নি। যেখানে জন্মেছি, সমাজের সেই নিচুতলাতেই সন্তুষ্ট চিত্তে মরব—এই বোধ দূরীভূত হয়েছিল তাদের মন থেকে। সমাজে গতির চাঞ্চল্য দেখা গেল তাই। দৈবের বদলে পুরুষকার ও বুদ্ধির প্রয়োগে আস্থা ব্যাপকতর হয়েছিল, নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা গ্রহণে আগ্রহও তাই বেড়ে গিয়েছিল। ফলে পুরনো সমাজ, জীবন যাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা পরিবর্তনের হাওয়া জোরালো ভাবে বইতে সুরু করেছিল।

না, শুধু ভাগ্যান্বেষী ও অর্থলিপ্সুদেরই আগমন ঘটেনি নবীন যুগের নতুন শহর কলকাতায়। তাঁরাও এলেন যাঁরা চার্লস উইলকিন্সকে ভগবদগীতার অনুবাদে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন, যাঁরা স্যার উইলিয়াম জোন্সকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনে সহায়তা করতে পারেন। তাঁরা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দিনে

মাত্র একটি টাকার বেশি নিতে অসম্মত হয়েছেন। হালহেডের "কোড অফ হিন্দু ল" সঙ্কলনে তাঁরাই সাহায্য করেছিলেন। এঁরা কারা—এই বাঙালী পণ্ডিত ও বিদ্বানেরা? রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, সীতারাম ভট্টাচার্য, কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিরভিমান সাধক পণ্ডিতরাও সেদিন কলকাতায় বর্তমান ছিলেন, বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দিগিরি মারফৎ টাকা উপার্জন করে সে টাকা গঙ্গায় ঢেলে দেবার জন্য নয়, দেশের জ্ঞান ও বিদ্যা ধারণ ও বহন করার জন্য।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবরাও তাঁদের উপেক্ষা করতে পারেন নি: কারণ এদেশে স্থায়ীভাবে রাজত্ব চালাতে হলে এ দেশকে জানা ও বোঝা, অন্ততঃ এ দেশের সঙ্গে কাজ-চলা গোছের পরিচয় রাখা যে দরকার সে বোধ কোম্পানীর কর্তাদের ছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় ইংরেজ মহলে তাই বাংলা ভাষা চর্চার যেন একটা ধুম পড়ে গিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যেই ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও উইলিয়ম কেরীর শ্রীরামপুর মিশন। শ্রীরামপুর মিশন বাঙালীকে তিনটি উপহার দিয়েছিল: সংস্কৃত চর্চার সহজ পথ, প্রাচীন বাংলা কাব্যের সঙ্গে পরিচয় লাভের উপায়, বিজ্ঞান ও ইতিহাসবোধ অর্জনের নতুন সুযোগ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজও বাংলা গদ্যের বিকাশে প্রভূত সাহায্য করে গেছে। এই দুটি প্রতিষ্ঠান রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল ও হিন্দু কলেজ স্থাপনের বাতাবরণও সৃষ্টি করেছিল।

বাংলার নবজাগৃতি সুরু হয়েছিল ১৮১৫ সালে রামমোহনের স্থায়ীভাবে কলকাতায় আগমনের সময় থেকে। লক্ষণীয় এই যে কলকাতায় এসে ঐ বছরেই তিনি বাংলায় তাঁর 'বেদান্ত সূত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি গ্রন্থাদি প্রকাশ ছাড়াও তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য সংগঠন গড়ে তোলাতেও মন দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে

১৮১৫ সালে তিনি 'আত্মীয় সভা' নামে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তাহে একদিন এই সভার অধিবেশন বসত—হিন্দু শাস্ত্র থেকে পাঠ, রামমোহন রচিত ব্রাহ্ম সঙ্গীত ও আলোচনা ছিল অধিবেশনের অঙ্গ।

বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিমধ্যে একটা বিপুল পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও তার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ক্রমেই এদেশে সম্প্রসারিত হতে সুরু হবার ফলে একটা নতুন মানসিকতা বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে। বাঙালী নব যুগে যে নতুন শিক্ষা লাভ করতে চাইল তার যথার্থ ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যাত কয়েকজন বাঙালী সমাজনেতার চেষ্টায়ই ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু কলেজ। এদেশে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষা অথবা প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা কোনটা সরকারী সমর্থন পাবে এ নিয়ে সংশয় দেখা দিলে রামমোহন বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে ১৮২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে একখানি প্রখ্যাত পত্রে লিখেছিলেন: "ব্রিটিশ আইন সভার নীতি যদি এই হয় যে এদেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখতে হবে তাহলে সংস্কৃত শিক্ষাধারা বজায় রাখাই হবে সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু সরকারের লক্ষ্য যদি হয় দেশজ লোকদের উন্নত করা তবে গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগ যে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত তার ব্যবস্থা করাই হবে সরকারের কর্তব্য। সরকার যে টাকা খরচ করতে চাইছেন সেই টাকায় যদি প্রয়োজনীয় বই, যন্ত্রপাতি ও অ্যাপারেটাস সহ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ও সেখানে ইয়োরোপে শিক্ষিত মেধাবী কিছু শিক্ষককে নিয়োগ করা হয় তাহলে এই উদ্দেশ্য সফল হবে।"

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের ফলে প্রথম যে প্রতিক্রিয়া বাঙালী সমাজে ফুটে উঠেছিল রামমোহন নিজেই তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে ১৮২৬ সালে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নামে

এক সতেরো বছরের কিশোর অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। মাত্র তিন বৎসর অধ্যাপনার পর কলেজ থেকে তিনি বিতাড়িত হন। তেইশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কলেজের ছাত্রদের দেশপ্রেম ও যুক্তিবাদে দীক্ষা দিয়েছিলেন : এই ছাত্রদের ভিতর থেকেই ইয়ং বেঙ্গল নামে এক যুবগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। তারা ছিল সংশয়বাদী, উদারনৈতিক, প্রচলিত লোকাচার, দেশাচার ও ধর্মবিরোধী এবং তাদের আচরণেও কতকটা উচ্ছ্বাস ও উচ্ছৃঙ্খলা ছিল। তারা পাশ্চাত্যের উদার ভাবধারার প্রতি যে কী পরিমাণে উন্মুখ ছিল তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। টম পেইনের The Age of Reason বইখানির দাম ছিল এক টাকা। এক জাহাজে এই বইয়ের একশ কপি এসেছিল, জাহাজঘাটেই একশ কপির প্রতি কপি পাঁচ টাকা কালোবাজারি দরে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল—ক্রেতা ছিল হিন্দু কলেজের ছাত্ররা। তারা নানারকম সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিল—যেমন দি পার্থেনন, জ্ঞানান্বেষণ, হিন্দু পাইওনীয়ার, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, হেস্পেরাস, ইনকুয়েরার, কুইল প্রভৃতি। সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব নলেজ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি বিদ্বৎসভাও তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিদ্যাচর্চা ছাড়া দেশপ্রেমও ছিল তাদের চরিত্রের একটা বড় দিক। কিন্তু তাদের ে ' গার দিকের উগ্র মতবাদ ও আচরণ সমাজকে যেমন নাড়া দিয়েছিল, রামমোহনের মতো প্রগতিশীল মানুষকে পর্যন্তও তেমনি ব্যথিত করেছিল। বিজাতীয় মত ও পথে শিক্ষিত যুবকদের দীক্ষিত হবার সম্ভাবনায় সমাজে যে উৎকণ্ঠা জেগেছিল সেই উৎকণ্ঠাকে নিবারিত করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কারের মারফত প্রগতির পথ খুলে দেওয়া ও দেশকে আত্মস্থ করা এই উভয় প্রয়োজনকে অঙ্গীকার করে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ক. ন ১৮২৮ সালের ২০শে আগস্ট। প্রতি শনিবার সমাজের সভা বসত। পর্দার আড়ালে একটি ঘরে বেদমন্ত্র পাঠ হত প্রথমে, সে ঘরে অব্রাহ্মণদের যাবার

অধিকার ছিল না। উপনিষদের শ্লোক পাঠ করা হত ও তার বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শোনানো হত। রামমোহনের প্রতি রক্ষণশীল সমাজ অতি মাত্রায় বিরূপ থাকা সত্ত্বেও তাঁর কিছুসংখ্যক অনুসারীও ছিল; ফলে ১৮২৯ সালেই ব্রাহ্মসমাজ অনেকখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠানও দেখা দিল; রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে গঠিত ধর্মসভাই সেই প্রতিষ্ঠান। ব্রাহ্মসমাজের দৈনিক সংবাদ পত্র ছিল সম্বাদ কৌমুদী এবং ধর্মসভার দৈনিক সংবাদপত্র ছিল সমাচার চন্দ্রিকা। এই দুই পত্রিকার মাধ্যমে রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদীদের উত্তপ্ত বিতর্ক পবিবেশিত হত—দেশের লোক তার ফলে বহু বিষয়ে নতুন করে ভাবতে ও বিচার করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এমন কি বাংলার সুদূর নিভৃত পল্লী অঞ্চলেও সেই বিতর্কের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সকল বর্ণ, শ্রেণী ও স্তরের লোকরাই সে বিতর্কের দ্বারা প্রভাবিত, এমন কি তাতে অংশ নিতেও সুরু করেছিল। ঐতিহাসিক লিখেছেন এই বিতর্কের ফলে: "the entire Hindu society was convulsed in a manner to which there was no parallel within living memory." (R. C. Majumdar : British Paramountcy and Indian Renaissance, part II p. 100)

এই প্রচণ্ড আলোড়ন ও সংক্ষোভের মধ্যে দাঁড়িয়ে রামমোহন ১৮৩০ সালের ২৩শে জানুয়ারি ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব ভবনটির উদ্বোধন করে বলেছিলেন যে এই ভবন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হবেনা—যাঁরাই এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা এক অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা করবেন—কোনো নাম ও রূপের মাধ্যমে নয়—অরূপ ও অব্যয় রূপে,—তাঁদের সকলের উপাসনার জন্যই এ ভবনের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। ভারতে বেদান্তের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর চরম লক্ষ্য।

রামমোহন উনিশ শতকের গোড়ায় অভ্রান্ত দৃষ্টিতে যুগ সঙ্কটের

স্বরূপ নির্ণয় করেছিলেন। সমাজসংস্কার ও শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে তাঁর পথ নির্দেশ যথার্থ ছিল। তিনি তাঁর সকল কর্ম ও আন্দোলনের ভিত্তি স্বরূপ ধর্মান্দোলনকেই বেছে নিয়েছিলেন—এতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে, কারণ ভারতবর্ষে ধর্মই সকল ভাব ও কর্মের ভিত্তি হয়ে আছে। বেদান্ত প্রচারের জন্য তাঁর চেষ্টা ছিল অকৃত্রিম। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান প্রচাবের দাবী জানাবার বহু আগেই তিনি অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠাব জন্য প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার কবেছিলেন। বামমোহন ভাবতেব এক সঙ্কটকালে যুগপুরুষ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন—তাব কাবণ ভাবতেব প্রকৃতি, স্বভাব ও ইতিহাসেব ধাবা সম্পর্কে তাঁব বোধ ছিল অন্যান্য সমকালীনদের তুলনায় স্বচ্ছ, ভাবতেব প্রাণকেও সে যুগে একমাত্র তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর (১৮৩৩) পব তাঁর কর্মের বিভিন্ন ধারার দায় এক একজন মনীষী গ্রহণ করেন। যেমন ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—সমাজ ও শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য আন্দোলনের নেতৃপদে বৃত হন মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র। এঁদের এবং এঁদের অনুসারীদের সমবেত প্রয়াসের ফলে উনিশ শতকের মধ্যভাগের পর বাংলায় নবজাগৃতির সমস্ত লক্ষণেব পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বৎসরেই বাংলার নবজাগৃতি তার স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করেছিল। ব্রাহ্মধর্মান্দোলন অবশ্য এই সময় মন্থর ও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। রামমোহনের পর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চারে ব্রতী হয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও বাংলার মফঃস্বল অঞ্চলে প্রচারের জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকও নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নতুন শক্তি সঞ্চার করে ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনকে সারা দেশে একটা ব্যাপক আন্দোলনে যিনি পরিণত করেছিলেন তিনি কেশব চন্দ্র সেন। তিনি

ছিলেন প্রগতিবাদী মানুষ,—অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, পর্দাপ্রথার অবসান, ব্রাহ্মণদের উপবীত ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই কারণে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মত পার্থক্য ঘটে। ফলে তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ১৮৬৬ সালে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নামে একটি পৃথক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন এবং সেজন্য দেবেন্দ্রনাথের সমাজটি 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পরিচিতি লাভ করে। আদি ব্রাহ্ম সমাজ ক্রমেই হিন্দুত্বের দিকে বেশি ঝুঁকতে সুরু করে, তার সভাপতি রাজনারায়ণ বসু হিন্দু সভ্যতার জয়ধ্বনি প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেন। তার প্রতিবাদে কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে উদার ও বিশ্বতোমুখী বলে ঘোষণা করেন ও হিন্দু সমাজের জাতি প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর গতিশীল ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব, অসামান্য বাগ্মীতা, আন্তরিকতা ও আবেগ জনচিত্তকে স্পর্শ করেছিল—বাংলা দেশে ও সারা ভারতে ব্রাহ্ম ধর্মকে একটা নতুন ধর্ম রূপে তিনি প্রচাব ও প্রতিষ্ঠা দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বম্বে, মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তিনি নিজে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। তাঁর অনুসারীরা ভারতের অন্যান্য স্থানেও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। আধুনিক যুগে এটাই ছিল প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন। কেশব সেন ইংলণ্ডে গিয়ে রাণী ও তাঁব সরকার এবং বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কর্তৃক প্রভূত ভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন।

কেশব সেন চোদ্দো বছরের কমে মেয়েদের যাতে বিয়ে না হয় সেজন্য সরকারকে দিয়ে আইন পাশ করিয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে অপ্রাপ্ত বয়স্কার বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন কুচবিহারের হিন্দু রাজকুমারের সঙ্গে —তখন তাঁর কন্যা অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিল এবং বিবাহও হয় হিন্দু মতে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর দলে ভাঙ্গন দেখা দেয় ও ১৮৭৮ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আদি, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ—এই ত্রিধা বিভক্ত ব্রাহ্মধর্মান্দোলন শক্তিহীন হয়ে যায় নিজেদের অন্তর্কলহের ফলে। তাছাড়া যে প্রগতিশীল ভূমিকা পালনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব ঘটেছিল, হিন্দু সমাজ ক্রমেই সে ভূমিকাকে আত্মসাৎ করে নেয়।

উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বৎসরে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্মের একটা বিপুল অভ্যুত্থান ঘটেছিল—তারই মধ্যে বাংলার নবজাগৃতি সার্থক পরিণতি লাভ করে। ১৮৭৫ সালে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রামকৃষ্ণ পরমহংসের। কেশব সেন তখন তাঁর প্রতিষ্ঠার শীর্ষদেশে, তাঁর দলে তখনো ভাঙন আসেনি। অপর পক্ষে, রামকৃষ্ণ যদিও অপরিচিত ও অজ্ঞাত, তবু তিনি পূর্ণ সিদ্ধ। হিন্দু ধর্মের প্রধান সাধন মার্গগুলিতে বিচরণ করে তিনি হয়েছেন আপ্তকাম; তন্ত্র, বৈষ্ণব, বেদান্ত, দ্বৈত ও অদ্বৈত, রূপ ও অরূপ—এ সবেরই সাধনার চূড়ান্ত সিদ্ধিতে তিনি উপনীত। উপরন্তু ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের অভিজ্ঞতাও তাঁর লাভ হয়ে গেছে। কেশব সেন বিস্মিত হয়েছিলেন দেখে যে ভারতের চিরন্তন ভাবধারা ও বিশ্বতোমুখী ধর্মের জীবন্ত একটি মূর্তি রামকৃষ্ণ রূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত এক মন্দির প্রাঙ্গণে তখন বর্তমান ও আপন সৌরভে আপনি সে বিভোর। কেশব সেন তাঁকে ভক্তি নম্র প্রণতি জানিয়েছিলেন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁর কথা প্রচার করেছিলেন। কেশবের ধর্মপ্রচারের পরিসমাপ্তি এই রামকৃষ্ণ কথা প্রচারে এবং তাঁর বিশ্বধর্মসাধনার পরিণতি ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদের দীক্ষায়।

ইয়ং বেঙ্গল একদিন কেশব সেনের পদতলে নম্র হয়ে বসে নব জীবন মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল; কেশব সেন পরিণত বয়সে রামকৃষ্ণের নিকট শান্ত ও নম্র চিত্তে নতুনভাবে হিন্দুধর্মের সার সত্যগুলি শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর প্রতিবাদী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ফিরে এলেন হিন্দুধর্মে। রামমোহন যে প্রতিবাদ নিয়ে একদিন বিদ্রোহীর বেশে দাঁড়িয়েছিলেন—সেই প্রতিবাদ শতাব্দী শেষ না হতেই এইভাবে

শান্ত হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা ফিরে এল আপন গৃহে, জননীর কোলে। আদি, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ—তিন ব্রাহ্মসমাজের নায়করাই হিন্দুধর্মের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তার বন্ধন নিবিড়ভাবে অনুভব করলেন শেষ পর্যন্ত এবং তার ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদের জাগরণ বিপুল বেগ নিয়ে দেখা দিল।

ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে এদেশের ভাবমণ্ডলে যে আলোড়ন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল ইয়ং বেঙ্গল তার প্রথম প্রকাশ। তরলতা, উচ্ছ্বাস, হিন্দুধর্ম ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপতা ছিল ইয়ং বেঙ্গলের বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মসমাজ ছিল সে তুলনায় পরিণত, গম্ভীর ও কতকাংশে সহিষ্ণু—কিন্তু তাকেও বাংলার আলোড়িত ভাবমণ্ডলের দ্বিতীয় প্রকাশ মাত্র বলেই অভিহিত করতে হয়। বাংলার প্রকৃত আত্মস্থ রূপ ও নবজাগ্রত বাংলার প্রামাণ্য আত্মপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বৎসরে। সুভাষচন্দ্র সেই যুগের জাতক। সে সময়ে ধর্মে, সমাজ-আন্দোলনে, শিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনে এবং সাহিত্যে জাতীয় ভাব ও জাতীয় নেতৃত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। ধর্মে রামকৃষ্ণ; সমাজ, শিক্ষা, নারীমুক্তি আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র; সাহিত্যে বঙ্কিম—জাতীয় ভাবধারার প্রতিমূর্তি এই তিন ব্যক্তির প্রভাবে বাংলা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করতে ও ফিরে পেতে সক্ষম হয়। সে ছিল ভারতবর্ষেরও নিজেকে ফিরে পাওয়া।

৬

সুভাষচন্দ্র উনিশ শতকের শেষ লগ্নে জন্মলাভের ফলে বাংলার উনিশ শতকীয় সাধনা ও কর্মপ্রচেষ্টার সমগ্র ধারার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহী সত্তার আবেশ তাঁর মধ্যে অনুভব করতে পারি,—তাঁদের মানসমুক্তির অভিযানের সুভাষচন্দ্রও যেন একজন শরিক। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব যখন সারা দেশকে

আচ্ছন্ন করেছিল, জহরলাল নেহেরুর মতো আধুনিক, নিরীশ্বরবাদী ও অহংপ্রধান মানুষও সে প্রভাবের নিকট নতি স্বীকার করে গান্ধীর যুক্তিবিরোধী, অস্পষ্ট মত ও পথকে মেনে নিয়েছিলেন, সুভাষ একা সেদিন যুক্তিবাদে আস্থা রেখে গান্ধীপ্রভাবের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কর্ম-পন্থার অনুসরণ করতে দেশবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম যেদিন তাঁর সাক্ষাৎ হয় সেই দিন থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের বিচার বুদ্ধির আলোয় গান্ধীদর্শন ও গান্ধী-রাজনীতি তিনি বিশ্লেষণ করে গ্রহণ অথবা বর্জন করেছেন। গান্ধীজীর মতো রাজনীতি ও ধর্মের একটা অসিদ্ধ মিশ্রণকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় কর্মের ক্ষেত্রে তো বটেই, অযৌক্তিক ও বাস্তবে অসিদ্ধ মত ও পথকে তিনি সমর্থন করেননি। বিচার ও বিশ্লেষণের নিকষে যাচাই না করে কোনো কিছুকেই তিনি স্বীকার বা গ্রহণ করেননি। তাঁকে দেখে মনে হয় বাংলায় যারা এক যুগে অধীর আগ্রহে টম পেইনের "এজ অফ রীজন" বইখানি কালোবাজারি দাম দিয়ে কিনেছিল তাদের যুক্তিপূজা এ দেশে বিফল হয়নি। সত্যই, ইয়ংবেঙ্গলের যুক্তিবাদে নিষ্ঠা সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে ও মননে প্রতিফলিত হয়েছে।

রামমোহনের ঐতিহ্যও সুভাষচন্দ্রের জীবনে ফলপ্রসূ হয়েছিল। রামমোহনের নির্ভীকতা ও পৌরুষ, প্রচলিত মত ও পথের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াবার ক্ষমতা, তাঁর আপসহীন সংগ্রামী মনোবৃত্তি, তাঁর বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, তাঁর ভারতবোধ এ সমস্তই সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ফিরে পাই বহুগুণিতরূপে। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ভারতপথিক নামে অভিহিত করেছিলেন, সুভাষচন্দ্র আত্মপরিচয় দিয়েছেন নিজেকে ভারতপথিক বা ভারতপথের তীর্থযাত্রী বলে। রামমোহনের মতো তিনি অবশ্য ধর্ম সংস্কারক বা সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, কিন্তু সমাজব্যবস্থা পালটাবার স্বপ্ন তাঁর ছিল। সমাজের ক্ষেত্রে আংশিক আন্দোলনের বদলে তিনি সমাজের মূল সমস্যাগুলির প্রতি সামগ্রিক

দৃষ্টি নিয়ে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন ও সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা অনুসরণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের সাধনাও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছিল। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু এক সময়ে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অনুরক্ত ও কেশব সেনের বক্তৃতায় মুগ্ধ। সুভাষচন্দ্রের জীবনে যে একমাত্র শিক্ষক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সেই বেণীমাধব দাসও ছিলেন ব্রাহ্ম। এরকম নানা সূত্রেই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তাঁর জীবনে এসে থাকতে পারে,—কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় দিক থেকে বিষয়টিকে দেখা উচিত। ব্রাহ্মসমাজ সমকালীন বাঙালী জীবনে সর্বপ্রকার নৈতিক শিথিলতার বিরোধী একটি প্রতিষ্ঠান ছিল: আদর্শহীনতা, সুবিধাবাদ ও দুর্নীতি যে সময়ে এদেশের সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে সংক্রমিত হয়ে জাতির মেরুদণ্ডকেই জীর্ণ করে তুলেছিল সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ নীতি ও আদর্শের পতাকা ঊর্ধে তুলে ধরেছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় অবদান। নারীর প্রতি পুরুষের সেকালে একটিমাত্র দৃষ্টিই ছিল—কামুক ও স্বার্থপরের দৃষ্টি। আঠারো শতকের নৈতিক ও আদর্শগত সঙ্কটের কথা আগে বলেছি—জীবনকে শুধুমাত্র কাম বাসনা তৃপ্ত করার ক্ষেত্র ছাড়া আর কোনো মূল্যের নিরীখে দেখা হত না সে যুগে। নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহার দিয়েই যে কোনো যুগের সমাজের গভীরতর সঙ্কটের পরিমাপ করা যায়,—এবং সেই মানের প্রয়োগ করলে রামমোহনের পূর্ববর্তী ও সমকালীন বাঙালী সমাজকে ধিক্কার না দিয়ে থাকা যায় না। সেই অতলান্ত অবক্ষয়ের মধ্যে নিপতিত, সুস্থতার প্রতি তীব্র অনীহাযুক্ত, দুর্বল, গ্লানিজর্জর সমাজে রামমোহন ও তাঁর উত্তরসূরীগণ নতুন করে নীতি ও আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, জীবনের ওপর নতুন মূল্য আরোপ করেছিলেন, কামকলুষতাসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন পুরুষকে উন্নততর জীবনবোধ ও জীবনাদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন; কলকাতার নবোদিত বুর্জোয়া বাবুরা যখন পায়রা ওড়ানো, বিড়ালের বিবাহ ও

বারাঙ্গনা পোষণে অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করাকেই আভিজাত্যের লক্ষণ বলে নির্ণয় করে দিয়েছিলেন সেই সময় ব্রাহ্মসমাজ দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গীকে পৌরুষধর্ম ও মনুষ্যত্বধর্মের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেশব সেন যখন খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত তখন তাঁর একটি মাত্র সুবিধাবাদী কাজের জন্য তিনি ব্রাহ্মদের শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ব্রাহ্মগণ তাঁদের নৈতিক আদর্শ ও আচরণের মান যে কত উচ্চগ্রামে বেঁধেছিলেন এই ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্মাঙ্গনের বৃহত্তর পটভূমিতে ব্রাহ্মদের এই আদর্শনিষ্ঠা ও নীতিবাদকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে সেও ছিল তাঁর একটি মহৎ অবদান। আধুনিক কালে রাজনীতির অর্থ দাঁড়িয়েছে কপটাচার, মুখের কথা ও আসল মতলব যাতে সর্বদা আলাদা হবে, আদর্শ ও নীতির বুলির আড়ালে সুবিধাবাদের ছুরিতে শান দেওয়া হবে, রাজনৈতিক আদর্শের সংগ্রামে নেতৃত্বপদ গ্রহণ করে শত্রুপক্ষের হয়ে চর বৃত্তিতেও বাধা থাকবে না ইত্যাদি। সুভাষ এই সহজ সাফল্যের রাজনীতির জ্বলন্ত প্রতিবাদ। তাঁর আদর্শে প্রত্যয় ও নিষ্ঠা ছিল অবিচল ; অন্তরের আদর্শকে বাইরে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে তিনি কোনো প্রকার দ্বিধা বোধ করেননি ; এবং ঘোষিত আদর্শকে বাস্তবে অনুসরণ করাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারার বৈশিষ্ট্য। তাঁর সমকালীন ভারতে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের সংক্রামে অধিকাংশ দল ও নেতা আদর্শের সঙ্গে পদে পদে আপস করাকেই জীবনের কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামও তার ফলে কলুষিত হয়েছে, ভারতের জনজীবনে যে সামগ্রিক বিপর্যয় ও দৈন্য দেখা দিয়েছে তারও মূলে রয়েছে ঐ কারণটি। সুভাষ চারদিকের সুবিধাবাদের জয়ধ্বনির মধ্যে দাঁড়িয়েও প্রায় একক প্রচেষ্টায় আদর্শ ও নীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। রাজনীতিতে যাঁরা তাঁর বিরোধী ছিলেন তাঁদের সম্পর্কেও মিথ্যাচার, ছলনা বা কূট ব্যবহারের

আশ্রয় তিনি নেননি—শত্রুর সঙ্গেও তিনি সরাসরি ও প্রকাশ্য মোকাবিলাই পছন্দ করতেন।

উনিশ শতকে বাংলার নব জাগৃতির একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল সে সময়কার শিক্ষা আন্দোলনে। শিক্ষার প্রসার ও উচ্চশিক্ষার প্রবর্তন এ দুই-ই ছিল সে আন্দোলনের লক্ষ্য। অবশ্যই শিক্ষা বলতে তখন ইংরেজি বিদ্যা বা আধুনিক যুগোপযোগী বিদ্যা শিক্ষাকেই বোঝানো হত। সুভাষচন্দ্রের যখন জন্ম হয় তখন বাংলা দেশে শিক্ষার বিস্তার অনেকখানি ঘটে গেছে। ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতির ফলে দেশের অধিকাংশ নরনারী শিক্ষার সুযোগ থেকে ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ১৯০১ সালের লোক গণনা মতে প্রতি ১০০০ জন পুরুষের মধ্যে ৯৮ জন ও প্রতি ১০০০ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে মাত্র ৭ জন লিখতে পড়তে পারত। তবু একথাও সত্য যে ১৯০১-২ সালে সারা ভারতে ১,০৫,০০০টি সরকারী ও ৪৩,০০০টি বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৬,০০,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করত। অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের ব্যাপক অংশ অশিক্ষিত থাকলেও একটা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী দেশে গড়ে উঠেছিল। এই নতুন শিক্ষিত শ্রেণীটি একদিকে যেমন ভারতে ইংরেজ শাসনেব প্রধান বাহন ছিল, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামও তারাই পরিচালনা করেছে।

সুভাষচন্দ্র এই নবোদিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন। তাঁর পিতা জমিদার, শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী ছিলেন না, শিক্ষাই তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। ১৮৩৫ সালে যে সরকারী শিক্ষানীতি এদেশে গৃহীত হয়েছিল তার সুদূরবিস্তৃত ফলাফল তাই সুভাষচন্দ্রের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাঁর মানসগঠনেও তার একটা ভূমিকা আছে। এদেশে ইংরেজি বিদ্যা বিস্তারের ইতিহাস ভিন্ন রকম হলে অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব না ঘটলে রামমোহনের পরবর্তী বাংলার ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন

খাতে প্রবাহিত হয়ে যেতে পারত ও সুভাষচন্দ্রের মতো আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নেতৃপুরুষের আবির্ভাব হয়তো বা অসম্ভব হত। ভারতের অতীত ইতিহাসে এ রকম মানুষের নজীর তো নেই।

কিন্তু উনিশ শতকে বাংলা দেশে যে শিক্ষা-আন্দোলন হয়েছিল তার একটা ভিন্ন ফলশ্রুতিও সুভাষের জীবনে দেখা দিয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ায়, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষাকে জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গঠন করার একটা প্রয়াস এ দেশের নেতারা করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের চেষ্টাও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজি বিদ্যার প্রয়োজন থাকলেও জাতীয় বৈশিষ্ট্য, সংস্কার ও মানসিকতার অনুকূল শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনও স্বীকৃত হতে থাকে এবং ১৯২১ সালে গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী ও সরকারী সংস্পর্শযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটও অন্যতম কার্যসূচী হওয়ায় বাংলায় দেশবন্ধুর আহ্বানে পঞ্চাশ হাজার ছাত্র কয়েক মাসের ভিতর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তাদের প্রয়োজনে বিকল্প জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রশ্নটি জরুরী হয়ে দেখা দেয়। দেশবন্ধুর সেদিকেও লক্ষ্য ছিল এবং সে লক্ষ্য সাধনের ব্যাপারে তিনি বিশেষ দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন তরুণ সুভাষচন্দ্রের ওপর। সুভাষ বাংলার জাতীয় বিদ্যালয়গুলি সংগঠিত করার ভার পেয়েছিলেন ও কলকাতা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। যুগোপযোগী অথচ জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শিক্ষাক্রমের উদ্ভাবন করায় তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। বাংলা দেশে শিক্ষাকে জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা দান করার ক্ষেত্রে তাঁর একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। উনিশ শতকে রামমোহন ইংরেজি বিদ্যাকে সাদরে ও সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিলেন আমাদের দেশের

পক্ষ থেকে, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য মণীষীরা সেই ইংরেজি বিদ্যার বিস্তৃতির জন্যই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জাতীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের দাবী সে শিক্ষাক্রমে স্বীকৃত হয়নি। অবশ্য আজও সে স্বীকৃতি কতখানি এসেছে তা সংশয়ের বিষয়। সুভাষ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করেছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন—প্রচলিত শিক্ষাধারার পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষাধারার প্রবর্তনে তাঁর এই আগ্রহ ও প্রয়াস তাঁকে শিক্ষা-আন্দোলনের একজন শরিক ও পথিকৃতের মর্যাদা দান করেছে।

বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনেব শেষ অধ্যায়ে দেশ নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল, নিজের আত্মাকে আবিষ্কাব করেছিল। নবজাগৃতি আন্দোলনের সেটাই সুচিরস্থায়ী ও পরিণততম ফল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে দেশের এই আত্ম-আবিষ্কার তথা আত্মোপলব্ধির পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। বঙ্কিম ছিলেন জাতিস্রষ্টা, পুরানো আধারেই নতুন জাতি সৃষ্টির মন্ত্রবিৎ। বাংলার পথ, ভারতের পথ অকম্পিত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন। সারা জীবন তিনি বিদেশী সরকারের চাকরি করেছিলেন ও বিশ্ববিদ্যার বহু বিচিত্র ভাগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন; তবু তাঁরই মর্মমূলে এই দেশের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম সঞ্চিত হয়েছিল ও জাতির ভবিতব্য লিপি পাঠে তিনিই সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্কিমই প্রকৃত ও সুদূরপ্রসারী অর্থে নব্য বাংলার স্রষ্টা, নব্য ভারতীয় জাতির জীবনদাতা। বঙ্কিমের ঋষিদৃষ্টি, যার সম্যক পরিচয় উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছরে উদ্ঘাটিত হয়েছিল,— উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কোনো নেতা ও মণীষীর মধ্যেই পাইনা। চিরকাল বাঙালীর প্রাণ সবচেয়ে নিবিড় ও গভীরভাবে বাজে মাতৃনামে, বাঙালীর চিরন্তন উজ্জীবন মন্ত্র মাতৃমন্ত্র;—রামকৃষ্ণ বাঙালীর হৃদিমন্দিরে যে সময় মাতৃব্যাকুলতা সঞ্চার করেছিলেন সেই একই সময়ে বঙ্কিম সর্বশ্রেণীর বাঙালীর প্রাকৃত দৃষ্টির সম্মুখেও এক সর্বজনীন মাতৃমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন—সেই মা দেশ-

জননী, তাঁকে স্পর্শ করা যায়, বোঝা যায়, হৃদয়-নিভৃতে তাঁর জন্য বেদনা ও আর্তি অনুভব করা যায়। বাংলার বিশ শতকের সকল সংগ্রাম ও সাধনার কেন্দ্রে রয়েছেন বঙ্কিম-বন্দিত ওই মা—আর সুভাষের কণ্ঠে পাই তাঁরই বন্দনার বাণী, তাঁর হৃদয় ও বাহুতে সেই মায়েরই নামে সকল বীর্যের সঞ্চার, তাঁর জীবনের সকল ছন্দ ওই মায়ের চরণেই নিবেদিত।

উনিশ শতকের বাংলার নব জাগৃতির শেষ পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতধর্মের প্রচারক—রামমোহনে যে ভারত-ধর্মের প্রথম উপলব্ধির লক্ষণ দেখতে পাই, গোটা এক শতাব্দীর সাধনার শেষে তা বিবেকানন্দের মধ্যে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সেই ভারতধর্মকে কোথাও হিন্দুধর্ম, কোথাও বেদান্ত, কোথাও দেশপ্রেম, কোথাও বা ভারতবাসীর জন্য সুতীব্র বেদনাবোধ রূপে তিনি ব্যক্ত করেছেন। নিবেদিতাই এদেশে জাতীয়তাবাদ শব্দটির প্রথম প্রবর্তক,—ওই শব্দের মাধ্যমে বিবেকানন্দের ভারতসাধনাকে তিনি এদেশের আপামর জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন! ১৮৮৫ সালে যে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল তার গোড়াতে সে প্রতিষ্ঠান ভারতধর্মকে অঙ্গীকার করতে পারেনি। কিন্তু অরবিন্দ ও বিপিন পাল, তিলক ও দেশবন্ধু এই ভারতধর্মের শক্তির ওপরই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা-সংগ্রামকে গড়ে তুলে-ছিলেন।'। রামমোহন থেকে যে ধারার সূত্রপাত সেই ধারার শেষ পুরুষ সুভাষচন্দ্র—তিনি রাজনীতিতে প্রবিষ্ট বটে, কিন্তু রাজনৈতিক কৌশল ও ছলনা অপেক্ষা সবতোভাবে ভারতের আত্মধর্মে বিশ্বাসবান;—সে কারণেই তাঁর পথ দুর্গম ও বন্ধুর, কখনো বা লোকদৃষ্টির অন্তরালে আবৃত, এবং সর্বদাই আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধাবিত।'

এই আপসহীন সংগ্রামের মন্ত্রই বা তিনি পেয়েছিলেন কোথায়? এ যুগে রামকৃষ্ণই সে মন্ত্রের দীক্ষাদাতা। আদর্শের সঙ্গে যে আপস

চলেনা, সত্যের ক্ষেত্রে যে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি চলেনা, ভাব ও কার্য যে এক হতেই হবে,—রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কোথাও সামান্যতম আপসকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। রামমোহনে বেদান্ত প্রচার ও বিষয়াসক্তি, ধর্মীয় মতভেদের কারণে জননীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও ধর্মীয় মতভেদ সত্ত্বেও পিতার সম্পত্তি গ্রহণ ও পিতৃদত্ত ঈশ্বর বিগ্রহ পূজার ব্যবস্থা করা—এই সব স্ববিরোধী জিনিস একই সঙ্গে সম্ভব ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণের পক্ষে ভাবের ঘরে এই চুরি ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ও এমন কি মনের অজ্ঞাতসারেও অসম্ভব। রামকৃষ্ণ ব্যক্তিজীবনে যে আপসহীনতার পথ দেখিয়েছিলেন সুভাষ রাষ্ট্রজীবনের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাকেই বরণ করেছিলেন।

এই গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের যে পরিচয় লাভের আমরা চেষ্টা করব তাতে দেশপ্রেমিক ও রাজনীতিবিদ সুভাষের কথা অবশ্যই থাকবে —কিন্তু তাঁর সেই দেশপ্রেমের স্বরূপ ও রাজনৈতিক কর্মের মৌল প্রেরণার বিচার করাও অত্যাবশ্যক হয়ে উঠবে। কারণ সুভাষ নামক বিশালায়তন, বহুকর্মজালবিস্তারকারী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের ভিতরের আদত মানুষটির পরিচয় লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য। তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে একদিকে আবর্তিত হয়েছে ভারতের সমকালীন ইতিহাস, সেই হিসাবে তিনি ইতিহাসের বিষয়ীভূত; আর একদিকে তিনি এক অসঙ্গ মানুষ; অতৃপ্ত, দিগন্তবিসারী পথের পথিক, অপার্থিব ভাবে আবিষ্ট, নিঃস্বার্থ, ভিন্নতর চেতনার কারণে মানব জগতে বিদেশীর মতো;—জগতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তাঁর তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। বাংলার নবযুগের সাধনার সারাৎসারের এই বিগ্রহ-পুরুষের দিকে তাকালে বাঙালী চিরকাল তার আত্মপরিচয় খুঁজে পাবে। সুভাষের জীবনের আলোয় বাংলা ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ গতিপথ আবিষ্কার করাও হয়ত অসম্ভব হবেনা।

৪ ॥ পরিবার প্রসঙ্গ

সুভাষচন্দ্র পিতামাতার ষষ্ঠ পুত্র ও নবম সন্তান। পিতা জানকীনাথ বসু ও মাতা প্রভাবতী দেবী। বসু পরিবারের ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ বংশোদ্ভূত বসুরা চিরকালই বাঙালী সমাজে উচ্চবর্ণের সম্মান পেয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের সাতাশ পুরুষ আগে দশরথ বসু এই দক্ষিণরাঢ়ীয় বসু বংশের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। দশবথ বসু খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক। তাঁর দুই পুত্র—কৃষ্ণ ও পবম। পরম পূর্ববঙ্গে চলে যান, তাঁর বংশধরগণ বঙ্গজ কায়স্থ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। কৃষ্ণ বসু বাস করতেন রাঢ়াঞ্চলে। কৃষ্ণ বসুর পুত্র ভবনাথ ও ভবনাথের পুত্র হংসেশ্বর। হংসেশ্বরের তিনটি পুত্র—শুক্তিবাম, মুক্তিরাম ও অলঙ্কাব বসু। শুক্তিরাম বাগাণ্ডায় বাস কবতেন, মুক্তিরাম মাহীনগরে এসে বাসস্থাপনা করেন, অলঙ্কাব চলে যান পূববঙ্গে। মুক্তিরাম মাহীনগরে সমাজপতি হয়েছিলেন। তখন বাংলা দেশে তেবো শতকের মুসলমানী আমল চলছে। ইতিপূবে বল্লাল সেন নতুন বর্ণপ্রথা প্রবর্তন কবে গোটা বাঙালী জাতিকে একটা অতিশয় রক্ষণশীল ও বর্ণবিভক্ত কাঠামোব মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন—স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার সমাজে অতিশয় প্রাবল্য লাভ কবেছে। তারপর মুসলমানদের আগমনেব ফলে ও বাজশক্তি তাদেব করায়ত্ত হওয়ায় হিন্দু সমাজ ভীত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। বল্লাল সেনের দেওয়া কাঠামোকে তারা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল বিজাতীয়তার স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। ইসলাম এদেশে ধর্মান্তরকরণের একটা উন্মাদনা নিয়ে এসেছিল। সেই উন্মাদনার সম্মুখে হিন্দু সমাজ প্রতিরোধ রচনা করতে ব্যর্থ হওয়ায় কমঠ বৃত্তি অবলম্বন করেছিল, অর্থাৎ

কচ্ছপের মতো নিজের শক্ত খোলসের ভিতর হাত পা গুটিয়ে ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ বাঁচাবার চেষ্টায় রত হয়েছিল। মুক্তিরাম বসু কুলীন সন্তান, তাতে আবার গ্রামের হিন্দু সমাজের সমাজপতি—তাই নিজের বংশ-বিশুদ্ধতা তথা কৌলীন্য অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি যত্নপর ছিলেন। মুক্তিরামের পুত্র দামোদর, দামোদরের পুত্র অনন্ত, অনন্তের পুত্র গুণাকর, গুণাকরের পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের তিনটি পুত্র জন্মে—মহীপতি বসু, পঞ্চানন বসু ও নারায়ণ বসু। মহীপতি বসু এই বংশের একজন প্রসিদ্ধ পুরুষ। তাঁর প্রতিভা ও কার্যনিপুণতার খ্যাতি তৎকালীন সমাজে বিস্তৃত হয়েছিল এবং গৌড়ের মুসলমান রাজা তাঁকে গৌড়ের রাজধানীতে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে গৌড়েশ্বর তাঁকে রাজস্ব ও যুদ্ধবিগ্রহ বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। হিন্দু রাজত্বকালে এই পদটিরই নাম ছিল মহাসন্ধিবিগ্রহিক। গৌড়ের রাজধানীতে মহীপতি মন্ত্রী হওয়ায় তাঁর স্বীয় গ্রামে তিনি রাজবৎ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। বাদশা তাকে উপাধি দিয়েছিলেন সুবুদ্ধি খাঁ। তিনি রাজার নিকট থেকে পুরস্কার স্বরূপ জায়গীরও পেয়েছিলেন। মাহীনগরের নিকটেই সেই জায়গীর তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়ে আজও সুবুদ্ধিপুব নামে পরিচিত হয়ে আছে। এই সুবুদ্ধিপুর এখন একটি গ্রাম,—মাহীনগরের দুই মাইল দক্ষিণে ও বারুইপুরের ঈষৎ উত্তরে অবস্থিত। মহীপতি বসু এই গ্রামে কিছুকাল বাস করেছিলেন বলে মনে হয়।

মহীপতি বসুর দশটি পুত্র লাভ হয়—সুরেশ্বর, গদাধর, বিষ্ণু, ঈশান খাঁ, দাশরথি, সর্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বব, গঙ্গাধর, ভগীরথ ও পরমেশ্বর বসু। সুরেশ্বর পিতার যশের উপযুক্ত অধিকারী ছিলেন, বিষ্ণু পিতার সমাজপতিত্বের পদ পেয়েছিলেন ও ঈশান খাঁ রাজদরবারে পিতার সদৃশ রাজসম্মান ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ঈশান খাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা সকলের প্রশংসার বিষয় ছিল। তাঁর তিন পুত্র—

গোবিন্দ, গোপীনাথ ও বল্লভ বসু। গৌড়ের সুলতান প্রীত হয়ে গোবিন্দকে গন্ধর্ব খাঁ, গোপীনাথকে পুরন্দর খাঁ ও বল্লভকে সুন্দরবর খাঁ উপাধি দিয়েছিলেন। উপাধি দানের সঙ্গে সুলতান তাঁদের আলাদা আলাদা ভাবে জায়গীরও দান করেছিলেন। গোবিন্দ বসু যে জায়গীর পেয়েছিলেন তা মাহীনগরের দেড় মাইল পূর্বে গোবিন্দপুর নামে এখনও পরিচিত। পুরন্দর খাঁর জায়গীর পুরন্দরপুর মাহীনগর হতে দু মাইল পশ্চিম-উত্তর কোণে বিদ্যমান। বল্লভের জায়গীরের নাম ছিল বুড়ো মল্লিকপুর—বর্তমানে তারই নামে হয়েছে মল্লিকপুর ষ্টেশন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩ খৃঃ—১৫১৯ খৃঃ) সময়েই পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসু জীবিত ছিলেন। পুরন্দর খাঁ হোসেন শাহের রাজস্বমন্ত্রী ও নৌ-সেনাপতি হয়েছিলেন। হোসেন শাহ কামরূপ, অহোম, কোচবিহার বা কামতা, জাজনগর ও ওড়িশায় যুদ্ধাভিযান পাঠিয়েছিলেন, নৌবাহিনীর তাতে একটা বড় অংশ ছিল। সব যুদ্ধে হোসেন শাহ জয়ী হননি, বিশেষত অহোম ও ওড়িশার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ত্রিপুরার সঙ্গে যুদ্ধেও হোসেন শাহ জয়লাভ করেননি। তবে আরাকানরাজের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জয়যুক্ত হয়েছিলেন। বিহারের অনেকাংশও তার দখলে আসে। হোসেন শাহের রাজত্বকালেই পর্তুগীজরা প্রথম বাংলায় আসে। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জোআঁ-দে-সিলভেরোর নেতৃত্বে একদল পর্তুগীজ চট্টগ্রামে এসেছিল। হোসেন শাহের রাজত্বকালে নৌবাহিনীর গুরুত্ব কতখানি বেড়ে গিয়েছিল তা তাঁর যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ হতেই বোঝা যায় এবং পুরন্দর খাঁ বাংলার দক্ষিণভাগে জলপথে আক্রমণের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সে দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে পেরেছিলেন। হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন পরাগল খান ও ছুটি খান, প্রধান মন্ত্রী

ছিলেন সনাতন, অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন রূপ। এই সময়কার বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়।

পুরন্দর খাঁ রাজদরবারে তাঁর পুরুষানুক্রমে প্রতিষ্ঠার জন্য স্ব সমাজে বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন। তাঁর অবস্থানের কারণেই মাহীনগর দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের কেন্দ্রস্থল বলে বিবেচিত হত। মাহীনগরের পাশ দিয়েই সে সময় গঙ্গানদী প্রবাহিত ছিল। এই গঙ্গাপথে পুরন্দর খাঁ মাহীনগর হতে গৌড় পর্যন্ত যাতায়াত করতেন।

বল্লাল সেন প্রবর্তিত কুল নিয়ম মতে কায়স্থদের মধ্যে কুলীন ও মৌলিক দুটি ভাগ ছিল এবং এই দুই ভাগের ভিতর বিবাহাদি সম্পর্ক ছিল না। কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন সমাজ মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত পাত্র সর্বদা স্বসমাজে পেতেন না, এতে একটা উৎকট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। পুরন্দর কুলীন সমাজকে রক্ষার জন্য ও কুলীন-মৌলিকের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমস্ত কায়স্থ সমাজকে একজাই বা সমীকরণ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই সামাজিক সম্মেলন উপলক্ষে মাহীনগরে লক্ষাধিক ব্যক্তির সমাগম ঘটেছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য পুরন্দর বহু শ্রমিক নিয়োগ করে দ্রুত একটি বিশাল দীঘি খনন করিয়েছিলেন। লোকপ্রচলিত মতে এই শ্রমিকগণ প্রতিদিন কাজশেষে তাদের কোদালগুলি ধুয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রাখত এবং সেই জায়গাটাই কোদালিয়া নামে খ্যাত হয়েছিল। এই কোদালিয়া গ্রামই সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি। এখনও তাঁদের বসতবাটি এখানে বিদ্যমান আছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এই অঞ্চলটি বংশ পরম্পরায় বসুদের স্মৃতি বহন করে চলেছে। পুরন্দরের দীঘিটি খাঁ পুকুর নামে পরিচিত ছিল, তাঁর বাগানবাড়ি এখনও মালঞ্চ গ্রাম নামে পরিচিত হয়ে আছে।

পুরন্দর বল্লাল সেনের কুলপ্রথার পরিবর্তন করে সমাজ সংস্কারক রূপে বাংলার ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। তাঁর প্রবর্তিত নিয়মমতে

কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই শুধু কুলীনকন্যা বিয়ে করতে হবে—অন্য পুত্ররা কুলীন বা মৌলিক যে কোন ঘরে বিয়ে করতে পারবে। এই নিয়মের ফলে কুলীন মেয়েদেরও মৌলিকদের ভিতর বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেছিল এবং সেজন্য কায়স্থসমাজ ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেয়েছিল। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের মুখ্য স্থান দখল করেছিল ছয়টি গোষ্ঠী—ঘোষ বংশের আকনা ও বালি, বসুবংশের মাহীনগর ও বাগাণ্ডা এবং মিত্র বংশের টেকা ও বড়িসা। পুবন্দর খাঁ স্বীয় প্রভাব ও কীর্তির দ্বারা মাহীনগরকে কায়স্থসমাজের মুখ্য স্থল করে তুলেছিলেন।

১৩শ পর্যায়ে পুরন্দর যে একজাই করেছিলেন তাঁর পুত্র কেশব খাঁ ১৪শ পর্যায়ে তার পুনরাবৃত্তি করেন। কেশবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণবিশ্বাস খান ১৫শ পর্যায়ে আবার একজাই করেন। কৃষ্ণ বসু সুলতানের নিকট হতে বিশ্বাস খান উপাধি পেয়েছিলেন। সুলতান তাঁকে যে জায়গীর দিয়েছিলেন পুবন্দরপুরের দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণপুর নামে আজও তা পরিচিত। মাহীনগরে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের তিনবার একজাই হওয়ায় মাহীনগর একসময়ে সামাজিকগণের তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্রকে এই সকল কারণে বাংলার এক কীর্তিমান বংশের সন্তান বলা যায়।

তাঁর বংশাবলীর কথায় ফিরে এসে আমরা দেখি যে ১০ম পর্যায়ে লক্ষ্মণ বসুর এক পুত্র মহীপতি থেকে পুরন্দরের ধারার উৎপত্তি, আর এক পুত্র নারায়ণ বসু থেকে তৎপুত্র স্থির বসু, তৎপুত্র কোনার্ক বসু, তৎপুত্র পরমানন্দ বসু, তৎপুত্র বাসুদেব বসু, তৎপুত্র জানকীনাথ বসু, তৎপুত্র রমানাথ বসু, তৎপুত্র ভবানীদাস বসু এবং তৎপুত্র রামভদ্র বসু প্রভৃতির ধারা অদ্যাবধি বর্তমান। রামভদ্রের দুই ছেলে—যাদবেন্দ্র ও সদাশিব। যাদবেন্দ্রের তিন পুত্র, রামেশ্বর, খড়োশ্বর ও রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্র রামচরণ বসু। রামচরণের দুই ছেলে—রামকান্ত ও রামহরি। রামহরির ছয় ছেলে, রামমোহন, মদনমোহন, প্রাণমোহন,

কৃষ্ণমোহন, মথুরামোহন, ভুবনমোহন। প্রাণমোহনের তিন ছেলে, বৃন্দাবন, দীননাথ ও হরনাথ। হরনাথের চার ছেলে যদুনাথ, কেদারনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও জানকীনাথ। হরনাথ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র জানকীনাথ বসুই সুভাষচন্দ্রের পিতা।

জানকীনাথ বসুর আটটি ছেলে ও ছয়টি মেয়ে। সুভাষ পিতা-মাতার নবম সন্তান। ছেলেদের নাম যথাক্রমে সতীশ, শরৎ, সুরেশ, সুধীর, সুনীল, সুভাষ, শৈলেশ ও সন্তোষ। মেয়েদের নাম প্রমীলা, সরলা, তরুবালা, মলিনা, প্রতিভা ও কনকলতা।

সুভাষচন্দ্রের জননী প্রভাবতী দেবীও কলকাতার একটি বিশেষ সম্মানিত বংশের সন্তান। বিবাহের পূর্বে প্রভাবতী ছিলেন প্রভাবতী দত্ত—হাটখোলার দত্ত বংশের মেয়ে। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে কলকাতার যে নবোদিত অভিজাত সম্প্রদায়ের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি হাটখোলার দত্তরা সেই সম্প্রদায়েরই অন্যতম।

প্রভাবতী দেবীর পিতামহ কাশীনাথ দত্ত সুশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠাবান, বিদ্যোৎসাহী ও সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রদরদী রূপে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি ব্রিটিশ কোম্পানী মেসার্স জার্ডিন, স্কীনার এণ্ড কোম্পানীতে একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার ছিলেন। তাঁর একজন জামাতা স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। আর একজন জামাতা রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু কটকে ওকালতি করে অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। প্রভাবতীর পিতৃদেব গঙ্গানারায়ণ দত্ত। গঙ্গানারায়ণের ছয়টি মেয়ে—প্রভাবতী, সত্যবতী, রূপবতী, গুণবতী, ঊষাবতী, নিশাবতী। তাঁর ছেলেও ছিল নয়টি—সুরেন্দ্র, জ্যোতিন্দ্র, ভূপেন্দ্র, যোগীন্দ্র, গিরীন্দ্র, বীরেন্দ্র, অরুণেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, রণেন্দ্র। প্রভাবতী ছিলেন বাবার বড় মেয়ে, আদরের দুলালী। তিনি যাতে সৎপাত্রে পড়েন এজন্য গঙ্গানারায়ণ যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন। জানকীনাথের সঙ্গে বিবাহ স্থির করার আগে সাক্ষাতে আলাপ-

Recd. 25/11/57

[illegible],

[illegible]

[illegible]।

[illegible]।

"[illegible]" [illegible]।

ইতি — মুকুল

[illegible],

[illegible] "[illegible]" [illegible] programme [illegible], [illegible]।

[illegible], [illegible]। [illegible]।

[illegible]। [illegible]? [illegible], [illegible]। [illegible] material [illegible]। [illegible]

পুঃ [illegible]। [illegible], [illegible] Research [illegible]।

ইতি [illegible]

if possible in order to be in time for the January number of M. Review

Poste Restante, Badgastein, Austria
10.12.37

My dear Asoke,

I am glad to have your letters of the 25th November and 30th Nov. I have already read a packet of letters from Mejdada (written by me from England). The next packet (Burma letters) has not arrived yet — because it is coming by ordinary post. Kali Charan gave me some very good material about Purandar Khan. I wonder if Nagen Babu can give me any more.

By the way I want a good photo of father and mother. The Calcutta Municipal Gazette published a good photo of father when he died. These can come by ordinary mail. I also want information about mother's forbears i.e. Kasinath Dutt and others and their connection with other families like Sir Romesh Mitter, Sir N. N. Sircar. Please note down this information and send it by air mail. I am surprised to find how little I know of these family connections.

Enclosed please find an article from Mr. Fülöp-Miller for publication in the Modern Review. Please hand it over to Sj. Ramananda Chatterji at 20 Mullen Street, (near our house) where he lives or at the Modern Review office. Along with this, please hand over a photo of Prof. Heine Geldern of Vienna which is lying in the room at 1 Woodburn Park where I was sleeping. If you cannot find the photo in that room, please hand over the article ~~—~~ only to Ramananda Chatterji. If you don't find the photo, don't bother please. But if you do find the photo, please hand over the article + photo together to Ramananda Babu. Please do this as soon as

Poste Restante,
Badgastein, 7.12.37

My dear Asoke,

I have to bother you for a lot of things. I hope you will have time to attend to them. Please reply by air mail to as many points as possible.

1) What is our পর্যায়? Is it 27th or 28th? পর্যায় means generation — so that your generation or পর্যায় will be one more than mine. You can find out from "ma-janani."

3) Please ask Kalicharan if he can give me any more materials about our ancestry and about our ancestral villages. If so, he should hand them over to you. <u>Please send them by air mail</u>. (The materials he has already given me are very helpful)

4) Please take down notes from "Ma-janani" and Rangadadababu about our family history <u>on my mother's side</u> and send them to me <u>by air mail</u>. (e.g. my grandfather, great grandfather etc., how many children, sons-in-law etc. they had and who they were etc. etc.)

5) Please send by air-mail materials re: my father's life. They were collected at the time of the Sraddh ceremony in January, 1935.

6) If Prof. Demel is invited to put up at Woodburn Park, Gairola who is touring as his Secretary, may put up at 38/2 Elgin Road in the guest room. He can have meals together with Demel at Woodburn Park. You will have to do your best for Demel in that case and make him feel at home.

Gagan Bihari Mehta wanted to give a tea-party in his honour. He (Gagan) enquired of his address from me.

7) Please let me know the Bengali equivalent of the current English Year and date.

8) Was the Coronation of King George V as Emperor of India held in 1911 or 1912 at Delhi?

9) Please let me know the exact date of the next Congress at Haripura. They appeared in the papers of the 16th November or thereabouts. The B.P.C.C. office should know.

10) Can you send me a decent photograph of my father and mother for reproduction in the book — also a decent group photo of the family and a separate photo of Mejdada? These may be sent by ordinary post — but as early as possible.

11) You may remember that I asked you to get 3 issues of Modern Review in which my articles appeared. They are to be sent by registered post to Mr. Basil Mathews (author of the book — "India Reveals Herself") You may send the parcel to him c/o the publishers.

I think I have given you enough work for the present — so I shall now stop.

With love

Yours v. affly

Subhas

আলোচনা, এমনকি দস্তুরমতো পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে তবে নাকি তিনি বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন।

জানকীনাথের জন্ম হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কোদালিয়া গ্রামে। যখন তাঁর বয়স প্রায় ১৬ তখন তাঁর মায়েব মৃত্যু হয়। কলকাতার এলবার্ট স্কুল থেকে তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করেন। তারপর সেণ্ট জেভিয়ার্স ও জেনারাল অ্যাসেমব্লি (বর্তমানে স্কটিশচার্চ কলেজ) কলেজে কিছুকাল পড়ার পর তিনি চলে যান দাদা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কটকে। কটকের র‍্যাভেনস কলেজ থেকে তিনি এফ. এ. (ইণ্টারমিডিয়েট) ও বি. এ. পাশ করেন স্কলারশিপ সহ। জানকীনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষা এক বছরের বড় ও স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা তিন বছরের বড ছিলেন—সুতরাং তাঁকে তাঁদের সমসাময়িক বলা যায়। আক্ষরিক অর্থেই তাই সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের পরবর্তী পুরুষ ও উত্তরসূরী বলা চলে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন জানকীনাথের সহপাঠী—আমরা পরে দেখব সুভাষেব সঙ্গেও আচার্য রায়ের ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা স্থাপিত হয়েছিল। জানকীনাথ কটক থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে কলকাতায় আসেন আইন পরীক্ষা দেবার জন্য। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন ও ব্রাহ্মসমাজেব নেতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে এই সময়ে তাঁব পরিচয় হয়েছিল। কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁকে এ্যালবার্ট কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ দেন—কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের বেশি তা স্থায়ী হয়নি। তারপর চব্বিশ পরগণা জেলাব জয়নগর গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে নয় মাস প্রধান শিক্ষকের কাজও তিনি করেছিলেন। এই সময় তাঁকে তীব্র আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

জানকীনাথ বিশ বছর বয়সে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রভাবতী দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতার মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে তিনি বি. এল. ডিগ্রী পান। তারপর তিনি চলে যান কটকে

আইন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে। কটকের সেসময়ের প্রতিষ্ঠাবান আইন ব্যবসায়ী ও সরকারের উকিল রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু তাঁকে আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভে সাহায্য করেছিলেন। আগেই বলেছি হরিবল্লভ ছিলেন তাঁর পিসেশ্বশুর।

জানকীনাথ জীবনে যেসকল ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন, যে পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন এবং যে বংশে তাঁর জন্ম—এই সমস্তই তাঁর মানসগঠনে সাহায্য করেছিল। যে মানসবৈশিষ্ট্যের তিনি অধিকারী ছিলেন এবং যা দায়স্বরূপ সুভাষচন্দ্রকে তিনি অর্পণ করে যান এই প্রসঙ্গে তার কিছু সন্ধান নেওয়া উচিত।

তাঁর বংশের কথা পূর্বেই বলেছি, তাঁর জন্মভূমিও তাঁর বংশের মতোই উজ্জ্বল ছিল। কোদালিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম—মাহীনগর, কোদালিয়া, চাংড়িপোতা, রাজপুর, হরিনাভি, লাঙ্গলবেড়ে প্রভৃতি পরস্পরসম্বদ্ধ গ্রামগুলি একটি উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সাধনার পাদপীঠ। এই গ্রামগুলির পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল ভরাগঙ্গা।—কবিরাম তাঁর 'রায়মঙ্গল' গ্রন্থে তাই লিখেছেন:

সাধুঘাটা পাছে করি সূর্য্যপুর বাহে তরি
চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালাক্ষী দেবী পূজি
বাহে তরি সাধু গুণরাশি॥
মালঞ্চ রহিল দূর বাহিয়া কল্যাণপুর
কল্যাণ-মাধব প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম কি কাজ করিয়া নাম
বড়দহ ঘাটে উত্তরিল॥

গঙ্গার বুকে পলি জমে স্রোত বন্ধ হয়ে গেলে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন এই সমৃদ্ধ অঞ্চলটি অস্বাস্থ্যকর, জ্বর ও ম্যালেরিয়ার আবাস ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। পূর্বে নদীয়া, গৌড় প্রভৃতি বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রের

সঙ্গে নদীপথে এই অঞ্চলের যে সরাসরি যোগ ছিল তা আর রই না এবং ইংরেজ আগমনের পূর্বে রেলগাড়ি না থাকায় স্বাভাবিক কোনো যোগাযোগই আর প্রতিষ্ঠিত হল না। প্রতিষ্ঠাবান লোকেরা তখন এই স্থান ত্যাগ করে বাংলার অন্যান্য সমৃদ্ধ অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু গুরু পুরোহিত ও স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ শাসন ও ব্রহ্মত্র ত্যাগ করে অন্য স্থানে যাওয়া উচিত মনে করেননি—তারই ফলে কোদালিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত বংশধরগণের স্মৃতি আজও অটুট আছে। বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই অঞ্চলে জন্মেছিলেন এবং সেকারণে দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজে কোদালিয়া কাশীর সমতুল বলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এই মর্মে একটি শ্লোকও প্রচলিত হয়েছে :

কোদালিয়া পুরী কাশী গোঘাটা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো রামনারায়ণঃ স্বয়ং ॥

রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত একই বিদ্যাবাচস্পতির বংশে জন্মেছিলেন। এখানকার সকল পণ্ডিত ও মনীষীদের নামোল্লেখ এখানে অনাবশ্যক, তবে একথা বলা যায় যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পাণ্ডিত্য ও মনীষার ধারা এই অঞ্চলে অব্যাহত ভাবে বহমান ছিল এবং জানকীনাথ এই ঐতিহ্য-সম্পন্ন অঞ্চলের পরিবেশে মানুষ হওয়ায় তাঁর মানসিক গঠনে বঙ্গীয় সংস্কৃতির একটা ধারাবাহিকতা স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান ছিল। আধুনিক যুগে এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সুধী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। তিনি কোদালিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু আইন সংকলনে ইংরেজ সরকারকে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একত্রে তিনি ব্রাহ্মধর্ম-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য কাশী পাঠিয়েছিলেন। চার বছর পর মূল বেদ ও উপনিষদ গ্রন্থগুলির

পুথি সংগ্রহ করে ও বেদবিদ্যা অনুশীলন করে ফিরে এসে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 'বৃহৎকথা' নামে একখানি অনুবাদগ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন, রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী রাজনারায়ণ বসুর সহযোগে সম্পাদনা করেছিলেন, বেদান্তসার, মহানির্বাণতন্ত্র, ভগবদ্গীতা, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থও সম্পাদনা ও অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (জন্ম ১৮২৬, মৃত্যু ১৮৮৬) উনিশ শতকের নবজাগৃতির একজন পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জন্ম চাংড়িপোতায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ'। বিনয় ঘোষ লিখেছেন ঃ "সমস্ত সাময়িকপত্রের মধ্যে 'সোমপ্রকাশ' নিঃসন্দেহে সর্বপ্রধান, অন্তত উনিশ শতকেব ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে তার নিকট-প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন পত্রিকা ছিল বলে মনে হয়না।...অর্থনীতি সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি নানাবিধ বিষয় নিয়ে সোমপ্রকাশ যে আলোচনা কবেছেন, তার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী উদাব মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এরকম মন ও দৃষ্টিভঙ্গী সোমপ্রকাশের সমকালীন পত্রিকার ক্ষেত্রে খুবই দুর্লভ ছিল বলা চলে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগবেব মতো মুক্তচিত্ত উদারহৃদয় যুগপুরুষ যে সোমপ্রকাশ পত্রিকার আদি-পরিকল্পক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, সোমপ্রকাশের পরিচালক ও সম্পাদকরা তার মর্যাদা অনেকটা বজায় রেখেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর সার্থক মুখপত্র হয়ে উঠেছিল সোমপ্রকাশ।" (বিনয় ঘোষ ঃ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র। চতুর্থ খণ্ড) ১৮৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর 'সোমপ্রকাশ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বারকানাথ এই পত্রিকার মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে যথার্থই দেশের সেবা করে গেছেন।

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসে অন্যতম নেতার আসন দখল করে আছেন শিবনাথ শাস্ত্রী, তাঁরও জন্ম চাংড়িপোতা

গ্রামে। কোদালিয়া ও চাংড়িপোতা পাশাপাশি গ্রাম। শিবনাথ ছিলেন শিক্ষক, সাহিত্যব্রতী, সমাজ-সংস্কারক ও ধর্মান্দোলনের নেতা। কেশব সেনের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের দিনে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন—পরবর্তী কালে আদর্শের প্রেরণায় কেশবচন্দ্রের বিরোধিতা করে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ভারতের স্বায়ত্তশাসনলাভের আন্দোলনের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন গড়তেও ব্রতী হয়েছিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে একত্রে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত-সভা প্রতিষ্ঠা করেন। বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন যুবককে নিয়ে তিনি একটি কর্মীদল গঠন করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিপিন পাল লিখেছেন ঃ

"স্বদেশপ্রীতিই এই দল গঠনের মূল প্রেরণা ছিল। এই স্বদেশপ্রীতির ভিতর দিয়াই শিবনাথবাবুর সে সময়ের ধর্মভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, পারিবারিক স্বাধীনতা—জীবনের সববিভাগে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদিধর্মের অনধীনতার আদর্শটিকে ফুটাইয়া তোলাই শিবনাথবাবুর এই কর্মীদল গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল।" এই দলের কর্মীদের যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করতে হত তাতে সর্তের মধ্যে ছিল ঃ

১। প্রতিমা-পূজা করিব না।

২। বাক্যে ও কার্যে জাতিভেদ মানিব না।

৩। পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিব।

৪। নিজেরা একুশ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না; এবং কোন বালিকাকে তাহার ষোড়শ বৎসরের পূর্বে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না।

৫। যথাসাধ্য স্ত্রীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিব।

৬। নিজেদের এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্য শক্তি ও শৌর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম চর্চার প্রচার করিব এবং নিজেরা অশ্বারোহণ ও বন্দুক চালনা অভ্যাস করিব এবং দেশমধ্যে যাহাতে এ সকল বিদ্যার বহুল প্রচার হয় তাহার চেষ্টা করিব।

৭। একমাত্র স্বায়ত্ত-শাসনকেই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করি, তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া এখন যে বিদেশীয় রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার আইন-কানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য দুর্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার করিব না।" (বিপিন পাল: সত্তর বছর)

শিবনাথ নিজে এই প্রতিজ্ঞাপত্রটি রচনা করেছিলেন ও নিজেই অগ্নিসাক্ষী করে এতে সই দিয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, দেশহিতৈষী ও স্বাধীনতাকামী রূপটি এই প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। তিনি বহু গ্রন্থ,—কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী ও আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসও তিনি রচনা করেছিলেন। দ্বারকানাথের পর 'সোমপ্রকাশ' ও অন্যান্য পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর জীবৎকাল ১৮৪৭—১৯১৯ খৃষ্টাব্দ।

বাংলা দেশের বিশ শতকের রাজনীতিতে এই অঞ্চলের তিন জন নেতার অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্রনাথ রায়। পরে যথাস্থানে এঁদের কথা আমরা আলোচনা করব। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন এমন যেসব ব্যক্তির এখানে জন্ম তাঁদের মধ্যে হিন্দু আইনের পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, চিত্রশিল্পী কালীকুমার চক্রবর্তী, সঙ্গীতজ্ঞ অঘোর চক্রবর্তী ও কালীপ্রসন্ন বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা উচিত। জানকীনাথ বসু এই সব মানুষের ঐতিহ্যকে বহন করেছিলেন—একজন আদর্শবান, চরিত্রবান, সংবেদনশীল শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে

সেটাই ছিল স্বাভাবিক। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন ও তাঁর দ্বারা তিনি প্রভূতভাবে প্রভাবিতও হয়েছিলেন। আদর্শের প্রেরণায় ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার বশে এক সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেবার কথাও গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলন অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল ও পূর্বের উগ্রতা পরিহার করে হিন্দুত্বের দিকে এগিয়ে এসেছিল— জানকীনাথ সম্ভবত সেইজন্য ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেবার আর প্রয়োজন অনুভব করেননি। তবু ব্রাহ্মসমাজ যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতিভূ ছিল তিনি তার অংশীদার ছিলেন। আদর্শ ও নৈতিক চরিত্রের উচ্চ মানে তিনি ব্রাহ্মদের মতোই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিল নির্মল, অকলঙ্ক ও ঋজু।

জানকীনাথের ওপর অপর এক সূত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবও এসে পড়েছিল। তিনি যখন কলকাতায় একজন নবযুবক ও আইনের ছাত্র, রামকৃষ্ণের খ্যাতি তখনই কেশব সেনের প্রচারের ফলে কলকাতার সমাজে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। কেশব সেন ও অপরাপর ব্রাহ্ম নেতারা যে সাধকের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন, জানকীনাথের হৃদয়ের শ্রদ্ধাও তাঁর প্রতি ধাবিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তবু তিনি রামকৃষ্ণকে দেখতে গেছেন এমন কোনো তথ্য পাইনা—যাননি বলেই মনে হয়। কিন্তু কটকে তাঁর পিসাশ্বশুর হরিবল্লভ বসু ছিলেন একজন রামকৃষ্ণভক্ত। হরিবল্লভ জানকীনাথকে যেমন সাহায্য করেছিলেন তেমনি স্নেহও করেছিলেন। শ্রীম-রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" গ্রন্থের ৪র্থ ভাগে হরিবল্লভ ও রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের এই বিবরণ আছে:

"ত্রিংশখণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ। শ্যামপুকুর বাটিতে হরিবল্লভ, নরেন্দ্র, মিশ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। [শ্রীযুক্ত বলরামের জন্য চিন্তা— শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু] শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটিতে ভক্তসঙ্গে চিকিৎসার্থ বাস করিতেছেন। আজ শনিবার। আশ্বিন, কৃষ্ণা

অষ্টমী তিথি ; ১৬ই কার্তিক। বেলা নয়টা। ৩১ শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃঃ।

এখানে ভক্তেরা দিবারাত্রি থাকেন—ঠাকুরের সেবার্থ! এখনও কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাই।

শ্রীবলরাম সপরিবারে ঠাকুরের সেবক। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন, সে অতি ভক্ত বংশ। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, বৃন্দাবনে একাকী বাস করেন—তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের কুঞ্জে। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু ও বাটীর অন্যান্য সকলেই বৈষ্ণব।

হরিবল্লভ কটকের প্রধান উকিল। পরমহংসদেবের কাছে বলরাম যাতায়াত করেন—বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া যান—শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। দেখা হইলে, বলরাম বলিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে একবার দর্শন কর—তারপর যা হয় বোলো!

আজ হরিবল্লভ আসিয়াছেন, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি করে ভাল হবে!—আপনি দেখছো শক্ত ব্যামো!

হরিবল্লভ—আজ্ঞা ডাক্তারেরা বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মেয়েরা পায়ের ধূলা লয়। তা ভাবি একরূপে তিনিই (ঈশ্বর) ভিতরে আছেন—হিসাব আনি।

হরিবল্লভ—আপনি সাধু। আপনাকে সকলে প্রণাম করবে, তাতে দোষ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, কপিল, এরা কেউ এলে হোতো। আমি কি! "আপনি আবার আসবেন।"

হরি—আজ্ঞা, আমাদের টানেই আসবো—আপনি বলছেন কেন। হরিবল্লভ বিদায় লইবেন—প্রণাম করিতেছেন। পায়ের

ধূলা লইতে যাইতেছেন—ঠাকুর পা সরাইয়া লইতেছেন। কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়িলেন না—জোর করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন।

হরিবল্লভ গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুর যেন তাঁহাকে খাতির করিবার জন্য দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন—'বলরাম অনেক দুঃখ করে। আমি মনে কল্লাম, একদিন যাই—গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি। তা আবার ভয় হয়! পাছে তোমরা বল, একে কে আনলে!'

হরি—ও সব কথা কে বলেছে। আপনি কিছু ভাববেন না। হরিবল্লভ চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—ভক্তি আছে—তা না হলে জোর করে পায়ের ধূলা নিলে কেন?

"সেই যে তোমায় বলেছিলাম 'ভাবে দেখলাম ডাক্তার ও আর এক জনকে,— এও সেই আর একজন! তাই দেখ, এসেছে।

মাষ্টার—আজ্ঞে, ভক্তিরই ঘর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি সরল।"

হরিবল্লভ রামকৃষ্ণের নিকট দ্বিতীয়বার আসেন কয়েকদিন পর, ৬ই নভেম্বর তারিখে—সেও শ্যামপুকুর বাটিতে। শ্রীম লিখেছেন: "হরিবল্লভ আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, তোমায় দেখলে আনন্দ হয়। হরিবল্লভ অতি বিনীত। মাদুরের নীচে মাটির উপর বসিয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন। হরিবল্লভ কটকের বড় উকীল।··· হরিবল্লভ আসিলেন। আসিবার সময় বলিলেন, আমি আবার আসবো।" (কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, ২২ খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

এই দুটি দৃশ্যে আমরা কটকের সরকারী উকিল ও প্রতিষ্ঠাবান আইন ব্যবসায়ী হরিবল্লভ বসুর যে পরিচয় পাই তাতে বোঝা যায় যে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর একটা সংঘাত ছিল—পরে সেই সংঘাত বিনম্র ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে হরিবল্লভ

ও বলরামের বাড়িতে রামকৃষ্ণ বহুবার এসেছেন ও কলকাতায় এটাই ছিল তাঁর প্রধান লীলাস্থান।

জানকীনাথ বসু হরিবল্লভের নিকট থেকে কী পরামর্শ পেয়েছিলেন জানিনা, তবে তাঁর জীবনে ধর্মভাব অনেকখানি স্থান জুড়েছিল। তিনি ব্রাহ্মধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মের দিকে ফিরে এসেছিলেন। সাধন-ভজনের আগ্রহে তিনি দুই বার গুরুবরণ করেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন: "জানকীনাথ চিরকাল ধার্মিক চিত্ত ছিলেন। বহুকাল যাবৎ তিনি কটকের Theosophical Lodge-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারের ৺পণ্ডিত শ্যামনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট তিনি সস্ত্রীক প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথম গুরুর স্বর্গপ্রাপ্তির কয়েক বৎসর পর তিনি পুনরায় সস্ত্রীক হিমাইতপুরের ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'সৎ সঙ্গে' যোগদান করেন এবং সেইখানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি আরও বলবতী হইয়াছিল। তাঁহার কর্মবহুল ও সংগ্রামরত জীবনে ধর্মের প্রেরণাই ছিল তাঁহার সবচেয়ে বড় সহায় ও শক্তির উৎস। যৌবনে তাঁহাকে সাংসারিক অভাবের সহিত যুঝিতে হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টা ও ভগবদ বিশ্বাসের বলেই তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে যখন আত্মীয়-স্বজনের অকাল প্রয়াণে তিনি উপর্য্যুপরি আঘাত পাইয়াছিলেন তখন তাঁহার গভীর ভগবদ্ বিশ্বাসই তাঁহাকে অটল রাখিয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র ও শ্রীমান সুভাষচন্দ্র যখন সরকারী পদ পরিত্যাগ করেন তখন তিনি মোটেই বিচলিত হন নাই—বরং সারাজীবন পুত্রদের কল্যাণকর প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে যুগপৎ দুইপ্রকার বিপদ সহ্য করিতে হইয়াছিল—একদিকে জামাতা, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়ের অকাল প্রয়াণ এবং অপর দিকে তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমান শরৎচন্দ্র ও শ্রীমান সুভাষচন্দ্রের

কারাযন্ত্রণা ভোগ। কিন্তু এ সব দুঃখ শোকের মধ্যেও তিনি বীরের মত অটল ছিলেন এবং মুহূর্তের জন্যও অন্তরের ভগবদ বিশ্বাস হারান নাই।" ('জানকীনাথ বসুর জীবনচরিত' প্রবন্ধ) সুভাষ জানকীনাথের এই ভগবদ ভক্তি গভীরভাবে বালক বয়সেই অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন, পিতার মানসিকতার সঙ্গে এইখানে ছিল তাঁর মিল।

জানকীনাথ ১৯০১ সালে কটকের পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হয়েছিলেন, ১৯০৫ সালে রায়বাহাদুর হরিবল্লভের মৃত্যুর পর গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের পদও তিনি পেয়েছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি কটক মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯১২ সালে তিনি বঙ্গীয় বিধান পরিষদের (Bengal Legislative Council) সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন এবং ঐ বছরই সবকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব দেন। ১৯১৬ সালে তিনি সার্কিট কোর্টের গভর্ণমেণ্ট প্লীডার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় তিনি সরকারী উকিলের পদ ত্যাগ করেন। ১৯৩০ সালে সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি 'রায় বাহাদুর' খেতাবও ত্যাগ করেছিলেন।

জানকীনাথ ওড়িশায় তাঁব দীর্ঘ সাফল্যপূর্ণ কর্মজীবনকালে ওড়িশার মঙ্গলের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ না নিলেও স্বাধীনতা-আন্দোলনের একজন সমর্থক ছিলেন ও প্রতি বৎসর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতেন। মাঝে মাঝে সে জন্য সরকারের বিরাগভাজনও তাঁকে হতে হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলে জানকীনাথ কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে অংশ নিয়েছিলেন। খদ্দর ব্যবহারে তাঁর অনুরাগ ছিল। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনে তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল নির্ভেজাল ও অন্তঃশীলা।

তাঁর ছেলেরা কংগ্রেসের কাজে যোগ দিলে তিনি আপত্তি করেননি, সর্বান্তঃকরণে তাঁদের সমর্থন করেছেন। ওড়িশার প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়, গোপবন্ধু দাশ প্রতিষ্ঠিত 'সত্যবাদী' বিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন ও বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন।

জানকীনাথ ছিলেন সমাজসেবী ও দরিদ্রের বন্ধু। ওড়িশার নানা জনহিতকর ও সমাজসেবামূলক কাজে তিনি জড়িত ছিলেন। স্কুল ও কলেজের গরীব ছাত্ররা তাঁব কাছ থেকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিয়মিত সাহায্য পেত। গরীব প্রতিবেশিগণ ও অসহায় পরিবারেরা তাঁর নিকট সাহায্যের আশা করত এবং তাদেব সে প্রত্যাশা কখনো ব্যর্থ হয়নি। প্রতি ববিবারে তাঁর বাড়িতে কাঙ্গালী বিদায় হত। তাঁর স্বগ্রাম কোদালিয়াকেও তিনি বিস্মৃত হননি। সেখানকার গরীব ব্যক্তিবা, আত্মীয় ও প্রতিবেশিরা তাঁর নিকট থেকে বিপদ ও সঙ্কটে অর্থ সাহায্য পেত, দুর্গাপূজার সময় প্রতি বছর তিনি কোদালিয়ায় আসতেন ও সাড়ম্বরে নিজ বাড়িতে দুর্গাপূজা করতেন। আজও তাঁর বংশধররা এই পূজার ধারাটি বজায় রেখেছেন, যদিও সে সমারোহ আর নেই। সুভাষচন্দ্র বাল্যবয়স থেকে সারাজীবনে দুর্গাপূজাব সময় বহুবার কোদালিয়ায় এসেছেন এবং কোদালিয়া ও নিকটবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এই অঞ্চলের যে বর্ণোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও ঐতিহ্যের কথা আমরা আলোচনা করেছি তা শুধু জানকীনাথকে নয়, সুভাষচন্দ্রকেও প্রভাবিত করেছিল। এই সংস্কৃতির ধারাকে সুভাষ নিজ জীবনে অস্বীকার করেননি।

জানকীনাথ তাঁর গ্রামবাসীদের উপকার ও সেবার জন্য মায়ের নামে 'কামিনী দাতব্য ঔষধালয়' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পিতার

নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হরনাথ লাইব্রেরী। লাইব্রেরীটি এখনো বর্তমান আছে।

জানকীনাথের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন :

"জানকীনাথ স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন। নিজের সাধনার বলে তিনি সংসারে উন্নতি করিয়াছিলেন এবং তিনি চাইতেন যে তাঁহার পুত্রেরাও স্বাবলম্বী হউক। তিনি পুত্রদের জন্য সাধ্যমত সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কখনও তাহাদের স্বাধীনতা খর্ব করিতে চাইতেন না। তিনি বিশাল-হৃদয় ছিলেন। দীন-দুঃখীর জন্য তাঁহার প্রাণ সর্বদা কাঁদিত। তাঁহার পরলোকগমনের পূর্বেই তিনি তাঁহার পুরাতন ভৃত্যদের জন্য এবং পরিচিত বহু দীন-দুঃখীর জন্য নিয়মিত সাহায্য বা পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দানের বিষয়ে তিনি একদিকে যেরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ গোপনতা ভালবাসিতেন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন ও সত্যকে ভালবাসিতেন। তিনি অন্তরের সঙ্গে অসৎকর্ম, অসৎচিন্তা ও অসৎউপায় ঘৃণা করিতেন। তিনি অপরের নিকট প্রাপ্ত উপকার সর্বদা স্মরণ রাখিতেন ও তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকিতেন—কিন্তু অপরের কৃত অপকার বা অনিষ্ট কখনও মনে রাখিতেন না। পরের নিন্দা তাঁহার মুখে কখনও শোনা যাইত না এবং পরশ্রীকাতরতা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। এতদ্ব্যতীত তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভৃত্য পরিজন, ধনী দরিদ্র, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ—কেহ কখনও তাঁহার মুখে রূঢ় কথা শুনিতে পাইত না। তিনি পুত্ররূপে, স্বামীরূপে, পিতারূপে, বিশাল পরিবারের কর্তারূপে, মানুষরূপে—যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিরল। এবং পরিবারবর্গের প্রতি, গ্রামের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি—তিনি যেভাবে নিজ কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন—এবং সত্য ও ধর্মকে ভিত্তি করিয়া যেভাবে স্বীয় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন

তাহা বাস্তবিকই সকলের অনুকরণীয়।” (৺জানকীনাথ বসুর জীবনচরিত)

মা প্রভাবতী দেবী ছিলেন ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, গম্ভীরস্বভাবা, বিরাট পরিবারের স্বাভাবিক কর্ত্রী। তিনি ছিলেন ধীর ও বিচক্ষণা—তাঁব নির্দেশ যুক্তিযুক্ত ও সর্বগ্রাহ্য হত। তাঁর স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে শুধু আপন সন্তানদের জন্যই মমতা সঞ্চিত থাকত না—আবও যারা আশ্রয় লাভ করেছিল তাঁর সংসারে তারাও তাঁব সহানুভূতি ও স্নেহের অংশ পেত। কিন্তু তাঁর উচ্ছ্বাস বাহুল্যেব কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী, বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিব বশে তিনি বৃহৎ সংসারটিকে সুষ্ঠু ও সুন্দবভাবে পরিচালনা করতে পারতেন।

সুভাষচন্দ্রেব বংশ পবিচয়, আঞ্চলিক পরিবেশেব ঐতিহ্য ও পিতামাতার চরিত্র আলোচনা করলে তিনি উপযুক্ত গৃহে ও ঐতিহ্যময় পরিবেশে জন্মছিলেন বলে স্বীকাব কবতে হয়। তাব সঙ্গে যদি তাঁর জন্ম সময়ে দেশের মানস পটভূমি ও নবযুগেব বাঙালীর আত্মপ্রকাশেব নতুন সাধনার কথা মনে রাখি তাহলে বলতেই হয় যে তাঁর আবির্ভাব স্বয়ম্ভূ নয়, একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। তাঁর দেশ, কাল, বংশ, পরিবেশ ও পিতামাতাব যোগ্যতাই তাঁকে আহ্বান করে এনেছিল। সুভাষের আত্মপ্রকাশকে কবির ভাষায় ‘পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ’ বলে কোনোমতেই অভিহিত করা চলে না। সমস্ত প্রকৃতির ভিতব তাঁর জন্য যেন গোপন প্রস্তুতি ছিল—তাঁকে বরণ করার জন্য বাঙালীর হৃদয়ও যেন উন্মুখ ছিল। যুগপ্রয়োজনে তাঁর আবির্ভাব, তাই তাঁকে যুগপুরুষ বলাই সঙ্গত।

জানকীনাথ বসুর ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। তাঁর ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসের ডায়েরি থেকে তিনটি দিনের লিপি উদ্ধৃত করা যেতে পারে ;—তিনি লিখেছিলেন ঃ

21—Thursday—9 magh

Not much to note. Things as usual.

22—Friday—10 magh

Not much to note. Things as usual. From the afternoon Probha felt the labour pains. —Mrs. Raynard came at about 10 p m.

23—Saturday—11 magh

I rose early but found Probha was still suffering—A son was born at midday. Probha felt very ill—but thank God she somehow got through.

জননী প্রভাবতী দেবীর কোল আলো করে একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ২৩ শে জানুয়ারি মধ্যাহ্নে—দুপুর বারোটা বেজে কয়েক মিনিট পর। ডায়েরির পাতায় যে জনৈক মিসেস রেণার্ডের কথা উল্লেখ আছে তিনি ছিলেন ধাত্রী। নবজাতকের জন্মলগ্নটি ছিল প্রাকৃতিক দিক থেকে আরামপ্রদ সময়—শীতকালের দুপুর, নির্মেঘ নীল আকাশ রবিকরোজ্জ্বল : সপ্তাহ শেষের দিন ; মানুষের পারিবারিক জীবনে আসন্ন সুখভোগের একটা আমেজ লাগে এ সময়টা। দুর্যোগ কুটিল ঝঞ্ঝা নিশীথে এ নবজাতকের জন্ম নয় : একটা সুখের বার্তা মানব সংসারে পৌঁছে দেওয়াই কি হবে এর নিয়তি-নির্দিষ্ট কাজ ? কে জানে ! জানকীনাথের মনে এ শিশুকে

কেন্দ্র করে কোনো সুখ-কল্পনা দেখা দিয়েছিল কিনা ডায়েরির পাতায় তার কোনো ইঙ্গিত নেই। শুধু নির্লিপ্ত চিত্তে ঈশ্বরকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন শিশুর জন্ম ও তার জননীর ক্লেশ লাঘবের জন্য। জানকীনাথের চরিত্রের একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় ডায়েরির এই কয়েকটি লাইনের মধ্যে ধরা পড়েছে বইকি !

ভারতের এক প্রান্তে—নিভৃত শহর কটকে—একটি নতুন শিশুর জন্ম হল। সেই একই সময়ে একটি নতুন চেতনারও উন্মেষ ঘটল ভারতবর্ষে—জাগ্রত, বলদৃপ্ত, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির জাতীয়তাবাদের নব জন্ম হল। একটি মানবশিশুর জন্মের সঙ্গে একটা জাতির চেতনার জাগরণের এই যোগাযোগ আকস্মিক মনে হতে পারে,—কিন্তু ইতিহাসের কোনো গূঢ় সঙ্কেত ব্যক্তি ও জাতির জীবনের যোগাযোগের মধ্যে লক্ষ্যীভূত হয় কিনা সুভাষচন্দ্রের মতো মহৎ জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে সে প্রশ্নের একটা মীমাংসা দরকার হয়ে পড়ে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিশ্ব-অভিযান শেষে প্রথম ভারতে পদার্পণ করেছিলেন। ঐ সময়ের পূর্বে ভারতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সূচনা দেখা গিয়েছিল, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতালাভের কোনো আগ্রহ, সঙ্কল্প, এমনকি কল্পনাও দেখা দেয়নি। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক একটা নবজাগৃতি দেশে ঘটে গিয়েছিল, দেশপ্রেমও সঞ্চারিত হয়েছিল শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ;—কিন্তু 'জাতীয়তাবাদ,' শব্দটিও যেমন ছিল অনুপস্থিত, দেশের স্বাধীনতা-চিন্তাও তেমনি ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু ১৮৯৭ সালে ভারতে জাতীয়তাবাদের রণভেরী বেজে উঠেছিল প্রধানত স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠকে আশ্রয় করে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ অতিক্রান্ত হবার পর 'জাতীয়' শব্দটির প্রয়োগ আমাদের দেশে সুরু হয়—'জাতীয়তাবাদ' শব্দটির নয়। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় মেলা, জাতীয় সংবাদপত্র, জাতীয় সমিতি, জাতীয় স্কুল ইত্যাদি প্রয়াস বাংলায় জাতীয় ভাবধারার উন্মেষের



সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থান, জানকীনাথ ভবন, কটক

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে

পরিচয় বহন করে ঃ কিন্তু কোনোরকম স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সেই জাতীয়তার মধ্যে নিহিত ছিলনা। রামমোহন রায় তো বিধান দিয়েছিলেন যে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক যদি কোনোদিন ছিন্ন হয় তাহলেও এই দুটি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশ (অর্থাৎ ততদিনে ভারত সমগ্রভাবে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে যাবে বলে কি তিনি আশা করেছিলেন ?) ইংরেজি ভাষা, খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও ইয়োরোপীয় আচরণ ও আদব-কায়দা অবলম্বন করবে ; এবং এই ঐক্যের ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখতে কোনো অসুবিধা হবে না। রামমোহনের কল্পনায় ভারত স্বাধীন হবার সম্ভাবনা ধরা পড়েছিল ; কিন্তু ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই 'স্বাধীন' ভারত ইংলণ্ডের অনুসারী হয়ে থাকবে—এই প্রত্যয়ও তিনি মনে পোষণ করতেন।

অবশ্যই এই ধরণের উদারতাবাদী তথা ভারতের স্বাতন্ত্র্যে অবিশ্বাসী চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ বাংলায় ধ্বনিত হয়েছিল ;— কিন্তু সে রামমোহনের মৃত্যুর বহুকাল পরে, ১৮৭৫ সালে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বন্দেমাতরম' গান প্রথম প্রকাশ করেছিলেন, তখন। বঙ্কিমের সেই গানও বাঙালীর মনে দীর্ঘকাল কোনো সাড়া জাগায়নি, তাঁর আনন্দমঠের বিপ্লবের আহ্বানও ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। বিবেকানন্দ বঙ্কিমের ভাবনাকে দেশ যাতে গ্রহণ করতে পারে তার অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন দেশবাসীর মানসিকতায় একটা অগ্নিগর্ভ পরিবর্তন এনে দিয়ে। ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষ যখন শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন পথ নির্দেশ চেয়ে তখন স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন বঙ্কিমের বই পড়তে, বঙ্কিম দেশপ্রেমের যে মন্ত্র দিয়েছেন 'বন্দেমাতরম' গানে তার অনুশীলন করতে ও বঙ্কিমের অনুসরণে মাতৃভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে। এই হেম ঘোষ পরে বিপ্লবীদলনায়ক হয়েছিলেন—সুভাষচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে তাঁরও ইতিবৃত্ত আছে জড়ানো।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস কোন ভাবধারা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই বহু-আলোচিত প্রসঙ্গে প্রবেশের দরকার নেই। তবে একসময়ে ভারত সরকারের যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ও পরে ভূমিরাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব ছিলেন ও বড়লাট লর্ড লিটনের প্রিয়পাত্র ছিলেন সেই জাত ইংরেজ আলান অক্টেভিয়ান হিউম কেন ও কী উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা দর্পণের মতো স্বচ্ছ হওয়াই উচিত আজকের পাঠকের কাছে। কংগ্রেসের মডারেটপন্থী নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার লিখেছেন: কংগ্রেসের জনক হিউম সাহেব ভারতের পরিস্থিতি বিশেষভাবে অনুধাবন করে বুঝেছিলেন যে এদেশের জনচিত্তে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও রোষের সঞ্চার হতে বাধ্য, অতএব এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে আইনানুগ পথে সেই ক্ষোভ ও রোষ প্রবাহিত হয়, উগ্রভাবে তার আত্মপ্রকাশ না ঘটে। আবার বেশিমাত্রায় গণতান্ত্রিক দাবী দাওয়া ভারতবাসীরা যাতে না তোলে সে বিষয়েও তিনি ছিলেন হুঁশিয়ার। এই হিউম সাহেব ১৮৮৩ সালে ১লা মার্চ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে দেশপ্রেমের উপদেশ বর্ষণ করে একখানি খোলা চিঠি লিখেছিলেন, যার বক্তব্য ছিল এই যে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ব্যক্তিরাই যদি স্বার্থত্যাগ করতে না শেখে তাহলে বড়লাট লর্ড রিপন এদেশের মঙ্গলের জন্য যে প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন তা সম্পূর্ণ বিফল হবে। অম্বিকাবাবু এই চিঠিখানিকে "This passionate appeal" বলে আখ্যা দিয়েছেন! পুণায় ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের সব ব্যবস্থা শেষ করে হিউম ইংলণ্ড গিয়েছিলেন। যাবার আগে ভারতের ইংরেজবৃন্দ ও ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা যা হবার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাতেও তৃপ্ত না হয়ে বিলেত পর্যন্ত তিনি পরামর্শ সংগ্রহের জন্য গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল কংগ্রেস সমাজ-সংস্কারের দাবী জানিয়ে ক্ষান্ত থাকবে। কিন্তু লর্ড ডাফরিণ তাঁকে উপদেশ দেন যে কংগ্রেসকে রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলা দরকার কারণ সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে ডাফরিণ জানতেন যে দেশের জনমত অবাঞ্ছিত রূপ নেবার আগে সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে লাভ হবে। ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড ডাফরিণ ভারতের বড়লাট হন, তিনিই হিউমকে রাজনৈতিক সংগঠনরূপে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করতে বলেন এবং তিনি এ আদেশও করেন যে তিনি যে অন্তরাল থেকে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছেন তা যেন বাইরে কোনোমতেই প্রকাশ না পায়। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন যে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ভারতের অন্যান্য অংশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ডাফরিণের নাম [illegible] নিয়ে তাঁর প্রস্তাবটি পেশ করা হলে সবাই তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন।

বাংলার রাজনৈতিক চেতনাও যে সে সময় খুব বেশি অগ্রসর ছিল তা মনে করার কারণ দেখিনা। ১৮৮৫ সালেই, ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও ন্যাশনাল লীগ এই তিনটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে। বাংলার সমস্ত জেলা, এমনকি বহু মহকুমা থেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধি এসেছিলেন। বোম্বাই থেকে প্রতিনিধিরূপে এসেছিলেন রাও সাহেব বিশ্বনাথ মাণ্ডলিক, বিহার থেকে এসেছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা,—আসাম, এলাহাবাদ, বারাণসী ও মীরাট থেকেও প্রতিনিধি এসেছিলেন। কলকাতার সম্ভ্রান্ত সব কয়টি পরিবার—ভূকৈলাসের ঘোষালেরা, পাইকপাড়ার সিংহেরা, উত্তরপাড়ার মুখার্জিরা, ঠাকুর, মল্লিক ও লাহা পরিবার গোষ্ঠী এবং কলকাতার মাড়োয়ারিরাও ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বাংলার সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন নেতারাও—স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি, কালীমোহন দাস, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, প্যারীমোহন মুখার্জি,

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, কালীচরণ ব্যানার্জি, ডঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র প্রভৃতি। সম্মেলনে মোট ছয়টি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়েছিল—বিধান পরিষদের পুনর্গঠন, অস্ত্র আইনের সংশোধন, সরকারী ব্যয় হ্রাস, সিভিল সার্ভিস, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ ও পুলিশের পুনর্গঠন। এই সম্মেলনের প্রস্তাব ও কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি একই রকম ছিল এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে এই সম্মেলন থেকেই প্রথম স্বাগত জানানো হয়েছিল। এবং বিপিন পাল, যিনি বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ছিলেন একজন পুরোধা নায়ক, তিনি লিখেছেন: লর্ড রিপন যে শাসন-সংস্কার করেছিলেন তারই অনুসরণ করে, বিধান পরিষদকে পুনর্গঠিত করে, সরকারী চাকরীতে এদেশের লোকদের অধিক সংখ্যায় প্রবেশ ঘটিয়ে, সৈন্যদলে ভারতীয়দের ভর্তি করার অনুমতি আদায় করে আমরা ক্রমে ক্রমে যোগ্য হয়ে উঠব এবং ইংরেজ নিজ হাতে আমাদের স্ব-শাসনের অধিকার দান করবে বলে আমরা বিশ্বাস করতাম। বালগঙ্গাধর তিলকও এই একই মত পোষণ করতেন—১৮৮৯, ৯১, ৯৩ ও ৯৫ সালে তিনি ঐ সুরেই কংগ্রেস অধিবেশনে বক্তৃতা করেছেন। লালা লাজপৎ রায়—লাল-বাল-পালের অন্যতম—১৮৮৮, ৮৯ ও ৯৩ সালে অনুরূপ বক্তব্য কংগ্রেস অধিবেশনে পেশ করেছিলেন; ১৮৯৪ সাল থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি আর কংগ্রেসের কোনো কাজে যোগই দেননি।

১৮৯৭ সালের আগে আমাদের জাতীয়তাবাদের রূপ কেমন ছিল তা এতক্ষণে পরিষ্কার হবার কথা। অথচ এই অস্পষ্ট, দুর্বল, নির্বীর্য্য জাতীয়তাবাদ—যার সাংগঠনিক রূপ দানে হাত ছিল লর্ড ডাফরিন, লর্ড রিপন, মিঃ জন ব্রাইট এম, পি, মিঃ আর, টি, রীড এম, পি, লর্ড ডালহৌসি, মিঃ ব্যাক্সটার এম, পি, মিঃ স্ল্যাগ এম, পি প্রভৃতির (হিউম ইংলণ্ডে এই এম, পিদের সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের আগেই ফিরে এসেছিলেন);—এদেশের

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা একেও সহ্য করতে পারেনি ও প্রথমাবধি একে সংশয়ের চোখে দেখেছে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি-রূপে লর্ড রীডের নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল—ডাফরিণ তাতে বাধা দেন। মাদ্রাজে গভর্ণর লর্ড কনেমারা কংগ্রেস নেতাদের আপ্যায়ন করেছিলেন ১৮৮৭ সালে। কিন্তু ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনের সময় থেকেই ইঙ্গ-ভারতীয়দের বিরোধিতা প্রকাশ পেতে থাকে। এলাহাবাদে অধিবেশন বসাবার মতো জায়গাই যাতে কংগ্রেস না পায় সরকারী পক্ষ হতে সে ব্যবস্থা হয়েছিল—অবশেষে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এই উদ্দেশ্যে একখণ্ড জমি কিনে তবে অধিবেশন বসার উপায় করে দেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানও এই সময়ে প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা সুরু করেন। ১৮৯০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনের প্রাক্কালে একটি সরকারী নির্দেশ প্রচারিত হয় এই মর্মে যে কোনো সরকারী কর্মচারী এমনকি দর্শকরূপেও ঐ অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারবে না (under orders of Government of India the presence of Government officials even as visitors at such meetings is not advisable and that their taking part in the proceedings of any such meetings is absolutely prohibited)। বড়লাটকে যে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল তিনি তা ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। কংগ্রেসের পরিচালনায় বিশেষভাবে আইনজীবীরা জড়িত থাকায় ১৮৭৯ সালের আইনজীবীদের আইনটিও সংশোধন করে তাঁদের বিপদে ফেলার চেষ্টা সরকার করেছিলেন।

আর এক দিক থেকেও ইংরেজপক্ষ কংগ্রেসের ওপর গোড়া থেকেই আঘাত হানতে সুরু করে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র একজন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন—রহিমতুল্লা সয়ানি। দ্বিতীয় অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ৩৩, তৃতীয় অধিবেশনে ৮১, চতুর্থ অধিবেশনে ২২১। পঞ্চম

অধিবেশনে দুজন মুসলমান প্রতিনিধি সভা মধ্যেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা সুরু করেন, কংগ্রেস হিন্দু স্বার্থরক্ষাকারী এই অভিযোগ তুলে। এবং এর পর থেকে বদরুদ্দীন তায়েবজী, কোমারুদ্দীন তায়েবজী, রহিমতুল্লা সয়ানী, আব্দুল রসুল প্রভৃতি মুসলমান নেতারা ব্যক্তি হিসাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসে আর যোগ দেননি ও তাঁরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করতে থাকেন। আলিগড়কে কেন্দ্র করে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ভারতের মুসলমানগণ পৃথকভাবে ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে সামনে রেখে চলতে সুরু করেন—ভারতের জাতীয় আন্দোলন থেকে তাঁরা তখন হতেই সরে দাঁড়ান। কংগ্রেসের কর্মী ও নেতা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু —উত্তরকালে এটাও মুসলমানদের একটা বড় অভিযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের জন্মগ্রহণের সময় এই ছিল ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি। অস্ফুট, নিরবয়ব, দুর্বল জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ভারত সরকারের কৌশলে একটা সাংগঠনিক রূপ পাবার সম্ভাবনা-দ্বারে উপনীত হল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শত্রুপক্ষরাও আঁতাতবদ্ধ ও সক্রিয় হয়ে গেল। ইংরেজের বিভেদবুদ্ধি সেজন্য অনেকাংশে দায়ী, কিন্তু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ও বিদ্বেষের ভূমিকাকেও ছোট করে দেখা চলে না। ভারতের জাতীয়তাবাদের শরিক হতে প্রথমাবধি তারা অস্বীকার করেছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি তখন মুক্ত, অবিচল, ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাদর্শী। ভারত সম্পর্কে তাঁর সমস্ত ভাবনা একটা স্থির ও নির্দিষ্ট রূপ পেয়ে গিয়েছিল। আর কোনো দেশপ্রেমিক তাঁর মতো ভারতবর্ষের পরিচয় নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেনি, সর্বস্বার্থবন্ধনমুক্ত হয়ে ভারতের ধ্যান করেনি। ১৮৮৭ সালে চব্বিশ বছরের যুবক বিবেকানন্দ একাকী যখন ভারত পরিভ্রমণ করছিলেন সেই সময় একদিন

হাতরাসে শরৎচন্দ্র গুপ্তকে তিনি বলেন: "আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্রত আছে। অথচ আমার ক্ষমতা এত অল্প যে, আমি ভেবেই আকুল—কি করে এটা উদযাপিত হবে। এ ব্রত পরিপূর্ণ করবার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি—আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা।" এর এক বছর আগে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে কী কর্তব্যসাধনের উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন আজও পর্যন্ত সেকথা গুপ্তই আছে, কিন্তু বিবেকানন্দ যে সেই কর্তব্য সাধনের উপায় অন্বেষণ করে বেড়িয়েছেন দীর্ঘদিন এবং সেজন্য নিজেকে যোগ্যও করে তুলেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গুরুর মৃত্যুর পর থেকে তিনি ভারতের পরিচয় লাভের জন্য অক্লান্তভাবে ভ্রমণ সুরু করেন,—এই ভ্রমণের ধারা জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি বজায় রেখেছিলেন। এমনি ভ্রমণের পথে ১৮৯১ সালে আলোয়ারে এসে তিনি যুবকদের একদিন বলেছিলেন: "কারো ছেলে হারিয়ে গেলে সে যেমন তাকে না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারে না, তেমনি যতক্ষণ ভারতের গৌরবময় অতীতকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত না করতে পারছ ততক্ষণ তোমরা থেমো না। তাই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা এবং এ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত জাতীয়ভাবোধ জেগে উঠবে।"

১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী কন্যাকুমারী গিয়েছিলেন। ভারত সম্পর্কে তাঁর কর্তব্যপথ তিনি হৃদয়ের মধ্যে প্রতিফলিত দেখেছিলেন, এই কন্যাকুমারীতে এসেই সে পথ সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত হয়ে গেল। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন: "কন্যাকুমারীর মন্দির ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত; তাহার পরই তিন দিকে উত্তাল সমুদ্র…মন্দিরে মা কুমারী শিবের চিন্তায় নিমগ্না—অতি সুন্দর সে মূর্তি, দর্শনমাত্র হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। স্বামীজী মাতৃদর্শনার্থ বালকবৎ ব্যাকুলচিত্তে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন এবং দেবী কুমারীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। দর্শন ও পূজা শেষ

হইয়া গেলে তিনি সেখানে বসিয়া মাতৃভূমির কল্যাণচিন্তা করিলেন। অতঃপর সমুদ্র-তীরে গেলেন ও অন্য উপায় না দেখিয়া সন্তরণপূর্বক কিঞ্চিৎ দূরে সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দ্বীপের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিলেন। সেখানে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন এবং এইভাবেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাঁহার চিন্তার বস্তু ছিল বহুধর্মের জন্মস্থান ও মিলনক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ—ভারতের গৌরবময় অধ্যাত্ম মহিমোজ্জ্বল অতীত, দুঃখদারিদ্র্যনিমগ্ন, হতবীর্য, হতগৌরব, হতাধ্যাত্মসম্পদ বর্তমান এবং তিমিরাচ্ছন্ন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ভারতের এই লুপ্ত গৌরব কি পুনর্বার সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে কি সে উপায়? পূর্ব হইতে পশ্চিম এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি তিনি পর্যটন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ঋষির সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া আবিষ্কার করিয়াছেন, গৌরবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় ভারত কেমন করিয়া অবনতির নিম্নতম স্তরে নামিয়া আসিল। অতীতের সেই বিশ্লেষণপূর্ণ স্মৃতির সঙ্গে সমুদিত হইল বর্তমান ভারতের প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তব রূপ; আর মন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল ভবিষ্যতের পথ। সেই নির্জন দ্বীপে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর হৃদয়ে জাগরূক রহিল একটি মাত্র চিন্তা—ভারত ও ভারতের ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রায়। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ হেন পরিস্থিতিতে কিরূপ ব্রত তাঁহার পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে এবং সে ব্রত কেমন করিয়া উদযাপিত হইবে। সে চিন্তা পরার্থে উৎসর্গিতপ্রাণ সন্ন্যাসীকে এক আমূল-সংস্কারক, সুমহান সংগঠক ও ও শক্তিমান আত্মানুভবসম্পন্ন দেশনায়কে রূপান্তরিত করিল। তিনি তখন বঙ্গদেশ আর্যাবর্ত অথবা দাক্ষিণাত্যের কথা না ভাবিয়া অখণ্ড ভারতেরই ভাবনায় মগ্ন রহিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভারতের ইতিহাসের সব পৃষ্ঠাই যেন সমকালে খুলিয়া গেল, আর অন্তরে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক আলোকসম্পাতে উহা পাঠ করিতে গিয়া তিনি পাইলেন ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার একখানি পূর্ণ ও

অত্যুজ্জ্বল চিত্র। সুদক্ষ তক্ষকের সম্মুখে যেমন কোন সুপরিকল্পিত বিরাট প্রাসাদের চিত্র স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ এক সুবিন্যস্ত অখণ্ডাকারে ভাসিয়া উঠে, স্বামীজীও তেমনি ভাবী ভারতকে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব লইয়া বিরাজিত অখণ্ড সত্তারূপেই দর্শন করিলেন। ....গভীর বিষাদ ও সমবেদনা লইয়া তাঁহার চিত্ত ভারতের সর্বসাধারণের উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের কথাই ভাবিতে লাগিল—জনগণের অভ্যুদয়ের ব্যবস্থা যে ধর্মে স্থান পায় না, সে ধর্মে প্রয়োজন কি? ইতিহাস বলিয়া দেয়, ভাগ্যপরিবর্তনের ফলে ভারতে যখন যে কোন রাজশক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে উহাই তখন দরিদ্রদিগকে পদদলিত ও নিষ্পেষিত করিয়াছে সাত শত বর্ষ ধরিয়া।

দরিদ্র জনগণের দুঃখদারিদ্র্যের সহিত সমসুরে বাঁধা তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী তাহাদেরই ক্রন্দনে কাঁদিয়া উঠিল। এক সুগভীর মনোবেদনা লইয়া তিনি ভারতের অবহেলিত নিম্ন-জাতির সহিত এক হইয়া গেলেন। তাহাদের ব্যথা এখন তাঁহারই ব্যথা, তাহাদের অপমানে তাঁহারই অপমান, তাহাদের ভাগ্যের সহিত তাঁহারও ভাগ্য অবিচ্ছেদ্য-সূত্রে গ্রথিত। যাঁহারা আপনাদিগকে ধর্মের সংরক্ষক ভাবিয়া গর্বানুভব করেন তাঁহারাই আবার যুগযুগান্ত ধরিয়া অসংখ্য জনরাশিকে পদানত রাখিতে চাহেন, একথা ভাবিতে তিনি মর্মাহত হইলেন।...সেদিন তাঁহার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল—তিনি সাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় যাইবেন ..এবং সাফল্যমণ্ডিত হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে ব্রতী হইবেন।" (স্বামী গম্ভীরানন্দ: যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৮-৯৩)

সুভাষচন্দ্রের জন্মলগ্নেই স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং একদা সমুদ্রমধ্যে শিলাপৃষ্ঠে গভীর ধ্যান-শেষে যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন তার রূপ দিতে অগ্রসরও হয়েছিলেন। ভারতের

নবীন জাতীয়তাবাদের জন্ম ঘটেছিল তারই ফলে। এই নবীন জাতীয়তাবাদের স্বরূপ কী?

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতে নবীন জাতীয়তাবাদের মৌল প্রত্যয়গুলি ছিল এই যে ভারত এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য; ভারত শুধু একটি স্থূল ভূমিখণ্ড বা দেশ নয়, ভারত হল মহামায়ার বিরাট কায়া, অর্থাৎ ভারত মহাদেবী, মহাজননী; ভারতের উত্থান হবে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে নয়, তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব সংস্কৃতির অনুসরণে; ভারতের ধর্ম ও দর্শনই তার সর্ব কর্মের মূল ভিত্তিরূপে থাকবে; পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যাও ভারতের প্রয়োজন; নরমপন্থা, অর্থাৎ আবেদন-নিবেদন বা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়, অথচ স্বাধীনতা লাভই লক্ষ্য; দেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি বিধান করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষিতও করে তুলতে হবে, বস্তুত তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি হবে।

সমুদ্রশিলাখণ্ডে স্বামীজীর ধ্যানকালের যে চিন্তা ও উপলব্ধির বিবরণ উপরে উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যেই এই প্রত্যয়গুলি উদ্ভাসিত হয়েছিল দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য তাঁর অপার বেদনা ও চিন্তার দিকটি বিশেষ-ভাবে স্মরণযোগ্য। সুভাষচন্দ্রের জন্ম ও জীবনের তাৎপর্য ভারতের জন্য বিবেকানন্দের যে অশ্রুপাত ও হৃদিরক্তমোক্ষণ তারই মধ্যে নিহিত আছে। স্বামীজীর শৈব চেতনা যে পুনরায় সুভাষের আধারে রূপ পরিগ্রহ করেছিল,—সুভাষ যে স্বামীজীরই ধ্যানের বাস্তব মূর্তি—এই কথাটি বিশেষভাবে না বুঝলে আধুনিক ভারত-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি ও বিকাশতত্ত্বকে বোঝা সম্ভব নয়। সুভাষের জন্ম একটি মানবশিশুর জন্ম বটে, কিন্তু তার মধ্যে আরও একটা গূঢ় রহস্য ছিল। সেই রহস্য ভারতেরও নবজন্ম রহস্যের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত—আর বিবেকানন্দের জীবন ও চিন্তার

প্রভাবে চেতনার যে নতুন বিকাশ ভারতে সে-সময় ঘটেছিল তার একটা মোটামুটি রূপরেখা আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থিত না থাকলে নবীন ভারতের উত্থান ও সুভাষচন্দ্রের জন্ম, কোনো ঘটনাকেই ঠিকভাবে বোঝা যাবে না।

ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিবেকানন্দ কী তীব্র ব্যথা অনুভব করতেন তার বহু দৃষ্টান্তই উপস্থিত করা যেতে পারে। কিন্তু যখন দেখি তাঁর আমেরিকা যাত্রার জন্য ভক্তগণ প্রথম যে পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করেছিলেন তা তিনি অবলীলাক্রমে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেন এবং যুবক ভক্তদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর যাত্রার পাথেয় যেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সংগ্রহ করা হয়, রাজা মহারাজার কাছ থেকে নয়, কেননা তাঁর বক্তব্য ছিল: "মায়ের যদি অভিপ্রায় হয় যে আমায় যেতে হবে, তবে আমার প্রয়োজনীয় অর্থ গরীবদের কাছ থেকে আসুক; কেননা আমি তো ভারতীয় জনতারই জন্য বিদেশে যাচ্ছি— ভারতীয় জনতা ও দরিদ্রদেরই জন্য।"—স্বামীজী কোন্ ভারতের উত্থান চাইতেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিনি ভারতের কোনো বিশেষ শ্রেণী, সন্ন্যাসী বা সাধুসম্প্রদায়, ধনিক শ্রেণী বা শাসক-সম্প্রদায় বা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে ভারতের উত্থান চাইতেন না,—ভারতের অধিকাংশ মানুষ, দরিদ্র, অজ্ঞ, নিরক্ষর মানুষ,—তাদের মঙ্গলের জন্য ছিল তাঁর ভারতের উত্থান কামনা।

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব সম্পর্কে আমেরিকায় পৌছাবার পর শিকাগো ধর্ম-সম্মেলনের আগেই অ্যানিস্কোয়াম শহরে আমেরিকান-দের কাছে তিনি বলেছিলেন: "কেউ যদি ভগবানের প্রতিশোধে বিশ্বাস না-ও করে, ইতিহাসের প্রতিশোধে বিশ্বাস করতেই হবে। আর এ প্রতিশোধ ইংরেজদের উপর নেমে আসবেই। তারা পা দিয়ে আমাদের ঘাড় চেপে রেখেছে। তারা নিজেদের ফুর্তির জন্য

আমাদের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিয়েছে। তারা আমাদের কোটি কোটি টাকা লুটে নিয়ে গেছে। আর আমাদের গ্রামের পর গ্রাম, প্রদেশের পর প্রদেশ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।" এই একই বক্তব্য কি সুভাষচন্দ্রেরও ছিল না?

শিকাগো ধর্ম-মহাসভার প্রথম দিনের ভাষণের ফলে স্বামীজী বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। সেদিন তাঁর সাফল্য ও সমাদরের অন্ত ছিল না। কিন্তু সেদিন রাত্রেই ধনীগৃহের শুভ্র শয্যায় শয়ন করা মাত্র ভারতের দারিদ্র্যের কথা মনে পড়ায় যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েন; শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল, বালিশ ভিজে গেল চোখের জলে—শয্যা হতে নেমে মাটিতে শয়ন করে তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন; বললেনঃ "মা, আমার স্বদেশ যখন অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের চাপে পীড়িত, তখন মান-যশ দিয়ে আমি কী করব? গরীব ভারতবাসী আমরা এমন দুঃখময় অবস্থায় পৌঁছেছি যে আমরা লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে প্রাণ হারাই—আর এদেশে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। ভারতের জনতাকে কে ওঠাবে? কে তাদের খেতে দেবে? মা দেখিয়ে দাও, আমি কী করে তাদের সেবা করতে পারি।" সনটা ছিল ১৮৯৩; কটকে জানকীনাথ বসুর গৃহে সুভাষচন্দ্র বসুর তখনো জন্ম হয়নি। কিন্তু এই কান্নার, এই আকুল প্রশ্নের অন্তরালে যে অন্তর্জ্বালা ছিল তা সমগ্র ভারতে বিবেকানন্দ ভিন্ন আর যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে উন্মাদ করে তুলেছিল তিনিই সুভাষচন্দ্র। তাঁরও সারাজীবনের প্রশ্ন ঐ একই—"ভারতের জনতাকে কে ওঠাবে? কে তাদের খেতে দেবে? মা দেখিয়ে দাও আমি কী করে তাদের সেবা করতে পারি।" একদিন অসুস্থদেহ, রণক্লান্ত, হতাশার সাগরে নিমজ্জিত সুভাষও তাঁর নিভৃত গৃহের নির্জনতার মধ্যে তাঁর আরাধ্য দেবতাকে নয়, নিজের অন্তরপুরুষকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ সব ছেড়ে হিমালয়ে চলে

যেতে পারি সন্ন্যাসী হয়ে, সব কষ্টের, নিরাশার, সংগ্রামের শেষ করে দিতে পারি। কিন্তু ভারতের ওই অগণিত দরিদ্র মানুষ, ওদের নিরন্ন মুখে অন্ন তুলে দেবার কী হবে? কে তাদের আহার দেবে? ওদের সেবার জন্যই তিনি যাবেন রণাঙ্গনে, দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সংগ্রামে সৈনাপত্য করবেন।

১৮৯৪ সালের ২৪শে জানুয়ারি শিকাগো থেকে মাদ্রাজী ভক্তদের নিকট লিখিত এক পত্রে স্বামীজী লিখেছিলেন: "মনে রাখিবে—দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করেন নাই। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার?···তাহাদিগকে আপনার পায় আপনি দাঁড়াইতে শিখাইতে পার?"

ভারতের দরিদ্র আপামর জনসাধারণের উন্নতি সাধনের কথার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কথা তিনি বলতেন—ধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে সর্বদা অক্ষুণ্ণ রেখে জনসাধারণের উন্নতি বিধানই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। মাদ্রাজী ভক্তদের উদ্দেশ্যে লিখিত পূর্বোদ্ধৃত পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে—"ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতি বিধান।" যদিও ভারতে প্রচলিত ধর্মের রূপ সম্পর্কে তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। ১৮৯৪ সালের ১৯শে মার্চ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক পত্রে তিনি লিখছেন: "যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম?···যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ

লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য! দাদা, এইটি তলিয়ে বোঝ—ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি!' কিন্তু ভারত সম্পর্কে তাঁর মূল পরিকল্পনা বা বক্তব্য ঐ পত্রেই কয়েকটি ইংরেজি ছত্রে তিনি প্রকাশ করেছিলেন—সম্ভবত আজ সেই ছত্রগুলিকে স্মরণ করার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। সুভাষচন্দ্রের জীবনকে এই কয়েকটি ছত্রের আলোয় বুঝে নেওয়া দরকার,—বিবেকানন্দের চেতনা সুভাষের আধারে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল, একথা তাহলে আর অতিরঞ্জিত মনে হবে না। স্বামীজী হিন্দু-সমাজ সম্পর্কেও একটি মন্তব্য করেছেন এই লাইনগুলির শেষ দিকে, তাঁর গভীর প্রত্যয় থেকেই এই মন্তব্য উৎসারিত—কিন্তু আমাদের মনে হতে পারে যে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এই মন্তব্যের যেন মিল নেই। কারণ ভারত সম্পর্কে সুভাষের কর্ম ও চিন্তা একান্তভাবে বিবেকানন্দের ধ্যান অনুসারী হয়েও হিন্দুত্বের প্রতি তিনি কখনো জোর দেননি। নিবেদিতা বিবেকানন্দের ভাবকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে যেয়ে Aggressive Hinduism-এর পরিকল্পনা করেছিলেন, সুভাষ যেন সেই মত হতে অনেক দূরে অবস্থান করতেন মনে হয়। ভারত বলতে তিনি সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সম্মিলিত ভারতকে বুঝতেন, হিন্দুর ওপর অধিকতর গুরুত্ব তিনি আরোপ করেননি। রাজনীতির ক্ষেত্রে সুভাষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায় কোনোটাকেই জড়িয়ে ফেলেননি, গান্ধী, জিন্না, সাভারকর সবার সঙ্গেই এবিষয়ে তাঁর বিরোধ ছিল। কিন্তু ভারতে জাতিগঠনের যে চিন্তা তিনি নিভৃতে করেছিলেন, যা প্রকাশ করার কোনো অবকাশ বা প্রয়োজন ঘটেনি—তাঁর সেই চিন্তা, যা সমকালীন রাজনীতির সীমাকে ছাড়িয়ে প্রসারিত ছিল বলেই গোপন ছিল,—বিবেকানন্দের যে মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করব তার সঙ্গে তার বিরোধ নেই।

সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর এই উক্তির প্রতিটি শব্দকে সমর্থন করতেন বললে কম বলা হবে—তাঁর জীবনের কর্মব্রতই হচ্ছে এই উক্তিকে সর্বাংশে বাস্তবে রূপদান করা। ভারত সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের কর্মধারার সারাৎসার রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা বিবেকানন্দের এই পত্রাংশে তাঁর জন্মাবার পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেন সুভাষের জন্মরূপ ঘটনাটিকে বিবেকানন্দের ভাবনা ও কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে আমরা দেখতে চাইছি, আশা করি, তা এই কয়টি পংক্তি পাঠেই সুস্পষ্ট হবে;—স্বামীজী লিখেছিলেন: "We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses. The Hindu, the Mahommedan, the Christian, all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from inside, i.e. from the orthodox Hindus. In every country the evils exist not with but against religion. Religion therefore is not to blame—but men."

স্বামীজী তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কর্মের পরিকল্পনাও স্থির করেছিলেন। আলোচ্য পত্রখানিতে তিনি লিখেছিলেন: "দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin-এ মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরার উপরে বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার

যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর ছু পা দিয়ে দলেছে। মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—কোন কাজ করে ?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা।" বিবেকানন্দ যে ভারতবর্ষে একটা অভিনব আদর্শ স্থাপন করতে চাইছেন এই পত্রে সেটা ধরা পড়ে ; সংসারবিরাগী মুমুক্ষু সন্ন্যাসীগণ চিরকাল যেভাবে জীবনযাপন করেছেন বিবেকানন্দ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পথ সন্ন্যাসীদেরও অনুসরণের জন্য বলছেন—দেশের জনসাধারণের কল্যাণসাধনের পথ। সুভাষচন্দ্রের জীবনে সন্ন্যাসাদর্শের এই নতুন মোড় ফেরার একটা সুগভীর তাৎপর্য ছিল ; সন্ন্যাসী হয়ে তিনিও একদা বেরিয়ে পড়েছিলেন গৃহপরিজন ছেড়ে, কিন্তু ভারতে কালাগত সন্ন্যাসাদর্শের যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন উত্তরভারতে পর্যটন কালে, তাতে তিনি তৃপ্ত হননি। নিজের জন্য ঐ আত্মসন্তুষ্ট, সমাজ ও দেশ সম্পর্কে অচেতন, নিজ মুক্তি কামনা-মাত্র সম্বল সন্ন্যাসীদের জীবনাদর্শ তিনি বরণ করে নিতে পারেননি ; দেশের বন্ধনমুক্তি ও দরিদ্র জনতার উত্থানের সমস্যা তাঁর কাছে অতিশয় জরুরী বলে প্রতিভাত হয়েছিল ; এবং দেশসেবার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পথ ও কর্ম-পরিকল্পনার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছিল। বিবেকানন্দের চেতনা ও সুভাষের চেতনা যে সমসূত্রে বাঁধা ছিল—এবিষয়ে তাই সংশয় করা চলেনা।

স্বামীজীর পরিকল্পনার আর একটু বিস্তৃত পরিচয় নেওয়া আবশ্যক। ১৮৯৪ সালের ২০শে জুন তারিখে শ্রীযুত হরিদাস বিহারীদাশ দেশাইকে এক পত্রে তিনি লিখছেন : "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে,

তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কিরূপে তাহা সাধিত হইবে? আপনি আমার গুরুভ্রাতাগণকে দেখিয়া থাকিবেন। এক্ষণে ঐরূপ নিঃস্বার্থ, সৎ ও শিক্ষিত শত শত ব্যক্তি সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে আমি পাইব। ইহাদিগকে গ্রামে গ্রামে, প্রতি দ্বারে দ্বারে শুধু ধর্মের নহে, পরন্তু শিক্ষার আলোকও বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কাজে লাগাইবার গোড়াপত্তন আমি করিয়াছি। এ কার্যের জন্য সঙ্ঘের প্রয়োজন এবং অন্ততঃ প্রথম দিকটায় সামান্য কিছু অর্থেরও প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষে কে আমাদিগকে অর্থ দিবে? দেওয়ানজী সাহেব, আমি সেইজন্যই আমেরিকায় চলিয়া আসিয়াছি।" ১৮৯৪ সালে বরানগর মঠে গুরুভাইদের উদ্দেশ্যে এক পত্রে তাঁব নতুন সন্ন্যাসাদর্শের কথা বোঝাতে যেয়ে স্বামীজী লিখেছিলেনঃ "যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা; লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বংশ নির্বংশ। আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি এবং ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি। এই ক-টি কথা মনে রেখো—

১। আমরা সন্ন্যাসী, ভক্তি, ভুক্তি, মুক্তি—সব ত্যাগ।

২। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—
এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।"

বিবেকানন্দের এই নতুন আদর্শ আজও পর্যন্ত ভারতের অধিকাংশ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি পায়নি—বরং এখনও প্রাচীন ধারার সাধকসম্প্রদায় এজন্য তাঁকে সমালোচনা করে থাকেন। তাঁর গুরুভাইগণও অন্তর হতে তাঁকে সমর্থন করতে পারেননি—তাঁদের সঙ্গে স্বামীজীর একটা দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ছিল, যা তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের চাপে কখনোই মারাত্মক ও প্রকাশ্য রূপ নিতে পারেনি। বস্তুতঃ বিবেকানন্দের বক্তব্য ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অভিনবই ছিল। তাঁর অনুবঙ্গগণ এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর ভাবকে যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হননি,—সেজন্য জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তিনি বেদনামথিত দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে গেছেন। সম্ভবতঃ তাঁকে যথার্থভাবে অনুধাবন ও অনুসরণ করেছিলেন তাঁর একজন মাত্র অন্তরঙ্গ—নিবেদিতা।

সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে এই কথাগুলি ও বিবেকানন্দের অভিনব বার্তার কথা কেন পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করতে হচ্ছে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। দিলীপকুমার রায়, সুভাষচন্দ্রের একজন আকৈশোর বন্ধু ও অনুরাগী, যিনি দীর্ঘকাল লোকপ্রসিদ্ধ গুরুর আশ্রমে থেকে যোগসাধনা করেছেন ও পরে নিজেই অধ্যাত্মগুরু হয়ে উঠেছেন,—তিনি নানাভাবে ও নানা স্থানে অভিযোগ করেছেন যে সুভাষের প্রকৃতি ছিল ভগবদন্বেষী সাধু হওয়ার, অথচ হলেন তিনি রাজনীতিক ;—সুভাষ এইভাবে আত্মবঞ্চনা তথা আত্মপ্রতারণাই করেছেন। এর বিপরীতভাবেও অনেকে বিষয়টিকে দেখেন ও অভিযোগ করেন যে সুভাষ বস্তুনিষ্ঠ রাজনীতিক ছিলেননা, ছিলেন স্বৈরাচারী খামখেয়ালী প্রকৃতির।

বিবেকানন্দকে তাঁর সমকালীনরা বোঝেনি ; সুভাষকেও না। বিবেকানন্দের যে কথাগুলি উপরে উদ্ধৃত করেছি, ঐগুলি সুভাষেরও

অন্তরের কথা। মূলত ও স্বরূপত তিনি সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী,—কিন্তু নিজের মুক্তিভাবনা তাঁর নেই, আত্মসন্তোষের জন্য তাঁর উদ্বিগ্নতা নেই। আলোচ্য চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন : "তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী ? সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা। কোনও চিন্তা রেখোনা ; নরক স্বর্গ ভক্তি বা মুক্তি সব don't care"—বস্তুতপক্ষে দিলীপ রায় প্রমুখ সাধকদের সন্ন্যাসের আদর্শের সঙ্গে সুভাষের জীবনাদর্শের এইখানেই তফাৎ ;—সুভাষ কোনোরকম আত্মবঞ্চনা করেননি ; এক নবীন সত্তা, জগৎকল্যাণের এক নতুন আদর্শ তাঁর মধ্যে ফলবান, সার্থক হয়ে উঠেছিল ; সঙ্কীর্ণ, গতানুগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তাঁকে ও বিবেকানন্দকে উভয়কেই ভুয়ো দেওয়া চলে ;—কিন্তু আমি যে বলেছি বিবেকানন্দ ও সুভাষের চেতনা ছিল সমগোত্রীয়, সমসূত্রে বাঁধা, সে কথাটাই তাতে প্রমাণিত হয়ে যায়। আর সুভাষের জন্ম রহস্যের গূঢ় সত্য উপলব্ধি করার জন্য সেই জন্মটি যে ছিল এক অখণ্ড শিবচেতনার পুনরুজ্জীবন, একটি মানবশিশুর জন্মের সঙ্গে ভারতে যে অপরূপ অভিনব একটি চেতনারও নবজন্ম হয়েছিল,—সেই কথাটি বোঝা দরকার। সেই শিবচেতনা এই পার্থিব জগতে, এই ভারতবর্ষে, এই বাংলায় কিভাবে নিজেকে প্রকাশিত করতে চেয়েছে এযুগে—বিবেকানন্দের চিন্তার বিকাশ লক্ষ্য করলেই তা অনুমান করা যায়। সুভাষের জন্মসত্যের আসল তত্ত্বটি উপলব্ধির জন্য তাই বিবেকানন্দের করধৃত দীপমালায় আলোকিত পথ বেয়ে আরও একটু অগ্রসর হতে হবে আমাদের।

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সুভাষচন্দ্রের জন্ম ও ভারতে বিজয়ীর বেশে বিবেকানন্দের প্রবেশ একই সময়ে ঘটেছিল। সেই ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে সমগ্র ভারত এক নতুন চেতনার আবির্ভাবে শিহরিত, উল্লসিত ও নবোৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। স্বামীজী প্রথম পদার্পণ করেন সিংহলের কলম্বো বন্দরে। সেখানে

তাঁর প্রথম প্রকাশ্য জনসভার বক্তৃতায়ই তিনি বলেছিলেন : "আগে সকল হিন্দুর মতো আমিও বিশ্বাস করতাম—ভারত পুণ্যভূমি, কর্মভূমি। আজ আমি এই সভায় দাঁড়িয়ে সত্যোপলব্ধির দৃঢ়তা নিয়ে বলছি, —একথা পরম সত্য। যদি এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকে যা পুণ্যভূমিরূপে উল্লেখের দাবী রাখতে পারে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই আসতে হবে অনন্ত পরিণামে পৌঁছবার জন্য, যেখানে মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদগুণের বিকাশ হয়েছে—যেখানে অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশ হয়েছে, তবে সে আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষ। অতি প্রাচীনকাল থেকে ধর্মসংস্থাপকগণ এখান থেকে বার বার সমগ্র পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিয়েছেন পবিত্র ও শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্যের বন্যায়। এখান থেকেই উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হয়েছে। আবার এখান থেকেই উঠবে সেই তরঙ্গ যা সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করে তুলবে। অন্যান্য দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের নিভৃততম স্থানকে যে জড়বাদের জ্বলন্ত আগুন দগ্ধ করে দিচ্ছে তাকে নির্বাপিত করতে পারে যে জীবনপ্রদ বারি তাও এখানেই রয়েছে।" কথাগুলি লক্ষ্য করার মতো। কারণ যে জাতীয়তাবাদের সূচনা ইতিপূর্বে ভারতে ঘটেছিল ভারত সম্পর্কে এই দৃঢ় প্রত্যয় তাতে অনুপস্থিত ছিল। সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশ ব্যানার্জী, দাদাভাই নওরোজী, গোখেল, তিলক, বিপিন পাল—কোনো নেতাই ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই দৃষ্টি পোষণ করতেন না। ভারতের ভবিষ্যৎ কাজ অথবা জগৎসভায় তার ভূমিকা যে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার বদলে একটা নতুন সভ্যতার সন্ধান দেওয়া, একটা নতুন সত্যের প্রতিষ্ঠা করা হবে একথা ভাবা সেদিন অসম্ভব ছিল—কেননা ইংরেজকে আমরা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও করণীয় বলে ততদিনে স্বীকার করে নিয়েছি। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ—যাকে জাতীয়তাবাদ বলাই হয়তো ভুল—

ছিল ইংরেজের ভাবাদর্শের অনুকরণে প্রাপ্ত। ইংরেজ শাসকরা আমাদের শিক্ষিত লোকদের যথেষ্ট সংখ্যায় ও উচ্চপদে চাকরি দেয়না, আমাদের ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেয়না, আমাদের দেশের সম্পদ নিজ দেশে নিয়ে যায়—আমাদের রাজনীতির, স্বদেশ-প্রেমের ও জাতীয়তাবোধের ভিত্তি ছিল এই অভিযোগগুলি। ইংরেজ আমাদের সঙ্গে একটু সৎ ও উদার ব্যবহার করলেই যেন আমাদের সব আকাঙ্খা মিটে যেত, সব স্বপ্ন চরিতার্থ হত। বিবেকানন্দ একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভিন্ন প্রত্যয় উপস্থিত করলেন—ভারতকে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ দেশ ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ নেতা বলে ঘোষণা করলেন। ইংরেজের কোনো অনুকরণ বা তাদের কাছে দাবী-দাওয়া পেশ করার হীনমন্যতা থেকে আমাদের কল্পনা শক্তিকে তিনি উদ্ধার করে আনলেন, দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা-সচেতনতার ওপর তিনি আমাদের নবীন জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করলেন। আর ঠিক সেই শুভ মুহূর্তেই সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল—ঘটনার এই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিকটির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে, কারণ সুভাষের জীবনকে বোঝার পক্ষে সেটাই হবে প্রথম পদক্ষেপ। সুভাষচন্দ্রকে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের নেতারূপে আমরা জানি; কিন্তু তাঁর জীবনের পরিণত চিন্তা ও কর্মের উদ্দেশ্য ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিই শুধু নয়, ভারতের শাশ্বত বাণীরও প্রতিষ্ঠা,—পৃথিবীর বস্তুবাদী সভ্যতাকে অধ্যাত্ম সত্যে পরিপূর্ণ করে তোলা। যথাসময়ে সে প্রসঙ্গের বিস্তৃততর আলোচনার আমরা সুযোগ পাব, কিন্তু এইটুকু শুধু এখানে স্মরণযোগ্য যে পুণ্যভূমি ভারতের যে ভূমিকার কথা বিবেকানন্দ ভারতের তট প্রান্তে পৌঁছে তাঁর প্রথম বাণীতেই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন সুভাষের সমগ্র গোপন সাধনারও উদ্দেশ্য সেই ভূমিকা পালনে ভারত যাতে সমর্থ হয় সেজন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা। অর্থাৎ বিবেকানন্দের বাণীকে সাঙ্গীকার করার জন্যই সুভাষের যেন জন্ম হয়েছিল—দিব্য বাণী ও দিব্য মানুষ

এই উভয়ই একত্রে ভারতে অবতীর্ণ হয়েছিল ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে। সেকথা সেদিন বোঝা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না—কিন্তু কালের দীর্ঘ ব্যবধানে এসে আজ আর তা বোঝার পক্ষে সংশয় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

ভারতে পদার্পণ করে ২৫শে জানুয়ারি রামনাদে স্বামীজী ভারতের জাগরণ সম্পর্কে দ্রষ্টার মতো যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন আমরা পূর্বেই তা উদ্ধৃত করেছি—এবং তাঁর সেই বলিষ্ঠ আশার বাস্তব হেতু কী ছিল তার প্রতিও আমরা ইঙ্গিত করেছি। ইতিহাসের বিচারে তাঁর সেই বাণীর মূল্য বিচার করলে আমাদের অনুমানের সার্থকতা বোঝা যাবে। তিনি বলেছিলেনঃ "সুদীর্ঘ রজনী প্রভাত প্রায় বোধ হচ্ছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হচ্ছে। কালনিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হচ্ছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘন তমিস্রা ভেদ করতে অসমর্থ, সেখান থেকে এক অপূর্ব বাণী যেন শুনতে পাচ্ছি। জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন ঐ বাণী স্পষ্টতর, গভীরতর হচ্ছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শ মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার করছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হচ্ছে। তার জড়তা ক্রমশঃ দূর হয়ে যাচ্ছে। যে অন্ধ সেই শুধু দেখতে পায় না, আর যে বিকৃত মস্তিষ্ক সে দেখতে চায় না—আমাদের এই মাতৃভূমি দীর্ঘ গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করে জাগ্রত হচ্ছেন। কেউই এখন তাঁর গতিরোধে আর সমর্থ নয়, আর কখনোই তিনি নিদ্রিত হবেন না, কোনো বহিঃশক্তিই এখন আর তাঁকে দমন করে রাখতে পারবে না; কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙছে।"

মাতৃভূমির এই জাগরণের সকল লক্ষণ ফুটে উঠেছিল ১৯০৫ সালের স্বদেশী-আন্দোলন ও তার পরবর্তী সময়ে—আমরা সে বিষয়ে

আলোচনার সুযোগ যথাস্থানে পাব। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর ভারতের যে চিত্র আজ দাঁড়িয়েছে তাতে কি স্বামীজীর এই কথা আর সত্য মনে হয় যে "never is she going to sleep any more"—আর কখনো তিনি নিদ্রিত হবেন না। ভারত যেন আবার ঘুমিয়েই পড়েছে—আবার যেন তার অমানিশার পালা চলছে। দেশ খণ্ডিত, শক্তিহীন, ভঙ্গুর দারিদ্র্যজ্বালায় কাতর, বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণে পরাজিত, পর্যুদস্ত, ভীত;—এই কি স্বামীজীর আশার বাণীর পরিণাম? ইতিহাস বড় কঠোর বিচারক। স্বামীজীর বাণী যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ আছে ঐ বাক্যে যে, no outward power can hold her back any more,—বাইরের শক্তিই তাকে দমন করে রাখতে পারবে না। স্বামীজীর এই বাণীটি কিন্তু সার্থক হয়ে উঠেছে একজন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে—তিনিই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু; আবেদন-নিবেদন ও আপস নয়, রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মূল্যে যিনি ভারতের উপর হতে বিদেশীর করাল গ্রাসকে অপসারিত করেছেন। স্বামীজীর বাণীর অপর অংশগুলিও কি সার্থকতা লাভের জন্য তারই অপেক্ষায় নেই? সুভাষবিহীন ভারতের অবস্থা মৃত্যুতুল্য, সুভাষের সঞ্জীবনী স্পর্শ ব্যতিরেকে ভারত আবার শবরৎ হয়ে পড়ে আছে। অধীর আগ্রহে মানুষ প্রতীক্ষা করছে যবনিকার অন্তরাল থেকে ঘটবে তার দীপ্ত আবির্ভাব, তবে ভারতের এই নৈরাশ্যজনক, ব্যর্থতাময়, পীড়িত অবস্থার অবসান হবে। সুভাষ তবে সেই পুরুষ বিবেকানন্দের বাণী যাকে ছাড়া অর্থহীন, ব্যর্থ। সুভাষ তবে সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীর মন্ত্রকে জাগ্রত করবার অধিকার নিয়েই যাঁর জন্ম। ইতিহাসের নির্মম কশাঘাতে আজ এই সত্যটি অনাবৃত হয়ে পড়েছে যে বাণীর সাধক ব্যতীত বাণী নিরর্থক—আর বিবেকানন্দ তা জানতেন। তাই কি ভারতের মৃত্তিকা পরে এক নব শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে জানবার পরই তিনি তার বাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন? ২৭শে জানুয়ারি তারিখে ভারতেরই এক সভাক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তিনি

কি ইতিহাসের কাছে সত্যদ্রষ্টার এই ঘোষণাবাণী রেখে যেতে চেয়েছিলেন যে সেই মানুষ জন্মেছে, যে ভারতকে স্বাধীন করবে, স্বপ্রতিষ্ঠ করবে, মহাবলীয়ান করবে? কিংবা নবজাতককে তিনি এইভাবে আশীর্বাদ ও স্বাগত জানাতে চেয়েছিলেন কিনা কে জানে! ইতিহাসের জবাব তো সম্মতিসূচকই মনে হয়!

স্বামীজী মাদ্রাজে ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের বক্তৃতায় (আমার সমরনীতি) বলেছিলেন: "লোকে স্বদেশপ্রেমের কথা বলে থাকে। আমিও স্বদেশপ্রেমে বিশ্বাস করি এবং স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করতে গেলে তিনটি জিনিস আবশ্যক। প্রথম, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে শেখো।···· হৃদয়দ্বার দিয়েই আসে মহাশক্তির প্রেরণা। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—প্রেমের ভিতর দিয়েই জগতের সকল রহস্যকে অনুভব করতে হয়।····হে ভাবী দেশ প্রেমিকগণ! তোমরা কি অনুভব কর? তোমরা কি অনুভব কর যে দেব ও ঋষিদের কোটি কোটি বংশধর পশুবৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমরা কি অনুভব কর যে কোটি কোটি লোক আজ অনাহারে কাটাচ্ছে এবং যুগ যুগ ধরে তারা অনাহারে কাটিয়েছে? তোমরা কি বোঝ যে অজ্ঞানতার কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতাকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে? এই সকল ভেবে তোমরা কি অস্থির হয়েছ? এই ভাবনায় তোমরা কি নিদ্রাশূন্য হয়েছ? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে, তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে কি এই ভাবনা মিশে গেছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলেছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হয়েছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হয়ে তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, এমনকি শরীর পর্যন্ত ভুলেছ? তোমাদের কি তেমন অবস্থা হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, তবে জেনো যে তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশপ্রেমিক হবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করেছ।····বেশ,

তোমরা যদি দেশের দুর্দশা অনুভব করে থাক, কিন্তু বাক্যবিলাসে শক্তি ক্ষয় না করে, এই দুর্দশার প্রতিকারের কোনো পথ, কোনো বাস্তব সমাধান বের করেছ কি ?....শুধু তাই নয়। তোমাদের কি পর্বত প্রমাণ বাধা অতিক্রম করার মতো সঙ্কল্প আছে ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হস্তে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবুও যা সত্য বলে বুঝেছ তা করে যাবার মতো সাহস তোমাদের থাকবে কি ? যদি তোমাদের স্ত্রী পুত্ররাও বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তোমাদের সমস্ত অর্থ নষ্ট হয়ে যায়, নাম বিলুপ্ত হয়, ধন সম্পদ উধাও হয়ে যায় তবুও কি আদর্শে অবিচল থাকবে ? তবুও কি আদর্শকে অনুসরণ করে স্থিরভাবে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে ?"

আমরা পূর্বেই দেখেছি এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের আগেই দেশে একটা বৃহৎ সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, যার নাম জাতীয় কংগ্রেস। তার উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা, এবং চারদিকে শত শত দেশপ্রেমিকদের দেখা যাচ্ছিল। সেই দেশ-প্রেমিকরা চোস্ত ইংরেজিতে নিপুণ বক্তৃতা করতে পারতেন, উচ্চপদের চাকরি ও অধিক সংখ্যায় চাকরি নিজেদের জন্য দাবী করতে পারতেন, বিলেত যাবার জন্য যে প্রেরণা ও আগ্রহ তাঁদের ছিল, শহর ব্যতীত দেশের আর কোথাও যাবার পক্ষে তার সিকিমাত্র প্রেরণা বা আগ্রহ তাঁদের ছিল না,—সেই সব দেশহিতব্রতীদের কাছে স্বামীজীর এই বক্তৃতা বড়ই বেসুরো লেগেছিল নিশ্চয়ই। স্বামীজী উনবিংশ শতকের শেষ লগ্নে এ কোন দেশপ্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন ? বিংশ শতকের সম্মুখে এ কোন দেশপ্রেমের আদর্শ উপস্থাপিত করছিলেন ? এবং এ কার জন্য ?

তুলনার সাহায্যে কোনো দেশনেতার চরিত্রকে নিষ্প্রভ করা এখানে অনাবশ্যক—কিন্তু বিবেকানন্দ দেশপ্রেমিকের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, অর্থাৎ দেশের জন্য বেদনায় যে অধীর ও পাগল, যার মান সম্ভ্রম ধনৈশ্বর্য, পরিবার-পরিজন এমনকি দেহবোধ পর্যন্ত লুপ্ত, যে

দেশের সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায় নির্ধারণে সক্ষম, এবং যে আপসহীনভাবে সকল উত্তাল বাধার বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়িয়ে নিজের আদর্শের অনুসরণে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে, তেমন মানুষ ভারতে কজন জন্মেছে? কোন নেতার মধ্যে পেয়েছি দেশবাসীর জন্য সেই বেদনা, যা বুদ্ধের ছিল জনসাধারণের জন্য? যে মান চায়নি, সুখ ও সোয়াস্তি চায়নি, এমনকি যার দেশকে মুক্ত ও উন্নত করার ব্রতের মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্যের ছায়াপাত পর্যন্ত ছিল না? বিবেকানন্দের দেওয়া মানদণ্ডে বিচার করলে কতজন ভারতীয় নেতার দেশপ্রেমকে যথার্থ বলে মনে হয়? এবং জীবনের একটা পর্বে মাত্র নয়, শৈশব থেকে শেষ পর্যন্ত দেশের চিন্তাই ছিল যার সাব, দেশের মঙ্গল ছাড়া আর কোনো সাধনই যার ছিল না, তেমন পুরুষ ভারতবর্ষে কে জন্মেছে? মনে কি হয় না যে বিবেকানন্দের এই কথাগুলি অবিকল মিলে গেছে একজন মানুষের জীবনে—আর তিনিই সুভাষচন্দ্র বসু? ১৮৯৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ভারতেরই মাটিতে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ এই যে দেশ-প্রেমিকের চরিত্রলক্ষণ নির্ণয় করতে বসেছিলেন এরই বা নিগূঢ় ইঙ্গিত কী? মাত্র কয়েকদিন আগে, ২৩শে জানুয়ারি, ভারতের এক প্রান্তে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, অব্যর্থ দৃষ্টিতে স্বামীজী যেন তারই ভবিষ্যৎ মহিমা দেখতে পাচ্ছিলেন, আর প্রকাশ্যভাবে তিনি তারই সাক্ষ্য যেন রেখে যাচ্ছিলেন। আমাদের এ অনুমান হয়তো বা সত্য নয়,—কিন্তু এই সত্যও পরমাশ্চর্য ও অভিনব, যে বাণী ও বাণীর সাধক একই সময়ে প্রচারিত ও আবির্ভূত হয়েছিল।

বিশ্ববিজয় শেষে বিবেকানন্দ ভারতে পদার্পণ করলে সমগ্র দেশ তাঁকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানাবার জন্য একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল;—তাঁর কণ্ঠেও ক্রমাগত উচ্চারিত হতে লাগল নবীন ভারতের অভ্যুত্থান-বার্তা। কিন্তু শুধু বাণী নয়—তাঁর ব্যক্তি চরিত্রও এক আপসহীন দেশপ্রেমিকের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে সময়। নিবেদিতার বর্ণনায় আছে সেই সাক্ষ্য বিধৃত হয়ে। তিনি লিখেছেন; "স্বামীজীর সত্তার

গভীরে ছিল এমন একটি জিনিস, যাকে নিয়ে তিনি কোনোদিন আপস করেননি। সে হচ্ছে তাঁর স্বদেশের প্রতি ভালবাসা ও স্বদেশের দুঃখকষ্টের জন্য প্রবল ক্ষোভ। যে কয়েক বছর ধরে আমি প্রায় প্রতিদিন তাঁর সঙ্গ পেয়েছি, দেখেছি ভারতের চিন্তাই যেন তাঁর শ্বাসবায়ু।...তিনি ছিলেন প্রেমিক আর তাঁর সর্বোত্তম প্রেম ছিল তাঁর জন্মভূমির চরণেই নিবেদিত। ভারতের প্রতিটি সমস্যাই তাঁর হৃদয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হত। দেশের যে কোনো প্রান্তে একটি ক্রন্দনধ্বনিও যদি উত্থিত হত সঙ্গে সঙ্গে তার অনুরণন শোনা যেত তাঁর হৃদয়ে।" ভারতবর্ষের উত্থানের জন্য তিনি নিজে যে কাজ করতে চেয়েছিলেন তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য, দেশবাসীর উদ্যমহীনতা ও অসহযোগিতা, অর্থাভাব—ইত্যাদি নানা কারণে সে কাজে তিনি অগ্রসর হতে পারেননি। তাই কখনো কখনো স্বামীজী নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করতেন হতাশার সমুদ্রে ডুবে যেতেন। নিবেদিতা প্রশ্ন করেছেন, সত্যিই কি তাঁর জীবন ব্যর্থ ছিল? না, নিবেদিতাই আবার উত্তর দিয়েছেন, স্বামীজীর একক জীবনেই যদি ভারতের সকল কল্যাণ সাধিত হত তবে সে কল্যাণের রূপ হত সীমিত।—ভারতের ব্যাপকতর, বৃহত্তর সার্থকতা সাধনের জন্য ভারত অপেক্ষা করবে স্বামীজীর উত্তরসাধকদের জন্য। সেই উত্তরসাধকদের মধ্যে যিনি মধ্যমণি—তাঁরই নাম সুভাষচন্দ্র বসু।

তার কারণ স্বামীজীর চরিত্রের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যেরও উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন সুভাষচন্দ্র। নিবেদিতার বর্ণনায় সেই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় পাই এইভাবে। তিনি লিখেছেন: "স্বামীজী ছিলেন বীরোচিত উপাদানে গড়া মানুষ, কিন্তু তার অসাধারণ চরিত্রই আমাকে মুগ্ধ করেছিল।"—এই কথাটা অবিকল ভাবে সুভাষ সম্পর্কেও প্রযোজ্য হতে পারে। নিবেদিতা লিখেছেন: "স্বামীজীর জীবনের শেষভাগে আমি একদিন তাঁকে বলেছিলাম যে তাঁর মুখে আমি শুধু 'ত্যাগ' 'ত্যাগ' এই শব্দটাই শুনেছি—কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে তাঁর মুখে যে শব্দটি শোভমান তা হচ্ছে: "জয় কর।"— আক্রমণাত্মক ভঙ্গীটাই তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য।"—সুভাষের চরিত্র যদি আমাদের বর্ণনা করতে হয় তবে আমরাও তাঁর ত্যাগমূর্তি ও যুদ্ধমূর্তিই বিশেষভাবে স্মরণ করব। স্বামীজী ও সুভাষের চরিত্রগত এই মৌলিক মিল আকস্মিক নয়। নিবেদিতা লিখেছেন যে বিবেকানন্দের মতে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ বীর্য লাভ (supreme achievement was strength)। এই কি সুভাষজীবনেরও মূল রহস্য নয়? নিবেদিতা উদ্ধৃত করেছেন বিবেকানন্দের এই বাক্য: "What the world wants is character. The world is in need of those whose life is one burning love—selfless. That love will make every word tell like a thunderbolt. Awake, awake, great souls! The world is burning in misery. Can you sleep?" এই আহ্বান যদি কারও জীবনে ফলপ্রসূ হয়ে থাকে তবে তা সুভাষচন্দ্রেরই জীবনে। তাঁর পবিত্র নিঃস্বার্থ প্রেম—মাতৃভূমির জন্য, কোটি কোটি পীড়িত মানুষের জন্য তাঁর তীব্র বেদনাবোধের দাহই তাঁর সমস্ত কর্মধারাকে অপ্রতিরোধ্য ও তাঁর বাক্যকে বজ্রগর্ভ করেছে। দেশের মুক্তিচিন্তায় তিনি অনিদ্র ও অক্লান্ত; তাঁর মধ্যে মহান আত্মার এই যে বিপুল জাগরণ, তা দেখে বিবেকানন্দের আহ্বানমন্ত্রকে কি আর কোনো অংশেই ব্যর্থ বলা যায়?

সুভাষের জন্ম কটক শহরে এক মানব শিশুর জন্ম ছিল বটে—কিন্তু তার তাৎপর্য জানকীনাথ বসুর ডায়েরির উল্লেখকে ছাড়িয়ে, বসুপরিবারের পারিবারিক গণ্ডীকে অতিক্রম করে, বহুদূর ব্যাপ্ত হয়েছিল; সেই একটি জন্মের আলোয় ভারতবর্ষেরও যেন নবজন্ম হল। অন্ততঃ সংগ্রামী নবীন জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল সেই সময় থেকেই। একটি ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে একটি জাতির জীবন এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেল কেন প্রথম থেকেই, এ প্রশ্ন মনে জাগে।

কোনো আকস্মিক বা কাকতালীয়বৎ যোগাযোগ বলেও একে ব্যাখ্যা করা যায় না। বরং একে ভারতের নিয়তি-নির্দিষ্ট ঘটনা বলে স্বীকার করলে আধুনিক যুগের ইতিহাসের বহু গূঢ় প্রশ্নের মীমাংসা হয়। এক অখণ্ড শিবচেতনা বারবাব ভারতে আত্মপ্রকাশ করে এদেশের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার লক্ষ্যপথ নির্ধারিত করেছে এবং পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় চালনা করে তাকে নবযুগের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে ভবিষ্যতেব বিশাল উত্থানের সম্ভাবনা নিয়ে। সেই শিবচেতনা স্বামীজীর সত্তায় প্রতিফলিত হয়েছিল, সুভাষের সত্তায়ও তারই প্রতিবিম্বন। আধুনিক ভারত জেগে উঠেছে স্বামীজীর বাণী ও মন্ত্রে—আধুনিক ভারত নব রূপ পরিগ্রহ করছে সুভাষের কর্মে। সুভাষ মানাচ্ছন্নার অতীত এই শিবচেতনার ধারক বলেই আমরা তাঁকে শিব সুভাষ রূপে বন্দনা কবি। তাঁর প্রাকৃত জীবনের ওপর অপ্রাকৃতের এই সম্পাত, দিব্যেব এই আবেশই তাঁকে বিশিষ্ট করেছে, অলোকসাধারণ করেছে। তাঁব জীবনেব এইটিই হল গূঢ়তম রহস্য।

শৈশব। সুভাষচন্দ্র ছিলেন বৃহৎ পরিবারের নবমতম সন্তান। পিতামাতার সমস্ত স্নেহ ও মনোযোগ এই একটি মাত্র শিশুর ওপর বর্ষিত হওয়া তাই সম্ভব ছিলনা। শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব মা ছাড়া অন্যদেরও অনেক পরিমাণে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। এই অন্যদের মধ্যে বিশিষ্ট একজনের নাম সারদা। সে ছিল বাড়ির পুরনো ঝি। সুভাষকে সে মায়ের মতোই স্নেহের বেষ্টনীতে ঘিরে রেখেছিল। শিশুর কখন কী প্রয়োজন সে দিকে থাকত তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সুভাষ সারদার কোলে পিঠে, তার সতর্ক প্রহরার অধীনে মানুষ হয়েছেন,—তাঁর অন্তরের নিভৃতে সারদার জন্য মমতা ও শ্রদ্ধা তাই সঞ্চিত হয়েছিল। সারদার স্নেহের ঋণ অপরিশোধনীয় বলেই তিনি মনে করতেন।

সুভাষের বড় দিদি ছিলেন তিন জন,--প্রমীলা, সরলা ও তরুবালা। প্রমীলা ও সরলা ছিলেন ভাইবোনদের মধ্যে সবার চেয়ে বড়। সুভাষের শৈশবকালে তাঁরা কটকে থাকতেন না। কেননা ইতিপূর্বেই তাঁদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তরুবালা সুভাষের ঠিক ওপরের বোন—দুজনের বয়সের ব্যবধান সামান্যই ছিল। দিদিদের স্নেহস্পর্শ শৈশবে সুভাষের ভাগ্যে তাই কদাচিৎ জুটেছে, তাঁর পরিচর্যায় তাঁদের অংশ প্রায় নেই বলা যায়। অবশ্য তাঁর পাঁচজন বড় ভাই ছিলেন—সতীশ, শরৎ, সুরেশ, সুধীর, সুনীল। সুভাষ এঁদের সকলেরই স্নেহের পাত্র হলেও এঁরা সবাই ছিলেন স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী, গম্ভীর ও নিজেদের বয়সোচিত চিন্তাধারার মধ্যে মগ্ন। ছোট ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত হবার মতো স্বভাব কারওই ছিল না। বাবা

জানকীনাথ ছিলেন গম্ভীর পুরুষ—তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধ তাঁর সমস্ত ব্যবহার ও চালচলনের মধ্যে এত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বিচ্ছুরিত হত যে তাঁর সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখেই সংসারের সবাই চলাফেরা করতেন। নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গতা প্রকাশে তাঁর ছিল মাত্রাতিরিক্ত সংযম—সুভাষের বেলায়ও সে সংযম শিথিল হয়নি। সংসার পরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল প্রভাবতী দেবীর ওপর ন্যস্ত—নবজাতক ছাড়া অন্য আরও বহুদিকে তাই তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হত। একান্তভাবে শিশুর জন্য সময় ঢেলে দেবার তাঁর উপায় ছিলনা, রুচিও না। সংযম ছিল তাঁরও চরিত্রের ভূষণ। চাপল্য বা উচ্ছ্বাসের বদলে দৃঢ়তা, শান্ত ও সংযতভাব ছিল তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য,—শিশুর প্রতি স্নেহ প্রদর্শনে বিগলিত ভাবকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। পূর্ণিমার চাঁদের মত শিশুরা একে একে তাঁর কোল ভরে দিয়েছিল, সবাইকে নিয়ে নিরুচ্ছ্বসিত ভাবে তিনি দিন যাপন করতেন, তার গোটা সংসারটার মধ্যে এনে দিতেন শান্তি, শৃঙ্খলা, পারিপাট্য, সংযম ও মর্যাদা। বাবা মাকে ঘিরে যে সংযম ও গাম্ভীর্যের বেষ্টনী ছিল, সুভাষের স্নেহস্পর্শকাতর হৃদয় সে বেষ্টনীকে অতিক্রম করতে চেয়ে প্রতিহত হয়েছিল। শিশুর কাছে পারিবারিক পরিবেশ নিরুত্তাপ মনে হত, বাবা মা ভাই বোনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার নিবিড় উষ্ণতা বা স্নেহের আর একটু অবাধ প্রকাশ সে কামনা করত। সে কামনা অপূর্ণই থাকত। তাই এই সংযমের ও গাম্ভীর্যের চাপে ঈষৎ আড়ষ্ট পরিবেশে প্রথম চেতনার উন্মেষে শিশুর মনে অভিমান··দেখা গিয়েছিল,—তার মনে ক্ষোভ জেগেছিল এই অনুভবের ফলে যে এ সংসারে সে অনেকের মধ্যে মাত্র একজন, একা: নিঃসঙ্গতার বোধ শিশুর মনে হতাশা, বিষাদ ও ব্যর্থতার অনুভূতি সঞ্চার করে বইকি। যে জগতে সে মাত্র নবাগত, এবং তাই যে জগৎ তার কাছে অনাত্মীয়বৎ, পরিজনদের স্নেহই সে জগৎকে তার কাছে সহনীয় ও

রমণীয় করে তুলতে পারে ; সেই স্নেহের প্রকাশ যদি হয় সংযত, কুণ্ঠিত ও সীমিত তাহলে শিশুর পক্ষে কাতর হওয়াই তো স্বাভাবিক। তাতে সুভাষের মতো শিশু, যে সাধারণ শিশুদের তুলনায় ছিল অনেক বেশি স্পর্শকাতর ও সচেতন, যার হৃদয় ছিল অতীব কোমল,—তার পক্ষে বসু পরিবারের আবহাওয়াকে শীতল ও কঠিন মনে হওয়াই ছিল স্বভাবসঙ্গত। সুভাষের মনের মধ্যে ক্ষোভ নয়, কিন্তু অভিমান জন্মেছিল ; শৈশবের আঙুল চোষার অভ্যাসের মধ্যে সেই অভিমানই হয়তো প্রতিফলিত হয়েছিল ;—আর এই অভিমানী প্রকৃতিটা কিন্তু তাঁর মধ্যে আজীবন বজায় ছিল। যাঁর পদক্ষেপে একদিন ইতিহাসের গতি আবর্তিত হয়েছে, সেই কঠোর, দৃপ্ত, সংগ্রামী পুরুষের মধ্যে একটা অভিমানী, উদাসীন, স্নেহলিপ্সু বালক শাশ্বতভাবেই বর্তমান ছিল। কে জানে, হয়তো সেটা বাঙালী জন্মেরই উত্তরাধিকার-বৈশিষ্ট্য।

কংগ্রেস। সুভাষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে আর একটা নতুন জিনিসেরও আবির্ভাব ঘটেছিল—তার নাম গুপ্ত সমিতি। কংগ্রেসের আশ্রয়ে বা প্রশ্রয়ে এর আবির্ভাব ঘটেনি—এ একেবারে স্বয়ং প্রকাশ। আগেই বলেছি ১৮৯৭ সালের জানুয়ারির গোড়ায় কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল—সে ছিল আসলে ১৮৯৬-এর অধিবেশনের জের। এই অধিবেশনে উপস্থিত নেতাদের মধ্যে লোকমান্য তিলকও ছিলেন—এমনকি তাঁর বক্তৃতায়ও আবেদন-নিবেদনের সুরই ছিল মুখ্য। কংগ্রেস অধিবেশন বসেছিল বিডন স্কোয়ারে (বর্তমান নাম রবীন্দ্র-কানন)—অদূরেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বাস। তাঁরা একদিন কংগ্রেস প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করে বড় একটা পার্টি দেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ পার্টি উপলক্ষে এই গানটি লিখে নিজে গেয়ে শুনিয়েছিলেন :

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননিজননী॥

নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল, অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল, শুভ্রতুষারকিরীটিনী ॥....

তিলক। কিন্তু কংগ্রেসের আসরে আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি প্রচার করলেও বালগঙ্গাধর তিলকের আর একটি মূর্তি ছিল। একজন প্রকৃত জননায়ক হবার মতো চরিত্র ও মানসিকতা সে সময়ের কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই ছিল। ইতিপূর্বেই তিনি মহারাষ্ট্রে দুটি উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন—গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব। মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ জাতীয়তাবাদী মনোভাবে দীক্ষিত হয়েছিল এই দুই উৎসবের মারফৎ। ১৮৯৭ সালে শিবাজী উৎসবে তিলক তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন: "ঘরে যদি চোর ঢোকে আর সে চোরকে তাড়িয়ে দেবার মতো বল যদি বাহুতে না থাকে তাহলে হৃদয় দৌর্বল্য পরিহার করে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরে আগুন ধরিয়ে চোরদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারাই উচিত।" (কেশরী, ১৫ জুন, ১৮৯৭)

১৮৯৬ সালের শেষ ও ১৮৯৭ সালের প্রথম দিকে বম্বে শহরে প্লেগ মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছিল। ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষও হয়েছিল। তিলক বহু চেষ্টা করে লোক যাতে অল্প দামে খাদ্য পায় সে ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বিনামূল্যে অন্ন বিতরণেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। প্লেগের রোগীদের জন্য পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল খুলে, নিজে স্বেচ্ছাসেবক থেকে তত্ত্বাবধায়ক পর্যন্ত সেজে, শহরের বাইরে ছাউনিতে বহু লোককে সরিয়ে এনে রেখে তাদের জন্য অন্নছত্র পর্যন্ত পরিচালনা করে তিলক স্বদেশবাসীর সেবায় নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সরকারও প্লেগ দমনের জন্য ইংরেজ সিপাহীদের পর্যন্ত নিয়োগ করেছিল। সিপাহীরা ঘরে ঢুকে কার প্লেগ হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখত—রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠাবার জন্য। কিন্তু পরীক্ষার ছলে তারা বাড়ির মেয়েদেরও হাত পা গা টিপে দেখত—পুরুষদের সবার সামনে উলঙ্গ করত এবং

মেয়েদের বিবস্ত্রা হতে বাধ্য করত। পুণার প্লেগ-অফিসার জনৈক মিঃ র‍্যাণ্ডের অত্যাচারের মাত্রা আর সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছিল। তিলক এই অশালীন, বর্বরোচিত উৎপীড়নের প্রতিকার বিধানের জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানালেন। ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন পুণায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষাটতম রাজ্যাভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। অনুষ্ঠানের শেষে রাত সাড়ে এগারোটায় মিঃ র‍্যাণ্ড যখন গাড়ি করে ফিরছিলেন তখন তাঁকে ও তাঁর সঙ্গী অপর একজন ইংরেজ মিঃ আয়ার্স্টকে গুলি করে মারা হয়। গুলি করেছিলেন মারাঠী যুবক দামোদর চাপেকার—তাঁর দুই ভাই, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেও চাপেকার এবং মহাদেব বিনায়ক বাণাডে নামে আর একজন যুবক ছিলেন তাঁর সঙ্গী। তাঁদের লক্ষ্যভেদী গুলি ভারতের বুকে নতুন বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়ে গেল। ১৮৯৭ সালে নব পর্যায়ে ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রাম স্ফুরিত হয়ে উঠল। সুভাষের বয়স যেদিন ছয় মাস পূর্ণ হল ঠিক সেই ২৩শে জুন সকাল বেলা অত্যাচারী ইংরেজ অফিসার র‍্যাণ্ড গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সুভাষের অস্ফুট চেতনায় চাপেকার ভ্রাতাদের আত্মত্যাগের কোনো অনুরণন জাগা সেদিন সম্ভব ছিল না সত্য—কিন্তু ভাবতে শহীদদের আত্মত্যাগের নব পর্বের সেই তো সবে সুরু। সুভাষ এই পর্বেরই জাতক।

গুপ্ত সমিতি। দামোদর হরি চাপেকার ও তাঁর সঙ্গীরা হঠাৎ একদিনের আক্রোশ বশে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টকে গুলি করেননি—এর পিছনে তাঁদের বহুদিনের ভাবনা ও প্রস্তুতি ছিল। দামোদরের বাবা ছেলেদের নিয়ে কীর্তন করে বেড়াতেন, সেই ছিল তাঁর পেশা। ১৮৯৫ সালে দামোদর ও তাঁর ভাই বালকৃষ্ণ পুণায় "হিন্দু ধর্মের প্রতিবন্ধক অপসারণ সমিতি" নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের সামরিক শিক্ষা দান করে ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াবার একটা উপায় করা। শিবাজী

উৎসবে তিলক বলেছিলেন : “ভগবান কৃষ্ণ গীতায় আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যে আমাদের গুরু ও স্বজনবৃন্দকেও আমরা হত্যা করতে পারি। যদি সেই হত্যার পিছনে কোনো স্বার্থবুদ্ধি না থাকে তবে হত্যার পাপ আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। শিবাজী নিজের উদর পূরণের চিন্তা থেকে কিছু করেন নি। তিনি জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য আফজল খাঁকে হত্যা করে প্রশংসার কাজই করেছেন।....শিবাজী আমাদের জন্মভূমি থেকে ম্লেচ্ছদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন, কোনপ্রকার স্বার্থ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। কুয়োর ব্যাঙের মতো নিজেদের দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ কোরোনা। ইংরেজের পেনাল কোডের (দণ্ড বিধি) প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশুদ্ধ চেতনার লোকে উত্তীর্ণ হও। মহাপুরুষরা যা করে গেছেন সেই কথা ভাব।” (১২ই জুনের বক্তৃতা)

ঐ শিবাজী উৎসবেই বালকৃষ্ণ স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, যার মর্ম ছিল এই :

শোনো ! আমরা জাতীয় যুদ্ধে রণক্ষেত্রে আমাদের জীবন দেব। যারা আমাদের ধর্ম নাশ করতে এসেছে সেই শত্রুদের রক্তে বসুন্ধরাকে আমরা স্নান করাব। আমরা মেরে তবে মরব।

যেমন কথা, তেমনি কাজ। দামোদর, বালকৃষ্ণ, বাসুদেও— তিন ভাইয়েরই ফাঁসি হয়েছিল। তারাই স্বদেশী যুগের প্রথম শহীদ।

সরলা দেবী। মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির ধারাকে বাংলায় প্রথম নিয়ে এসেছিলেন সরলা দেবী (১৮৭৩-১৯৪৫)। সরলা দেবী ঠাকুর-বাড়ির মেয়ে,—তার মা স্বর্ণকুমারী দেবী ও বাবা জানকীনাথ ঘোষাল। মামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বম্বে থাকতেন—সরলাদেবী বেড়াতে তাঁর কাছে গিয়ে মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী কার্যধারায় মুগ্ধ হন। তিনি বাংলায় ফিরে এসে ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্রের সঙ্গে একত্রে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অনুশীলন সমিতি। অনুশীলন সমিতির প্রথম সূত্রপাত ঘটে ১৮৯৭ সালে। ব্যারিস্টার পি. মিত্রের বাড়ি ছিল নৈহাটিতে। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রেরও পৈতৃক নিবাস। বঙ্কিমই পি. মিত্রকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। বঙ্কিমের প্রচারিত অনুশীলন তত্ত্বের চর্চার উদ্দেশ্যে পি. মিত্র একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তারই নাম হয় অনুশীলন সমিতি। সুভাষচন্দ্রের জন্মের বছরেই বাংলায় প্রথম বৈপ্লবিক সমিতির গোড়াপত্তন ঘটেছিল—ঘটনার এই যোগাযোগ লক্ষ্যণীয়। বাঙালীর চেতনা কোন দিকে বাঁক নিচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসেও কোন নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটছে তা অনুশীলন সমিতির সূচনা থেকেই বোঝা যায়—সুভাষচন্দ্রের জীবন এই নতুন চেতনার উন্মেষ ও এই নতুন শক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে প্রথমাবধি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

১৮৯৮ সাল। সুভাষের বয়স এক বছর পূর্ণ হল। এই এক বছরে বসু পরিবারে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা যায়নি। এক বছরের শিশুর জীবনেও বিশেষ কোনো ঘটনা থাকা সম্ভব নয়। তবে স্বাভাবিক নিয়মে শিশু এসময়ে হাঁটতে শেখে, মাতৃভাষায় দু একটি শব্দ উচ্চারণ করতেও শেখে। দ্বিতীয় বছরে শিশুর পক্ষে মাতৃভাষা অনেক পরিমাণে আয়ত্ত হয়ে আসে। তার বোঝার ও ধারণা করার ক্ষমতাও বাড়ে। পরিবেশ থেকে কিছু কিছু ভাবধারা ও সংস্কার সে আহরণ করতেও শেখে। বিশেষত পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব শিশুর মনে এই সময় থেকেই বিস্তৃত হতে সুরু হয়। এই সময়ে পরিবারের লোকজন, পশুপাখি প্রভৃতির সঙ্গে তার পরিচয় গড়ে ওঠে। সুভাষের জীবনে এই সব জিনিস স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছিল—এছাড়া আর কোনো অস্বাভাবিক বা অত্যাশ্চর্য ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে আমরা শুনতে পাইনা।

নিবেদিতা। বাংলার ও ভারতের জাতীয় জীবনে এই বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ২৮শে জানুয়ারি তারিখে মিস মার্গারেট

নোবল ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন। এই তাঁর প্রথম ভারত আগমন। ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে এক জনসভা আহ্বান করে স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালীর নিকট মিস নোবলকে পরিচয় করিয়ে দেন। ২৫শে মার্চ স্বামীজী মিস নোবলকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেন ও তাঁর নামকরণ করেন নিবেদিতা—স্বামীজীর আদর্শের বেদীতে আত্মনিবেদিতা। তাবপব নিবেদিতাকে কলকাতায় রেখে স্বামীজী বিশ্রাম লাভের জন্য দার্জিলিঙ চলে যান। ইতিমধ্যে কলকাতায় দেখা দেয় প্লেগ মহামারীরূপে। নিবেদিতা সেই প্লেগের মধ্যে কলকাতাবাসীর সেবায় প্রাণ তুচ্ছ করে আত্মনিয়োগ করেন—নিবেদিতার সেই সেবাময়ী রূপের তুলনা ভারতবর্ষে পূর্বে বা পরে সহজে কেউ দেখেনি। এই সেবার মাধ্যমে নিবেদিতা দেশবাসীর অন্তরে স্থান লাভ করেছিলেন। প্লেগের সেবার জন্য টাকার প্রয়োজন হওয়ায় স্বামীজী সরাসরি বলেছিলেন: I will sell the Math tomorrow. অর্থাৎ সদ্য প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠটিকে আমি কালই বিক্রী করে দেব। গুরুর এই সর্বস্ব ত্যাগের আদর্শ শিষ্যা বুঝলেন ও হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করলেন। কার্যক্ষেত্রে তার পরিণাম কীভাবে ফুটে উঠেছিল তা আমরা পরে দেখব। তবে এই একই আদর্শ সুভাষও গ্রহণ ও বরণ করেছিলেন:—১৮৯৮ সালের কলকাতার প্লেগ, নিবেদিতার সেবা ও স্বামীজীর উক্তির তাৎপর্য সুভাষের জীবন প্রসঙ্গে তাই অবশ্যই স্মরণীয়।

স্বামীজীর আর একটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই বছরেই স্বামীজী সশিষ্য অমরনাথ প্রভৃতি দর্শনে যান। পথে আলমোড়ায় একজন ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় কী? স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন অত্যাচারীকে মারো:

The Swami turned on him in surprised indignation. "Why thrash the strong, of course!"—he said.

"You forget your own part in this karma. Yours is always the right to rebel!" (The Master As I saw Him, p. 152)

এ কোনো সনাতন বেদান্তবাদীর উক্তি নয়; ভারতের নবযুগের নতুন জাতীয় নেতার উক্তি। এই হচ্ছে পরাধীন ভারতের জাতীয় নীতি—যা সুভাষ আবাল্য অনুসরণ করেছেন ও ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই নীতি অনুসরণ করতে তিনি চেয়েছিলেন বলেই ইংরেজ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু মনে করত এবং গান্ধীবাদী গোষ্ঠী তাঁকে আদৌ সহ্য করতে পারত না। স্বামীজীর নির্দেশ,—হে অত্যাচারিত, মনে রেখো চিরন্তন বিদ্রোহী হওয়াই তোমার কাজ;—আমেরিকাতে উচ্চারিত হলেও কথাগুলি যেন বাতাসে ভর করে কটকে এসে পৌঁছেছিল তার সুভাষের শ্বাসে প্রশ্বাসে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁর সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে, তাঁর ধমনীতে রক্ত প্রবাহের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সুভাষ তাই পরে বলেছিলেন, চিন্তারা পায়ে হাঁটে, কোনো চিন্তাই তাই বৃথা যায় না।— স্বামীজীর কথাকে প্রশ্নকর্তা ভদ্রলোক কীভাবে নিয়েছিলেন জানিনা, কিন্তু তাঁর চিন্তা বৃথা যায়নি নিশ্চয়ই!

তিলক। র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট হত্যার পক্ষে উস্কানিদাতারূপে তিলককে ঐ হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বিচারে তাঁর দেড় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ লিখেছেনঃ "বাংলার লোক তিলকের বিপদে আপনাদিগকে বিপন্ন মনে করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে ব্যবহারজীবী পাঠাইয়াছিল—রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সে কার্যে অগ্রণী ছিলেন। মোকদ্দমার পূর্বে শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে তিলক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা যেন আমরা কখন বিস্মৃত না হই—'লোকের কাছে আমার প্রভাব ও সম্ভ্রম আমার চরিত্রের উপর নির্ভর করে। আমি যদি অভিযোগে ভয় পাই, তবে আমার পক্ষে

(দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারাইয়া) মহারাষ্ট্রবাসে ও আন্দামানবাসে প্রভেদ থাকিতে পারে না। আমি কাঁচা কাজ করিব না। আমরা দেশের লোকের সেবক, সঙ্কট-সময়ে শোচনীয় ভীরুতা দেখাইয়া তাহাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিব না।" (কংগ্রেস, পৃঃ ৭৩-৭৪)

এই হচ্ছে নবজাগ্রত ভারতের একজন যোগ্য নেতার উক্তি। কী মনোভাব দেশে সে সময়ে দেখা দিচ্ছে তারও প্রমাণ মিলবে এই উক্তিতে। তিলক যে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আদৌ জড়িত ছিলেননা, মিথ্যা অভিযোগে সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য জেলে গেলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর মনে কোনো অনুশোচনা বা সন্তাপ ছিলনা—সরকারের সঙ্গে আপসে এসে মুক্তি ক্রয়ও তিনি করেননি। সুভাষের কৈশোরে তিলক সমগ্র ভারতের কাছে একটা বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন—আপসহীন আদর্শবাদের দৃষ্টান্ত। বাংলা দেশ তিলকের এই আত্মত্যাগ ও সংগ্রামী মনোভাবকে কীভাবে দেখেছিল হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সেকথাও লিখেছেন: "(অমরাবতী কংগ্রেসে) বাংলার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক প্রতিনিধিদের কথায় স্থির হয়, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে তিলকের নামোল্লেখ করিবেন এবং সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিলকের জয়ধ্বনি করিবেন। তাহাই হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বলেন "আমাদের মতে তিলকে ও পুণার সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের কারাদণ্ড বিধান করিয়া সরকার ভুল করিয়াছেন। আমার হৃদয় তিলকের প্রতি সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। তাঁহার জন্য সমগ্র জাতি আজি অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।"—(কংগ্রেস, পৃঃ ৭৫-৭৬)।

বাংলার তরুণরা তিলককে আদর্শের প্রতিমূর্তি বলে সেদিন গ্রহণ করেছিল। তিলককে অবশ্য পুরো দেড় বছর কারাবাস ভুগতে হয়নি। ম্যাক্সমূলার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন এই মর্মে যে তিলককে জেলে রাখলে শুধু একজন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয় না, পরন্তু সমগ্র মানবজাতির ক্ষতি করা

হয়। তিলকের কাছে প্রস্তাব আসে যে ক্ষমা চাইলে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। তিনি ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই ১৮৯৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেছি, তিনি তখন ভারতের প্রথম সারির একজন নেতা। ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনে তিনি কংগ্রেসের সভাপতিও হয়ে গেছেন। কিন্তু সুভাষের জীবনে প্রকৃতই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে ব্যক্তি সেই দেশবন্ধু তখনো দেশের নিকট পরিচিতি লাভ করেননি। তিনি তখন কলকাতা হাইকোর্টের পসারহীন ব্যারিস্টার ও কবিযশঃ প্রার্থী যুবক। ১৮৯৮ সালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আটাশ বছর। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন সেখানে স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের তিনি নেতৃত্ব করতেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। তিনি নিয়মিত দেশপ্রেম-মূলক বক্তৃতা দিতেন এবং চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ শ্রোতা। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে তিনি সেই অল্প বয়সেই দীক্ষিত হয়েছিলেন। ১৮৯০ সালে বি. এ. পাশ করে তিনি পিতৃ-আজ্ঞায় গিয়েছিলেন বিলেতে— আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে। কিন্তু ইংলণ্ডে লেখাপড়ার চেয়ে রাজনীতিই একটু বেশি মাত্রায় করেছিলেন তিনি। জেমস ম্যাকলীনের ভারত-কুৎসার জবাবে তিনি গ্ল্যাডস্টোনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওল্ডহ্যামের একটি সভায় বক্তৃতা করেছিলেন এই মর্মে যে ইংলণ্ড ভারতে যে তরবারির নীতি চালাতে চায় তা অন্যায় ও অবাস্তব। দাদাভাই নৌরজী ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের (হাউস অফ কমন্স) সভ্যপদের জন্য নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন এই সময় লর্ড সলিসবেরির বিরুদ্ধে। দাদাভাইয়ের নির্বাচনী প্রচার-অভিযানের বিশেষ দায়িত্ব নিয়েছিলেন তরুণ চিত্তরঞ্জন,—তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতা

শ্রোতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে, দাদাভাইও জয়লাভ করেন। রাজনৈতিক কারণেই হোক আর লেখাপড়ায় অবহেলার দরুণই হোক, চিত্তরঞ্জন আই. সি. এস. পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেননি। মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ভারতে ফিরেছিলেন তিনি ১৮৯৩ সালে (কিংবা ১৮৯৪ ?)। দেশে ফিরেই তিনি কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়েছিলেন—প্রথম পাঁচ বছর সেখানে ভাগ্যোদয়ের কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি। চিত্তরঞ্জন ছিলেন ব্রাহ্ম—কারণ তাঁর বাবাও ছিলেন ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মমতে ১৮৯৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি বিবাহ করেছিলেন আসামের বিজনী এস্টেটের দেওয়ান বরদানাথ হালদারের কন্যা বাসন্তী দেবীকে। সুভাষচন্দ্রের জীবনে যেমন চিত্তরঞ্জনের স্থান অনেকখানি, বাসন্তী দেবীকেও তিনি তেমনি মাতৃজ্ঞানে ভক্তির আসনে বসিয়েছিলেন। বিবাহের রাত্রেই চিত্তরঞ্জন বাসন্তীদেবীকে বলেছিলেন যে ব্রাহ্মমতে তাঁর সমর্থন নেই, তিনি হিন্দুই হতে চান। আসলে তিনি সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠতে চাইছিলেন। ১৮৯৫ সালে 'মালঞ্চ' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থে ৫৩টি কবিতা ছিল, প্রতিটি কবিতাই স্বরচিত এবং কয়েকটি নিশ্চিতভাবে রসোত্তীর্ণ,—যেমন প্রেম, স্বপ্ন, দিবসে, প্রেম-চতুষ্টয় ইত্যাদি। কিন্তু ১৮৯৮ সালে এসেও দেখি কি আইন ব্যবসায়ে কি সাহিত্য কৃতির ক্ষেত্রে কোথাও তিনি প্রতিষ্ঠা পাননি। আমাদের আলোচ্য কাল পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন অখ্যাত ও অসফল রয়ে গিয়েছিলেন।

বিপিন পালও এ সময় পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি—যদিও তাঁর জীবনটি বহু বিচিত্র পথগামী হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য বছরে তিনি এদেশে ছিলেনও না, গিয়েছিলেন ইংলণ্ডে। তাঁর জন্ম হয় ১৮৫৮ সালে ৬ই নভেম্বর, সিলেটে। পিতা রামচন্দ্র পাল, মা নারায়ণী দেবী। সতেরো বছর বয়সে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে বিপিনচন্দ্র কলকাতায় আসেন কলেজে পড়তে এবং তিন

বছর কলকাতায় তিনি লেখাপড়া করেছিলেন। তিনি সে যুগের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, যেমন সুরেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবগোপাল মিত্র ; প্রধান প্রধান ঘটনা, যেমন হিন্দুমেলা, কংগ্রেসের অধিবেশন, ব্রাহ্ম সমাজ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ ব্যাপারে তাঁর পিতার সঙ্গে তীব্র মতভেদ হয় এবং পিতা তাঁকে ত্যজ্যপুত্ররূপে ঘোষণা করেন। লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে চাকরি করতে চলে যেতে হয় — ১৮৭৯ সালে কটকে এক স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষকরূপে যোগ দেন। দশ এগারো মাস শিক্ষকতা করার পর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় চাকরি ত্যাগ করে তিনি চলে আসেন। ১৮৮০ সালে স্বদেশ সিলেটে যেয়ে তিনি জাতীয় স্কুলে শিক্ষকতা ও "পরিদর্শক" নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। ১৮৮১ সালে সেসব কাজ ছেড়ে দিয়ে মহীশূরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে তিনি চলে যান। ১৮৮১ সালেই আবার সে চাকরি ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত The Bengal Public Opinion-এ সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন ও 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী' ইত্যাদি তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলিতে লিখতে থাকেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতার আহ্বানে ১৮৮৬ সালে তিনি এসব ছেড়ে চলে যান স্বগ্রামে। পিতার মৃত্যু ঘটল অনতিবিলম্বে, তিনি সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে কলকাতায় চলে এলেন ও সে বছরই কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দেন সিলেটের প্রতিনিধিরূপে। ১৮৮৭ সালে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একখানি জীবনী লেখেন অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে—ইংরেজের শ্রেষ্ঠতা ও ইংরেজ রাজত্বের শুভফলে তখন তাঁর বিশ্বাস ছিল তাঁর সমকালীনদের মতোই অটুট। সেই বৎসরই তিনি লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সাব-এডিটর হয়ে লাহোর যান। পত্রিকাটি প্রতি সপ্তাহে তিনবার বেরোত। কিন্তু কয়েক মাস কাজের

পর ১৮৮৭ সালেই 'ট্রিবিউনের' কাজে তিনি ইস্তফা দেন। সে বছর কংগ্রেসের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন বসেছিল মাদ্রাজে—বিপিনচন্দ্র সেখানে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার একজন প্রতিনিধিরূপে এবং এই অধিবেশনে তিনি খানিকটা নেতৃত্ব করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, কোন চাকরিই বেশিদিন তিনি করতে পারেননি, প্রতি ক্ষেত্রেই মতভেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এবং তারপর মানিয়ে চলার বদলে সোজাসুজি পদত্যাগ করেছেন, পত্নী ও সন্তানদের নিয়ে অনিশ্চিতের মাঝে বারবার দাঁড়াতে তিনি ইতস্তত করেননি। এটা তাঁর স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্য, আর নিজেই সেই বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন :

Freedom in the sense of revolt against restraint was an inherited instinct in me.

—Memoirs of My Life and Times, vol, 1 p. 295

অর্থাৎ, বাধা, সংযম ও দমনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—এই অর্থে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে একটা সহজাত প্রবৃত্তিরূপে উত্তরাধিকার সূত্রে আমি পেয়েছিলাম। কলকাতায় বিপিনচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা নেন, এবং তারপর ১৮৯৫ সালে চাকরি গ্রহণের সঙ্কল্প মাত্রই তিনি ত্যাগ করেন। ঈশ্বর সেবাই হয় তাঁর জীবনের ব্রত এবং এজন্য তিনি আকাশবৃত্তি অবলম্বন করেন। আকাশবৃত্তি সাধকদের জীবনে একটা সুপরিচিত জিনিস : এর অর্থ হচ্ছে জীবিকা অর্জনের জন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন না করা, কোন চেষ্টা না করা, কারও কাছে কিছু যাচ্ঞা না করা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা আসবে তাই হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে। আকাশবৃত্তির তাৎপর্য হচ্ছে জীবনের স্থূল জৈবিক, প্রাথমিক প্রয়োজনের ব্যাপারেও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর-নির্ভর হয়ে থাকা। বিপিনচন্দ্র যে পরিণত যৌবনে (তখন তাঁর সাঁইত্রিশ বছর বয়স) স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে জীবিকা অর্জনের প্রয়াস একেবারে ছেড়ে দিয়ে অনন্যভাবে ঈশ্বর-নির্ভর হলেন এতে

তাঁর যেমন জ্বলন্ত ঈশ্বর বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর অটুট মনোবল ও দৃঢ় চিন্তারও নিদর্শন মেলে। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য বছরে তিনি ইংলণ্ড গিয়েছিলেন সেখানকার আমন্ত্রণে ও ব্রাহ্মদের উদ্যোগে। আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় সেখানেই ঘটেছিল।

অরবিন্দ ঘোষের চিন্তাধারা সুভাষচন্দ্রকে এক সময়ে আকৃষ্ট করেছিল। সুভাষ তখন কলকাতার কলেজে একজন ছাত্র আর অরবিন্দ রাজনীতি ত্যাগ করে পণ্ডিচেরির যোগাশ্রমে আত্মমগ্ন। ১৮৯৮ সালে কিন্তু অরবিন্দও ভারতবর্ষে পরিচিত হননি। তাঁর জন্ম ১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট। ১৮৭৯ সালে সাত বছর বয়সে অরবিন্দ বিলাত গিয়েছিলেন—পাশ্চাত্য বিদ্যায়, বিশেষত সাহিত্যে সেখানে তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি জন্মে। দাদাভাই নৌরজীর নির্বাচন উপলক্ষে তিনিও চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে একত্রে প্রচারকার্যে যোগ দিয়েছিলেন—সেই সময়ই এই দুই তরুণের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। অরবিন্দ কেম্ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের মজলিশে ভারতেব পরাধীনতা সম্পর্কে উত্তেজনাময় ভাষণ দিতেন ও Lotus and Dagger নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল ভাবত থেকে ইংরেজদের সশস্ত্র উপায়ে তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন কবা। আই. সি. এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছা করে ঘোড়ায় চডাব পবীক্ষা না দেওয়ায় তিনি সিভিলিয়ান হননি—তাব বদলে একুশ বছর বয়সে বরোদার রাজা গায়কোয়াড়ের শিক্ষক ও প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি নিয়ে দীর্ঘ চোদ্দো বছর বাদে তিনি স্বদেশে, বরোদায় ফিরে আসেন। পরের বছর ১৮৯৩ সালে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ভারতের রাজনীতি বিষয়ে তিনি এগারোটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যাতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ খুব চঞ্চল, ক্ষুব্ধ ও ভীত হয়ে পড়েন। পরে যথাস্থানে এই বিপ্লববাদী প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। পরে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও তিনি সাতটি অসাধারণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৯৫ সালে

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Songs to Myrtilla প্রকাশিত হয়—অরবিন্দ একাধারে ছিলেন কবি, জাতীয়তাবাদী ও রাজনীতিজ্ঞ। কিন্তু ১৮৯৮ সালেও বরোদার শিক্ষক জীবনের অন্তরালে নিভৃতবাসে তিনি গোপন আত্মপ্রস্তুতি করে চলেছিলেন—প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মে যোগ দেননি, সাহিত্য ক্ষেত্রেও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হননি। বরং দীনেন্দ্র কুমার রায়কে নিয়ে যেয়ে তাঁর কাছে বাংলা শিখছিলেন। বছরে একবার করে তিনি কলকাতায় আসতেন। দেওঘরে মাতামহ বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করতেও যেতেন। তিনি দেশের পবিচয় লাভে তখন উদগ্রীব ও উদ্যোগী, কিন্তু দেশ তাঁর পরিচয় তখনো ভালোভাবে পায়নি। এক তিলক ছাড়া দেশ আর কোনো সংগ্রামী নেতার সন্ধান তখনো পায়নি—সুরেন্দ্রনাথ-গোখেল-ফিরোজশা মেহতা ইত্যাদি আবেদনপন্থী নেতাদেব আসরই তখন জমজমাট। সুভাষের দ্বিতীয় বছব বয়সে এই ছিল দেশেব অবস্থা।

১৮৯৯। সুভাষ এই বছব তিন বৎসব বয়সে পদার্পণ কবলেন। তাঁব পারিবাবিক ডাকনাম ছিল সুবি। এই সময়ে তাঁব পরের বোন মলিনার জন্ম হয়ে গেছে--বাড়িতে আবও একটি নতুন শিশুর আবির্ভাব ঘটেছে। সুভাষেব চেতনাব উন্মেষ ঘটছে—তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলিও একটি দুটি করে ফুটে উঠছে। লাজুক, মুখচোরা, স্পর্শকাতর শিশু। খিদে পেলেও কাউকে বলেনা, কাঁদেনা, সবার দৃষ্টির আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে। একটি আঙুল মুখে দিয়ে চোষে। বিশেষ করে সারদাই তাকে নজরে রাখে, আঙুল মুখে দেখলেই বোঝে সুবির খিদে পেয়েছে। নিজের খাবার থেকে পিঁপড়েদের খেতে দেয় সুবি—তারা যখন সার বেঁধে খাদ্য কণা মুখে নিয়ে তৃপ্ত মুখে যায়, সুভাষও প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে। ঐ তার একটা শখ, ওতে তার বিমল আনন্দ। 'এই বৃহৎ পরিবার, নানা লোকজন, পশুপাখি ইত্যাদির মধ্যে আমি একা'—এই বোধ তার মনে ক্রমে ক্রমে অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে। তাতে তার হৃদয়ে ব্যথা

জন্মে,—তার প্রতি পিতামাতাব স্নেহেব প্রকাশ দেখার তৃষ্ণা জাগে। শিশুর দিন এইভাবে কাটে।

কংগ্রেস। কংগ্রেসেব বাষিক অধিবেশন নিযমিত হত, প্রতিনিধিবাও ক্রমেই অধিক সংখ্যায় যোগদান কবতে যেতেন। কিন্তু কংগ্রেস যে নীতি নিযে তখন চলত তাতে দেশে কোনো জনজাগবণ আসা সম্ভব ছিল না, গণসম্পর্কও কংগ্রেসেব বিশেষ কিছু ছিল না। কংগ্রেস একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানও ছিল না। কংগ্রেস অধিবেশনে যেসব বক্তৃতা হত তাতে আবেদন-নিবেদনেব সুবই ছিল একমাত্র সুব—কোনো অন্যাযেব বলিষ্ঠ প্রতিবাদও প্রায শোনা যেত না। যেমন, আমাদেব আলোচ্য বছবে কংগ্রেসেব বাষিক অধিবেশন বসেছিল লক্ষ্ণৌ শহবে বমেশচন্দ্র দত্তেব সভাপতিত্বে। বমেশ দত্ত এদেশেব কৃষকদেব দুর্গতিব কথা বললেন, দুর্ভিক্ষ কেন এদেশে হয তাব কাবণ বিশ্লেষণ কবলেন, এদেশেব শিল্প ও বাণিজ্যেব ধ্বংস হবাব করুণ কাহিনীও বিবৃত কবলেন। কিন্তু সব কথাব শেষে তিনি প্রস্তাব কবলেন দুটি কথা: এক, কংগ্রেস সবসময়েই বৈধ বা আইনসম্মত পথে চলবে ও কোনোদিনই আইন ভঙ্গ কববে না। দুই, জরুবী অবস্থায কংগ্রেস বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পাববে। এই সব নীতি ও বক্তৃতা দেশেব ভিতব কোনো সাড়াই তুলত না, জাতিব চিত্তে কোনো আবেদনই বমেশ দত্তবা সৃষ্টি কবতে পাবতেন না। তিলক লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে উপস্থিত হযে বাংলাব অত্যাচাবী শাসক লর্ড স্যাণ্ডহার্স্টেব কুশাসনেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কবতে চেযেছিলেন। বমেশ দত্ত বলেন যে তিলক যদি তা কবতে চান তবে তিনি, অর্থাৎ মিঃ দত্ত, সভা ত্যাগ করে চলে যাবেন। মডাবেট পন্থীবা দত্তকে সমর্থন কবলেন ও সভায তিলককে তাঁব বক্তব্য পেশ কবতে দিলেন না। বমেশ দত্তেব বক্তৃতা পড়ে ভাবত সচিব লর্ড হ্যামিল্টন বলেছিলেন: Mr. dutt wished that government in India should be conducted by the people শুনে বমেশ

দত্ত আর থাকতে পারলেন না; সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালেন: Nowhere in my speech have I proposed to substitute the present from of Government in India by a system of Government by the people....I proposed the appointment of one Indian member in each provincial Executive Council. etc.

রমেশ দত্ত একা নন, কোনো কংগ্রেস নেতাই সে সময়ে জনসাধারণের ক্ষমতা বা অধিকারের কথা ভাবতেন না—যদিও তাদের অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের জন্য তাদের সহানুভূতি ছিল। সুভাষচন্দ্রের জীবন প্রসঙ্গে এই নরমপন্থী কংগ্রেস বা তার নেতাদের কথা আলোচনার সার্থকতা নেই—কেননা তিনি কোনোদিনই এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হননি। কাজেই ১৯০৫ সালের আগে কংগ্রেসের কথা আমরা আর আলোচনা করব না।

মহাত্মা গান্ধী। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তখনো মহাত্মারূপে পরিচিত হননি, ভারতের রাজনীতিতে কোনো ভূমিকাও তাঁর ছিলনা। বস্তুতঃ গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র প্রায় সম-সময়ে ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে শুরু করেছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তারা পরস্পরের বিরোধী, এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন। বয়সের বহু ব্যবধান সত্ত্বেও গান্ধী সুভাষকে প্রভাবাচ্ছন্ন করতে পারেননি, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুভাষের মতের কাছে তাঁকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষের উত্থাপিত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি গান্ধীজীর বিরোধিতার ফলে গৃহীত হতে পারেনি, কিন্তু পরের বছর গান্ধী নিজেই লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তোলেন ও তা পাশ হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় ইংরেজকে চরম আঘাত হানার যে প্রস্তাব সুভাষ দিয়েছিলেন ও যে প্রস্তাবের জন্যই গান্ধী ও তার অনুসারীদের সঙ্গে সুভাষের মতবিরোধ চরম আকারে দেখা দেয়, ১৯৪২ সালে যুদ্ধের

মধ্যে সেই প্রস্তাব মতেই গান্ধী ইংরেজকে চরম আঘাত হানার জন্য জাতিকে আহ্বান জানান Quit India এই রণধ্বনির মাধ্যমে। এসব ঐতিহাসিক তথ্য যথাস্থানে আমরা আলোচনার সুযোগ পাব। এখানে শুধু বক্তব্য এই যে সুভাষচন্দ্রের জীবনকথায় গান্ধী প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে আসবে—সুভাষের রাজনৈতিক জীবনের একটা প্রধান অংশে গান্ধী ছিলেন একটা বিরাট শক্তি, যাঁকে সুভাষ কখনো মান্য করেছেন, কখনো তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন—কিন্তু উপেক্ষা করতে পারেননি। এই কারণেই গান্ধীজীর কার্যধারার সংবাদ আমাদের মাঝে মাঝে নিতে হবে।

গান্ধীজীর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৯ সালে গুজরাটের এক বৈষ্ণব পরিবারে। পিতা করমর্চাদ গান্ধী, মা পুতলিবাই। ম্যাট্রিক পাশ করার পর ১৮৮৮ সালে তিনি ইংলণ্ডে পড়তে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ব্যারিস্টার হয়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন ১৮৯১ সালে। এখানে তাঁর পশার জমেনি। ১৮৯৩ সালে তিনি আইন ব্যবসা উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। সেখানেই ভারতীয়দের সমস্যা নিয়ে তিনি লড়তে সুরু করেন—এবং তাঁরই নেতৃত্বে ১৮৯৪ সালে নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৬ সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন, ভারতের সংবাদপত্র সম্পাদক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আফ্রিকার ভারতীয়-দের সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। বাংলায় এসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি—অমৃতবাজার পত্রিকা ও বঙ্গবাসীর সম্পাদকরাও দেননি। বাংলায় তাঁর পৃষ্ঠপোষণা করতে রাজি হয়েছিলেন কেবলমাত্র 'স্টেটসম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়। যোগাযোগটা লক্ষ্যণীয়। সে সময়ই কি গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর চিন্তা ও কর্মধারার স্বরূপ সম্পর্কে একটা সঠিক মূল্যায়ন করা ইংরেজ সম্পাদক-দ্বয়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল? নতুবা বাংলার দেশপ্রেমিকদের দ্বারা

প্রত্যাখ্যাত গান্ধীকে ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সম্পাদকরা সাগ্রহে আশ্রয় দিলেন কেন? আশ্চর্য এই, বাংলার রাজনীতি গান্ধীরও কোনোদিন পছন্দ হয়নি, বাংলাও তার রাজনীতিকে পছন্দ করেনি। বরং ইংরেজরা তাঁকে অনেক সময় সমর্থন করতে রাজি ছিল। গান্ধীর প্রথমবারের বাংলা আগমন কালেই নিয়তির ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল, এতেই অবাক লাগে। সেবারে দেশের বিভিন্ন স্থানে গান্ধী সভা করে বক্তৃতা করেছিলেন, কিন্তু বাংলায় সভা ডাকতেই তিনি সমর্থ হননি। কলকাতার অভিজ্ঞতার পরই গান্ধীকে আবার চলে যেতে হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। আমাদের আলোচ্য বছর ১৮৯৯ সালে গান্ধী ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত না হলেও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নেতা বলে শিক্ষিত শ্রেণীর নিকট স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের আন্দোলন সম্পর্কে প্রস্তাবও গৃহীত হত। ১৮৯৯ সালে বুয়র যুদ্ধ বাধলে তিনি ইংরেজের পক্ষে সৈন্য হিসাবে যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন. সে অনুমতি না পাওয়ায় সৈন্যদের সাহায্যার্থে একটি অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন করেছিলেন। সে সময়ে এমনই ছিল তাঁর বৃটিশ-ভক্তি। বয়স তাঁর তখন ত্রিশ।

নিবেদিতা। নিবেদিতা আগের বছর অর্থাৎ ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর কালীপূজার দিন তার বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—উদ্বোধন করে দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীসারদা দেবী। বর্তমান বছরে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতা পাশ্চাত্যে—প্রথম ইংলণ্ড, পরে আমেরিকা ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে গিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বালিকা-বিদ্যালয়টির জন্য অর্থ সংগ্রহ। এই উপলক্ষে পাশ্চাত্যে তাঁকে বক্তৃতাও দিতে হয়েছে ভারতের সমাজ-জীবন, নারীজাতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে। নিবেদিতা তখন থেকেই বহির্ভারতে ভারতের সাংস্কৃতিক দূতের কাজ করছিলেন—বিদেশে ভারতের আদর্শ ও প্রকৃত অবস্থার কথা প্রচারে নিবেদিতা ছিলেন

অক্লান্ত। সুভাষচন্দ্র পরবর্তী জীবনে নিবেদিতার কাজের এই ধারাটিকে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রচার কার্য উপলক্ষেই আমেরিকায় বিপিন পালের সঙ্গে নিবেদিতার সংঘর্ষও বেধেছিল—এবং বিপিন পালের জীবনের গতি পালটাবার পক্ষে সেও একটা কারণ। পাল মহাশয় তাঁর ব্রাহ্মসুলভ দৃষ্টিতে ভারতের জীবনধারার বহু দিক সম্পর্কে সমালোচনা করতেন, কিন্তু আমেরিকা থেকে তিনি ফিরে এসেছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে। সে কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিবেকানন্দের জীবনে এই সময়ে কিছুকাল ধরেই একটা পরিবর্তন ঘটছিল। ভারতের আসন্ন ভবিষ্যতের ইতিহাসের দিকে তাকালে বিবেকানন্দের ভাবসত্তার এই পরিবর্তন খুবই অর্থবহ মনে হয়। সুভাষচন্দ্রের জীবনের পক্ষেও এর গভীর তাৎপর্য আছে। স্বামীজী ছিলেন কঠোর বৈদান্তিক,—বিশ্বে বেদান্তের উদার বাণী তিনি প্রচার করেছেন। কিন্তু অমরনাথ ভ্রমণের সময় থেকে তাঁর মধ্যে শিব ও কালীর আবেশ যেন প্রবল ভাবে দেখা দেয়। ঐ ভ্রমণের পরেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা Kali The Mother. কলকাতায় ফিরে এসে তিনি বলেছিলেন "অমরনাথ থেকে ফেরবার সময় শিব আমার মাথায় ঢুকেছেন, কিছুতেই নাবছেন না।" এবারের কলকাতা থাকা কালে একদিন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সবান্ধব সখারাম গণেশ দেউস্কর। স্বামীজী তাঁদের সঙ্গে বেদান্তের কথা আলোচনা না করে দেশের আপামর দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র্যের সমস্যার কথাই আলোচনা করতে লাগলেন। দেউস্করের পাঞ্জাবী বন্ধু স্বামীজীর মুখে ধর্মালোচনা শুনতেই এসেছিলেন, এখন হতাশ হয়ে তাই বললেন, 'আজকের দিনটাই বৃথা গেল।' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর মুখের চেহারাই পালটে গেল, সিংহের মত গর্জে উঠে তিনি বললেন, "মহাশয়! যে পর্যন্ত আমার জন্মভূমির একটি কুকুর

পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাকে আহার প্রদানই আমার ধর্ম। এ ছাড়া আর যা কিছু—অধর্ম।”

সুভাষচন্দ্রের জীবনালোচনার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের এই অসাধারণ অনুভূতিগুলির কথা আপনিই এসে পড়ে। দিলীপকুমার রায়ের মতো কোনো কোনো অধ্যাত্মতত্ত্বগবেষক সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কে যে বক্রোক্তি করে থাকেন তাঁর ঠাকুর যেমন এতে মিলবে,—তেমনি সুভাষের জীবন-রহস্যকে বুঝবার পক্ষে এই হচ্ছে খাঁটি চাবিকাঠি।

স্বামীজীর মধ্যে কালী-ভাবের যে প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল এই সময়ে এবং যা তাঁর জীবনসায়াহ্ন পর্যন্ত বর্তমান ছিল—সুভাষচন্দ্রের জীবনের পক্ষে তার একটা তাৎপর্য ছিল। স্বামীজী বেদান্ত প্রচারাভিযানের শেষে কালী-তত্ত্বের দ্বারা আলোড়িত ও অভিভূত হয়েছিলেন। সুভাষ জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই কালীরই উপাসক। সুভাষচন্দ্রের জীবন ও কর্মকে কালী-উপাসনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়—কেন নয় সেকথা আমরা ঘটনা পরম্পরার মাধ্যমে যথাস্থানে জানার সুযোগ পাব। স্বামীজীর অনুভবের ক্ষেত্রে ও দৃষ্টিভঙ্গীতেও যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এই কারণে যে ভারতে, বিশেষত বাংলায় একটা নতুন বিপ্লববাদের আত্মপ্রকাশ ঠিক এই সূত্র ধরেই অবিলম্বে ঘটেছিল: বিপ্লবীরা ছিল বিবেকানন্দের ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও শক্তির উপাসক—কালীর ভক্ত, সুভাষ সেই ধারারই অনুসারী।

রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু। এই বছর রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু হয় দেওঘরে। ইনি ছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রাহ্মগণ যে হিন্দুধর্মের গৌরব নতুন করে আবিষ্কার করতে সুরু করেছিলেন ও নিজেদের হিন্দুত্বের অভিমানকে ফিরে পেতে ব্যগ্র হয়েছিলেন এই বর্ষীয়ান শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম নেতার জীবনই তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

১৯০০ সাল। সুভাষ চার বছরে পা দিলেন। এই বয়সে শিশু কথাবার্তা বলতে পুরোপুরি শিখে যায়, তার ফলে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে একটা বিন্যাস ও পারম্পর্য আসে। কতকগুলি ভাব তার মধ্যে নির্দিষ্ট আকার নিতে থাকে—তার প্রতিবিম্বন পড়ে তার গঠমান মানসে। শিশুর মনের গঠনে তার পরিবেশ এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যে শিশু পারিবারিক গণ্ডীকে অতিক্রম করে দেশের বৃহত্তর পরিবেশ থেকে তার মানস বিকাশের উপাদান সংগ্রহ করে, সে-ই কালে জাতীয় পটভূমিতে একটা ব্যাপ্ত ভূমিকা নিতে সমর্থ হয়। শিশু মনের বিকাশের অনেক রহস্যসূত্র তাই তার পরিবেশের আলোচনা থেকে পাওয়া যায়।

সুভাষের জনবহুল পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেও একটা নিঃসঙ্গতার ভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল—আগেই সেকথা বলেছি। পিতা মাতার সঙ্গ পাবার একটা বিশেষ সুযোগ আসত বিকাল বেলা, যখন ঘোড়ার গাড়িতে করে তাঁরা প্রতিদিন নিয়মিত বেড়াতে যেতেন। তাঁদের বাড়িটি ছিল ওড়িয়া বাজারে। নদীর ধারে তাঁরা যেতেন—সঙ্গে কোনো একটি ছেলে বা মেয়ে থাকত। প্রভাবতী দেবী গাড়ি থেকে নামতেন না, জানকীনাথ খানিকক্ষণ নদীতীরে পায়চারি করতেন। সুভাষ রোজই তাঁদের সঙ্গে যেতে পারতেন না, অন্য ভাই বোনদেরও সে সুযোগের ভাগ দিতে হত। সঙ্গে গেলেও পিতার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা দূরত্ব সব সময়ই থাকত। সেকালে পিতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে একটা ব্যবধান রক্ষা করাই ছিল রীতি: পিতা ছেলেমেয়েদের কাছে আনত হয়ে, নিবিড় হয়ে ধরা দিতেন না। ছেলেমেয়েদের ভয়, সমীহা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি; একটা নিঃসঙ্কোচ হৃদ্যতার মধ্যে পিতাপুত্রের মিলন সেকালে ছিল দুর্লভ ঘটনা। বিশেষত পুত্র যখন বালক ও কিশোর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সম্পর্কে আবদ্ধ হতে কোনো পিতাই তখন চাইতেন না।

সুভাষ বাবাকে দূর থেকে দেখতেন, ভয় বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় আচ্ছন্ন ছিল তাঁর দৃষ্টি,—সহজভাবে, সহজ সুরে বাবার কাছে এসে আবদার জানাবার মতো সুযোগ তাঁর ছিল না। সুভাষ চিরকাল মাতৃ-অনুরাগী বালক,—'মা'-শব্দটির আবেশ তাঁর জীবনে আর ঘুচল কবে?—কিন্তু তিনি মায়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহ কাকে বলে বালো তা জানার বেশি অবকাশ পাননি। মাকে নিবিড়ভাবে পাবার অভিজ্ঞতা তাঁর কমই হয়েছিল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ছিল সে বিষয়ে তীব্র। তাঁর জীবনের প্রথম স্মৃতি তাঁর নিজের স্নেহ-লিপ্সার অপূর্তির বিষাদে আচ্ছন্ন। আত্মজীবনীর প্রথম অধ্যায়েই তিনি লিখেছেনঃ "মনে পড়ে ছেলেবেলায় নিজেকে কি রকম যেন তুচ্ছ মনে হত। বাবা মাকে সাংঘাতিক ভয় করতাম। বাবা সাধারণত এমন গম্ভীর হয়ে থাকতেন যে আমরা কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষতেই সাহস পেতাম না। ....ছেলেবেলা থেকেই বাবা মাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করে এসেছি সত্যি, কিন্তু তবু তাঁদের সঙ্গ আরও ঘনিষ্ঠভাবে পাবার জন্য আমার মন আকুল হয়ে উঠেছে—এজন্যই যে সব ছেলেমেয়েকে তাদের সৌভাগ্যবশত তাদের বাবা মার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পেতে দেখেছি তাদের ঈর্ষা না করে থাকতে পারিনি। আমি স্পর্শকাতর, অভিমানী ও আবেগপ্রবণ ছিলাম, তাই মা বাবার এই আপাত নিস্পৃহতা আমাকে বেদনা দিয়েছে।"

পারিবারিক পরিবেশ যখন ছিল এমন তখন দেশের পরিবেশ কিন্তু সুভাষের চিত্তে ভিন্নতর আর এক বেদনাবোধ সঞ্চার করেছিল। সেও আর এক মাকে নিবিড়ভাবে পাবার জন্য উৎকণ্ঠা ও বেদনা। যুগের মর্মের মধ্যে সেই সুরটাই সেদিন প্রধানভাবে বাজছিল। বাঙালীর চিত্তাকাশে এই সুরকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বঙ্কিম।

বঙ্কিমচন্দ্র। বস্তুত সে সময়ে বাঙালী জাতির চেতনায় যেন একটা আমূল রূপান্তর—একটা বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ ঘটছিল। চেতনার এই বিপ্লবের মূলে ছিলেন—প্রধানভাবে দুজন পুরুষ—

বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ। দুজনই হিন্দু জাগরণের নেতা এবং নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা গুরু। দুজনের চিন্তাধারার মধ্যে এত মিল ছিল যে বিবেকানন্দ যুবকদের বঙ্কিমের রচনাবলী পাঠ করতে উপদেশ দিতেন ও আনন্দমঠের শিক্ষাধারাকে অনুসরণ করতে আহ্বানও জানাতেন। বাংলার সাধকরা যুগ যুগ ধরে ঈশ্বরের মাতৃরূপের কল্পনা ও ধ্যান করেছেন—রামকৃষ্ণ সেই আদর্শকেই নতুন, জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ করে দেশের সামনে পুনরায় উপস্থাপিত করেছিলেন। বঙ্কিম তাঁর এই অনন্যসাধারণ সমসাময়িকের মাতৃমন্ত্র গ্রহণ ও প্রচার করেছিলেন—কিন্তু সেই দিব্যজননীকে তিনি কল্পনা করেছিলেন দেশজননীরূপে। বাঙালী তাঁর কাছে শুনল যে দেশ-মাতৃকার আহ্বানই জীবনের শ্রেষ্ঠ আহ্বান। বঙ্কিম বাঙালীকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সে মন্ত্র সর্বত্যাগের মন্ত্র। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমের এই মাতৃপূজার ব্যাকুলতা ভাবমুখে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে: "আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা?...এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গ সঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রুবিমর্দিত বীরজন-কেশরী শত্রু-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি

দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগভূজা, নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।"

ইতিহাসের ধারায় বাংলা ও বাঙালী ডুবেছে, আবার ভেসেছে,—কিন্তু জাতির সেই উত্থান-পতনের অন্তরালে বঙ্কিমের ধ্যানদৃষ্টি আবিষ্কার করেছিল এক দেবীকে, যিনি জ্ঞানময়ী, শক্তিময়ী, ঐশ্বর্য-সৌন্দর্যময়ী,—কিন্তু তিনি মানবসম্পর্কবর্হিতা স্বর্গস্থিতা দেবী নন,—তিনি আমাদের মা, বাঙালীর জননী। জন্মভূমিকে জননীরূপে প্রত্যক্ষ করবার এই দৃষ্টি সেদিন আর কোনো বাঙালীর ছিল না, তাই সেই মায়ের জন্য বেদনা, ব্যাকুলতা ও আর্তিও ছিল অনুপস্থিত;—তাই বঙ্কিম নিজেকে সেদিন নিতান্ত একা বলে অনুভব করেছিলেন—কাল-সমুদ্রতীরে মাতৃ সন্ধানে আগত একা বঙ্কিম।

কিন্তু বঙ্কিমের হৃদয়শ্বাসে সমগ্র বাঙালী জাতির হৃদয় স্পন্দিত হত সেদিন,—বঙ্কিম নিজের তৃপ্তির জন্য নিভৃতে একাকী মাতৃ-বন্দনার মন্ত্র উচ্চারণ করেন নি। যেন তিনি ছিলেন সেদিন গোটা জাতির মন্ত্রদ্রষ্টা পুরোধা, পুরোহিত,—তাই জাতির হয়েই মাকে আহ্বান করেছিলেন তিনি:

"এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এককালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ...শক্তি দাও সন্তানে, অনন্ত শক্তি প্রদায়িণি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্যে কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান তাঁহার ভাবনা কি?"

বঙ্কিম জানতেন তাঁর মাতৃমন্ত্র তখনই সার্থক হবেনা, কারণ একটা সংজ্ঞাহীন জাতি এক লহমায় জাগ্রত হয় না। কিন্তু তিনি ইতিহাসের গতির গূঢ় রহস্যের নিশ্চিত পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই তাঁর উক্তি: "এ মূর্তি এখন দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব।"

এই গভীর প্রত্যয়ে সেদিন তিনি সমবেত মাতৃ আরাধনার জন্য সমগ্র বাঙালী জাতিকে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর সেই পরম গম্ভীর আহ্বানধ্বনি শতাব্দীর পারে আজও যেন আমাদের কাণে বাজে: "এস, ভাই সকল! আমরা ঐ অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে —চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরে, ১৯০০ সালে, বঙ্কিমের আহ্বানকে ব্যর্থ মনে করার কোনো কারণ ছিলনা। কেননা বাঙালীর অন্তরে সে আহ্বান প্রবিষ্ট হয়ে অনুরণন তুলতে সুরু করেছে তখন— পি মিত্র ও সরলা দেবীর প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব তারই প্রমাণ। বঙ্কিমের স্বপ্ন তখন বাস্তবে রূপ নিয়ে দাঁড়াবার প্রতীক্ষায়। সুভাষচন্দ্রের মানসিক গঠনপর্ব তখন সুরু হয়ে গেছে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই, ১৯০৫ সাল ও তার পরের কয়েকটি বছরে বাংলা দেশে বাঙালীর মাতৃপূজার বড় ধুম লেগেছিল। কালস্রোত মধ্য হতে বঙ্গ-জননীর হিরণ্ময়ী মূর্তিকে কোটি কোটি বাহুতে উদ্ধার করে বাঙালী জাতি সেই মূর্তিকে মাথায় বয়ে গৃহে সত্যই এনেছিল। মায়ের অখণ্ড পূজামণ্ডপ নির্মিত হয়ে ধূপ দীপ নৈবেদ্য উপচারে সত্যই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল! সুভাষের চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ

ঘটেছিল মাতৃমন্দিরের সেই পূত আবহাওয়ায়। তাঁর বাবা ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারের বিরোধী তিনি ছিলেন না, জাতির নবযুগের সাধনার পরিপন্থীও তিনি ছিলেন না। আর সুভাষের মা! বাঙালী ঘরের কোনো মা-ই কি কোনোদিন দেশজননীর প্রাণস্পন্দন থেকে ভিন্ন হতে শিখেছেন? সুভাষ তাঁর আপন মাকে ভালোবেসেই দেশমাতৃকাকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন—সকল বাঙালীই তাই শেখে। বাঙালী জীবনের কেন্দ্রে এই মায়েরই অধিষ্ঠান, তাই বঙ্কিমের আক্ষেপ: "মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?" সবকালের বাঙালীর পক্ষেই শাশ্বত সত্য। সুভাষচন্দ্র যখন প্রথম চেতনার উন্মেষে জগৎ সংসারের সংবাদ পেতে সুরু করেছিলেন তখন তাঁর গৃহের একান্ত ভারতীয় তথা বাঙালী জনোচিত পরিবেশে বাঙালীর নতুন মাতৃ আরাধনার ভাবতরঙ্গ অবাধে এসে পৌঁছেছিল,—সুভাষের ভিতর দেশপ্রেম তাই স্বাভাবিক ভাবেই সঞ্চিত হয়ে উঠছিল।

বাংলায় উনিশ শতকের অন্তিম বছরে যদি জাতির মানসিক রূপটার দিকে তাকাই তাহলে দেখব বঙ্কিমের ভাবনা জাতিকে আচ্ছন্ন করতে সুরু করেছে। তার কোনো উক্তি বা ইঙ্গিতই বৃথা যায়নি তার নির্দেশের সূত্র ধরেই দেশ চলার পথ খুঁজে নিতে তখন উৎসুক। একদিন বঙ্কিম রহস্যচ্ছলে বাঙালী চরিত্রের নানা দুর্বলতা ও অসঙ্গতির উপর আলোকপাত করেছিলেন, তারপর রহস্যের মধ্যে গম্ভীর সুর এনে জীবনের গভীর সমস্যাগুলি নিয়ে তিনি আলোচনা করতে বসেছিলেন। তিনি বাঙালীর চরিত্র ও মন গঠনের দায়িত্বও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ঘটানোর জন্য তিনি যেমন উদ্যোগী হয়েছিলেন, তেমনি বাঙালীর ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দেশ পরিচয় ও বিশ্ব পরিচয়ের জন্যও উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। বঙ্কিম বাংলার নবজাগরণকে একটা দার্শনিক ভিত্তি দান করেছিলেন—তাঁর শেষ বয়সে তাই একান্তভাবে

ধর্ম ও দর্শন তত্ত্বের আলোচনায় তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। বঙ্কিম তাঁর জীবনে একটা নতুন ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন-— কিন্তু তার চেয়েও তাঁর বড় কীর্তি এই যে তিনি একটা জাতিকেও সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন; এই দেশের জনগণের মধ্যে লুপ্ত সম্বিৎ ফিরিয়ে এনে দিয়ে, জাতীয় সত্তার বোধে তাদের উদ্দীপিত করে ও জাতীয় মুক্তির পথ-নির্দেশ দান করে তিনি এই জাতির জন্মান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই নব জাগ্রত, নবসৃষ্ট বাঙালী জাতিকে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করতেও পরামর্শ দিয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে বিদ্রোহের একটা বাস্তব পথ ও উপায়ও তিনি অঙ্কিত করেছিলেন— বাঙালীর নিকট সেই আবেদন ব্যর্থ হয়নি!

বঙ্কিমের মৃত্যুর পর সুভাষের জন্ম,—কিন্তু প্রকৃত অর্থে বঙ্কিম-যুগের আরম্ভ ঐ সময় থেকেই। 'আনন্দমঠে'র উপক্রমণিকায় বঙ্কিম যে ইঙ্গিত রেখেছিলেন, বাংলার দেশমাতৃকার পূজারীরা সে আদেশকে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন ১৯০০ সালের পর থেকেই। আনন্দমঠের দেশমুক্তির সাধকের প্রশ্ন ছিল: "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবেনা?" এই প্রশ্নের উত্তরে সাধক জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন: "তোমার পণ কি?" সাধকের উত্তর ছিল: "পণ আমার জীবন সর্বস্ব।" প্রতিশব্দ হল: "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" সাধক জানতে চাইলেন: "আর কি আছে? আর কি দিব?" দৈববাণী ধ্বনিত হয়েছিল: "ভক্তি।"

বাংলার জাতীয় ও রাষ্ট্রজীবনের ক্ষেত্রে বহু সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁদের জীবনজিজ্ঞাসার সঙ্গে বঙ্কিমের এই উপলব্ধি মিলে গিয়েছিল। তাঁরা অকাতরে দেশমুক্তির জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন—দিয়েছিলেনও। বিশ্বজননীর প্রতিচ্ছায়া দেশমাতৃকার জন্য তাঁদের অন্তরের অকম্পিত ভক্তিই ছিল তাঁদের আত্মত্যাগের উৎস। সুভাষ তাঁদেরই একজন।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় কল্পনার লোক থেকে

বাস্তব মাটিতে বিপ্লববাদ অবতীর্ণ হয়েছিল যে স্বল্প সংখ্যক তেজস্বী ব্যক্তির মাধ্যমে যতীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রজ ব্যক্তি। উনিশ শতক শেষ হবার আগেই তিনি তাঁর কর্মের সূত্রপাত করেন। বর্ধমান জেলার চান্নাগ্রাম তাঁর জন্মস্থান। তাঁর তেজস্বিতা ও শক্তি তাঁকে সামরিক বাহিনীর নেতার উপযুক্ত করেছিল—আর সে কারণেই তিনি সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সৈন্যবাহিনীতে তখন বাঙালীর স্থান ছিল না। যতীন্দ্র তাই বরোদায় গিয়েছিলেন, সেখানে মহারাজার সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য। অরবিন্দ তখন বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করতেন। অরবিন্দের বাংলা শিক্ষক দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে লিখেছেন : "যতীন্দ্রনাথের সাহস, উদ্যম, উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাইয়া অরবিন্দ বিস্মিত হইলেন, এবং সে যাহাতে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে পারে—সেজন্য যথেষ্ট আগ্রহও প্রকাশ করিলেন। ফৌজে বাঙালীর প্রবেশ নিষেধ বলিয়া যতীন্দ্রনাথ স্বীয় বাঙ্গালীত্ব গোপন করিয়া পুরুবিয়া ব্রাহ্মণ সাজিল এবং বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্দ্য' টকু উড়া রাখিয়া 'উপাধ্যায়' এই লাঙ্গুলটুকু নিজের নামে যোগ করিয়া অরবিন্দের বন্ধু লেফটেনান্ট মাধব রাও যাদবের শরণাপন্ন হইল, যদি তিনি দয়া করিয়া তাহাকে সাধারণ পদাতিক সৈন্যরূপেও গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন। অরবিন্দ বলিয়াছেন—যদি কোন স্বাধীন দেশ হইত এবং যতীন্দ্রনাথ সমর বিভাগে প্রবেশের সুযোগ পাইত, তাহা হইলে কালে সে বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিত গোয়েন্দার দল যে তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

যতীন্দ্র উপাধ্যায় নাম ধারণ করে এক বাঙালী যুবক বরোদার রাজার সৈন্যদলে প্রবেশ করে অল্প সময়েই বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিলেন। অরবিন্দের দূত হয়ে বাংলায় বিপ্লবাগ্নি জ্বালাতে ১৯০২ সালে ইনিই আবার কলকাতায় ফিরে আসবেন।

উনিশ শতক এইভাবে শেষ হল। জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বাংলা তখন প্লাবিত—বিশ শতকে সেই ভাবতরঙ্গ কঠোর বাস্তব সংগ্রামে পরিণতি লাভ করবে। সুভাষের জীবন সেই সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুভাষচন্দ্রের জন্ম ও ভারতে বিপ্লববাদের আবির্ভাব একই সময়ে ঘটেছিল--এবং সুভাষচন্দ্রের জীবনেই সেই বিপ্লববাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। সেকারণেই আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনকাহিনী ও এদেশে বিপ্লববাদ ও নবীন জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশের ধারাটিকে একই সূত্রে গ্রথিত করে দেখতে চাইছি।

১৯০১। সুভাষের চার বছর পূর্ণ হয়ে গেল। শৈশব অতিক্রম করে এবার তাঁর বাল্যে প্রবেশের পালা। পারিবারিক ও জাতীয় পরিবেশ সম্পর্কে ক্রমেই তিনি অধিক মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠছেন। তাঁদের পরিবারটি ছিল বৃহদাকার। বড় পরিবারে মানুষ হবার সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে কয়েকটি কথা লিখেছেন। অসুবিধা যে তাঁর কী ভোগ করতে হয়েছিল সেকথা আগেই বলেছি —বিশেষ কোন মনোযোগ কারও কাছ থেকেই তিনি পাননি। এমন কি তাঁর ব্যক্তিত্ববোধের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়েছিল,—তাঁর মনে হত যে তিনি যেন অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে একজন; কোনো বিশিষ্ট একজন নন, আর সকলের মতো একটি সংখ্যা মাত্র। মনের মধ্যে একটা অভাব বোধ তাঁর ছিল, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিজের সম্পর্কে এই তুচ্ছতার বোধ—যেন যে জগতে তিনি এসেছেন সেখানে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কোনো আসন নেই, তাঁর কোনো অনন্য ভূমিকা নেই, দলের মধ্যে দলের সঙ্গে মিশে তাঁর শুধু আসা আর যাওয়া। এই তুচ্ছতার বোধই তাঁর বাল্যস্মৃতির প্রথম অংশ জুড়ে ছিল বরাবর।

সুভাষচন্দ্রের মনে বাল্যে এই যে তুচ্ছতা ও শক্তিহীনতার বোধ জেগেছিল এর একটা সুফলও ফলেছিল। কোনোদিন তাঁর স্বভাবে

ঔদ্ধত্যের স্থান হয়নি তার ফলে। তাঁর ভিতরে শক্তি, বীর্য ও অসামান্যতাবোধের সম্বেগ ছিল, তার ফলে উদ্ধত হয়ে ওঠাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হত,—যেমন হয়েছিল বালক নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। কিন্তু সুভাষের বাস্তব পরিবেশ তাঁর চরিত্রে ঔদ্ধত্যের উন্মেষের সম্ভাবনাকে দমিয়ে দিয়েছিল। তাঁর অন্তরস্থিত শক্তির বেগ সেই পরিবেশের বাধার সম্মুখীন হয়ে আর একটা ভিন্ন পথে প্রবাহিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

তিনি ভেবেছিলেন তিনি অসামান্য নন, বিশিষ্ট নন, বহুজনমধ্যে জনৈক মাত্র,—কিন্তু সেই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে বসে থাকার মতো নিস্তেজভাব তাঁর ছিল না। কঠোর পরিশ্রম ও যত্নে এই সামান্যতাকে, এই অনুল্লেখযোগ্যতাকে, এই বৈশিষ্ট্যহীনতাকে অতিক্রম করে তাঁকে যে হতে হবে একজন মানুষের মতো মানুষ, বরণীয় মানুষ, একজন মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি—এই চেতনা তাঁর ছিল। বিধাতা যদি তাঁকে জন্মলব্ধ প্রতিভা নাই দিয়ে থাকেন, তাহলে কি সেই বঞ্চনাকে মুখ বুজে মেনে নিতে হবে? সুভাষ নিজের নিরপরাধ হৃদয়ে এই তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট প্রশ্নটি নিয়ে বিধাতার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। না, ভাগ্যকে চরম বলে মেনে নেবার কোনো যুক্তিই তিনি পেলেন না। বিধির বিধান উল্টে দেবার সাহস ও স্পর্ধায় স্পন্দিত হল তাঁর ক্ষুদ্র বুকখানি—কেন, ভগবান যা তাঁকে দেননি, নিজের শ্রম, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও প্রযত্নে তার ক্ষতিপূরণ করে নিতে তাঁর পক্ষে বাধা কোথায়?

এই সুভাষের প্রথম বিদ্রোহ। পরিবেশের বিরুদ্ধে নয়, নিয়তির বিরুদ্ধে। এ বিদ্রোহের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা অসামান্যতা, প্রতিভা, শক্তি কোনোটারই অভাব দিয়ে ভগবান তাঁকে পাঠাননি জগতে,—কিন্তু বিরাট পরিবারে, যেখানে বহু ভাই বোন ছাড়াও বহু আত্মীয়, বহু ভৃত্য ও আগন্তুকরা ছিল, সেখানে তাঁর অসামান্যতার দিকটি লক্ষ্য করার, প্রশংসা করার, স্বীকৃতি দেবার অবকাশ কারও ছিল না। একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা

করেছিলেন: "আমার জন্য তুমি কী রেখে যাচ্ছ?" বিশ্বনাথ দত্ত দৃপ্ত গর্বে ছেলেকে বলেছিলেন: "একবার আয়নায় নিজের চেহারাটা ছাখ, তাহলেই বুঝবি কী রেখে যাচ্ছি।" সুভাষকে এমন কথা বলার মতো অবকাশ তাঁর পরিজনদের মধ্যে কারও হয়নি; সুভাষের আত্মপরিচয় তাই তাঁর নিজের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভিতরের শক্তি ফুঁসে ওঠে তার স্বাভাবিক নিয়মেই—তাই আপন তুচ্ছতার বিরুদ্ধে সুভাষের অভিযান সুরু হয়ে গিয়েছিল বালক বয়সেই।

অরবিন্দ। বাংলার বিপ্লববাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের গোড়াতেই অরবিন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তিনি যতীন্দ্রনাথকে যতীন্দর উপাধ্যায় নামে বরোদার রাজার সৈন্যদলে ঢুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু ঘটনার শেষ সেখানে নয়, ঐ হচ্ছে আসল ঘটনার সুরু। অরবিন্দ সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত তেজস্বী যতীন্দ্রনাথকে বাংলায় বিপ্লবী দল গড়ার কাজে পাঠাবেন এবং নিজেও আসবেন। সে আলোচনা যথাস্থানে হবে। আলোচ্য বছরে, অর্থাৎ ১৯০১ সালে অরবিন্দ বাংলায় কর্ম প্রবর্তন না করলেও বাংলার ক্ষেত্রটা বিপ্লববাদ প্রচারের অনুকূল কিনা তা তদন্ত করতে নিজে এসেছিলেন। তিনি নিজে তখন একজন বিপ্লবী, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের বৈপ্লবিক দল গঠনের অন্যতম নেতা। ঠাকুর সাহেব নামে একজন অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন মূল সংগঠনটির নেতা। সম্ভবত তিনি উদয়পুরের অধিবাসী। পশ্চিম ভারতে এই দলটি গড়ে ওঠে--বম্বে শহরে ছিল তার প্রধান কেন্দ্র। পাঁচ জন সদস্য নিয়ে একটি কর্ম পরিষদ গঠিত হয়েছিল, ঠাকুর সাহেব ছিলেন সভাপতি। অরবিন্দ এই বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। এই দলের নেতারা সমগ্র ভারতকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। গুজরাট বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়া হয় অরবিন্দকে, বাংলা বিভাগের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয় ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের ওপর। ঠাকুর সাহেব দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে সৈন্য-

বাহিনীর মধ্যে বিপ্লবতত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। অরবিন্দও একই উদ্দেশ্যে মধ্য ভারতে কোনো স্থানে যেয়ে কিছু সংখ্যক ভারতীয় সাব-অফিসার ও একটি রেজিমেণ্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। বিশেষ কোনো ফলোদয় ঘটেছিল কিনা জানা যায় না। ঠাকুর সাহেব জাপানে গিয়েছিলেন সামরিক সাহায্য সংগ্রহের আশায়, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৯০৫ সাল নাগাদ। সামরিক শিক্ষা লাভের জন্য দলের অন্যতম সদস্য মাধব রাও যাদবকেও জাপানে পাঠানো হয়েছিল। ঠাকুর সাহেব জাপানে থাকা কালে অরবিন্দ দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সব ব্যাপারগুলি ঠিক কত সালে ঘটেছিল জানা যায় না—তবে উনিশ শতক শেষ হবার আগেই, অন্ততঃ বিশ শতকের সুরুতেই অরবিন্দ যে গুপ্ত বিপ্লব প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন ও কার্যকরীভাবে বিপ্লবে অংশ নিতেও অগ্রসর হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অরবিন্দ যখন বরোদা কলেজের শান্ত, ধীর, মৃদুভাষী ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, তখনই তিনি একজন বিপ্লবের ভাবুক ও কর্মী, এবং তখনই তিনি সমস্ত বিদেশী ভাব পরিত্যাগ করে খাটি দেশজ হবার জন্য যত্নশীল। তার বাবা ব্রাহ্ম, দাদামশাই ব্রাহ্ম—কিন্তু অরবিন্দ প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হয়েছিলেন এই ১৯০১ সালেই। এই বছর কলকাতায় ভূপাল বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীকে তিনি হিন্দু মতে বিয়ে করেছিলেন। অরবিন্দ হিন্দুধর্মের কোলে ফিরে আসার জন্য এতদূর ব্যগ্র হয়েছিলেন যে তাঁর মতো উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠাবান ও প্রতিভাশালী যুবক উনত্রিশ বছর বয়সে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতেও ইতস্ততঃ করেননি। স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ তখন দেশে কতখানি ঘটে গেছে এই দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যায়।

অরবিন্দ যখন প্রথম ভারতে আসেন তখন থেকেই তাঁর মধ্যে এই স্বাজাত্যবোধের গরিমা ও বিপ্লবভাবনা স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। ১৮৯৩ সালে অরবিন্দ যখন মাত্র একুশ বছরের যুবক তখনই 'ইন্দু

প্রকাশ' পত্রিকায় New Lamps for the Old নামে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন তাতেই তাঁর স্বদেশভাবনার বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়ে গিয়েছিল। যে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বসভায় ভারতের বাণী প্রচার করছিলেন সেই সময়ই অরবিন্দ দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়ে নতুন চিন্তাধারা প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। প্রথম প্রবন্ধেই (আগস্ট ৭, ১৮৯৩) তিনি লিখেছিলেন : "যদি কোনো অন্ধ ব্যক্তি আর একটি অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় তবে তারা উভয়েই কি গর্তে পড়বে না? দুবছর আগেও আমি ভাবিনি যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে এই উক্তিটি প্রযোজ্য হতে পারে। আজ কিন্তু আমি এই উক্তিটি যে ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একমাত্র খাঁটি কথা তাই প্রমাণ করব।... কংগ্রেস একটি ভীরু প্রতিষ্ঠান, শক্ত কথা, সহজ সত্য কথা বলতে সে চায় না, প্রভুদের অসন্তুষ্ট করতে সে ভয় পায়।"

দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন (২১শে আগস্ট, ১৮৯৩): মিঃ ফিরোজ শা মেহতার মতো জনপ্রিয় বাগ্মীরা একথা প্রায়ই বলে থাকেন যে কংগ্রেস আমাদের একত্রে কাজ করতে শিখিয়েছে। না, কথাটা সত্য নয় ; আমরা যে একত্রে কাজ করতে শিখেছি সে কথা প্রমাণ করার মতো কোনো তথ্যই নেই,—বরং কংগ্রেস আমাদের শিখিয়েছে একত্রে বক্তৃতা করতে —আর বক্তৃতা করা ও কাজ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।...আমাদের প্রকৃত শত্রু আমাদের বাইরের কোনো শক্তি নয়, আমাদের ভীষণ দুর্বলতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি, অন্ধ ভাবালুতাই আমাদের যথার্থ শত্রু।....আমাদের আবেদন; যে কোনো উন্নতমনা, আত্মসম্মানজ্ঞান-সম্পন্ন জাতির আবেদন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মতামতের কাছে নয়, ইংরেজের ন্যায়পরতার কাছেও নয়, আমাদেরই জাগ্রত মনুষ্যত্ববোধের কাছে, ভারতের দুঃখী জনগণের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক একাত্মচেতনার কাছে'। When we no longer obey the dictates of a veiled

self-interest, but return to the profession of a large and genuine patriotism, when we cease to hanker after the soiled crumbs which Engalnd may cast to us from her table, then it will be to that sense of manhood, to that fellow feeling that we shall finally and forcibly appeal."

তৃতীয় প্রবন্ধে (১৮ই আগষ্ট) তিনি লিখেছিলেন : "কংগ্রেস জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে না, মাত্র একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করে। সেজন্যই একে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। ....কংগ্রেস যে শ্রেণীটির প্রতিনিধি সে হচ্ছে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা বিলেত থেকে অন্যান্য জিনিসের মতো রাজনীতিও আমদানী করতে চায় ও দেশী জিনিস ও দেশী ভাবধারা নষ্ট করে ফেলতে চায়। তারা বিজাতীয়।"

সপ্তম প্রবন্ধে (৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯৩) তিনি লিখেছিলেন : "আমরা আমাদের রাজনৈতিক অক্ষমতা ও রাজনৈতিক ব্যর্থতার ভিত্তি স্থাপন করেছি, কারণ আমরা মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতি চেয়েছি, বিশাল দরিদ্র জনসাধারণের মানসিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে চাইনি। কংগ্রেসের দেশপ্রেম ফাঁপা ও স্বার্থপর। আমাদের দেশের অবহেলিত নিঃস্ব জনগণ আজ অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে ও দুর্ভাগ্যের ভারে তারা পীড়িত। But with that distressed and ignorant proletariate,—now that the middle class is proved deficient in sincerity, power and judgment, with that proletariate resides, whether we like it or not, our sole assurance of hope, our sole chance in the future."

একাদশ প্রবন্ধে (৬ই মার্চ ১৮৯৪) তিনি লিখেছিলেন : "ভাবতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বীকৃতি, প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা লাভ করতে চাইছে ও

খানিকটা লাভ করছেও। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিহাসের চাবি কাঠিটি রয়ে গেছে প্রলিতাবিয়েতের হাতে। আজ তারা কোনো শক্তি নয়, কিন্তু শক্তির সম্ভাবনা আছে তাদেরই মধ্যে লুকিয়ে। যে সে কথা বুঝবে ও সেই শক্তিকে জাগ্রত করবে সেই হবে ভবিষ্যতের অধিনায়ক।....দেশের সেই সমগ্র শক্তিকে জাগ্রত ও সংগঠিত করতে হবে।"

অরবিন্দ অসাধারণ—কি মণীষায়, কি চরিত্রে। ১৮৯৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসকে বিজাতীয় বলে অভিহিত করা খুব সহজ কাজ ছিল না। কংগ্রেসের নীতিগুলিকে অরবিন্দ অভ্রান্ত দৃষ্টিতে সমালোচনা করেছিলেন ও যে কর্তব্য পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন পরবর্তী কালে কংগ্রেসকে সে পথেই চলতে হয়েছিল। কিন্তু অরবিন্দের লেখার মধ্যে বিপ্লবের কোনো কথা ছিলনা,—বস্তুতঃ ও বিষয়ে বাংলায় স্থায়ীভাবে আসার আগে প্রকাশ্যে তিনি কোনো কথাই বলেননি। বরং নিঃশব্দে তিনি বিপ্লব কর্মের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। বরোদা থেকে বিপ্লবের আগুন তিনিই বাংলায় পাঠাবেন এক বছর বাদে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে বরোদায় বসে একই সঙ্গে কতকগুলি ভিন্নধর্মী কাজ তিনি করছিলেন,—অধ্যাপনা, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনযাপন, বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি ও যোগসাধনা।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রেরও জীবনের একটি পর্ব শেষ হয়ে গেল—শৈশব পর্ব। এরপর আসবে তাঁর বালক বেশে স্কুলে যাবার পালা—ঘর থেকে বহির্বিশ্বে পদক্ষেপের সময়। সুভাষেরও সুরু হবে নীরব গোপন আত্মপ্রস্তুতির পালা। সে আত্মপ্রস্তুতি কেমন ছিল? সে আলোচনায় আমরা এর পর প্রবেশ করব। শুধু একটি মাত্র দৃশ্যের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। প্রতিদিন নিয়মিত রাত শেষ হবার বহু আগে সুভাষ ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে বিছানা ছেড়ে উঠতেন। উঠে যেতেন ছাদে। সেখানে উদার

আকাশের নীল চন্দ্রাতপ তলে অগণন তারাদের ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে দৃষ্টি মেলে দিয়ে সুভাষ বসে বসে কী ভাবতেন। কে তাঁকে শিখিয়েছিল বিশ্বরহস্যের ধ্যান করতে নিভৃতে? তারপর একসময় ধ্যান শেষে সঙ্গোপনে এসে শুয়ে থাকতেন শয্যায় নিজের স্থানটিতে। তখনো রাত শেষ হতে বাকি থাকত। সবাই ঘুমোত—গোটা ব্যাপারটা থেকে যেত প্রত্যেকের অজানা। অগ্রজ সুরেশ বসু বলেছেন, "সুভাষ যে সেই বয়সেই ধ্যানী হয়ে উঠেছিল আমরা কেউই তা সহজে টের পাইনি।"

হ্যাঁ, মন্ত্রগুপ্তি ছিল সুভাষচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর সে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল তার বাল্যেই।

১৯০২। সুভাষের পাঁচ বছর পূর্ণ হবার মাত্র কয়েকদিন যখন বাকি, অর্থাৎ ১৯০২ সালের জানুয়ারির গোড়ায় তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। বছরের এই সময়েই এ দেশের স্কুলগুলির ক্লাস আরম্ভ হয়। যখন তিনি প্রথম শুনলেন যে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করা হবে তখন তাঁর আনন্দ হয়েছিল। কারণ স্কুলে যাওয়া ছিল এক অর্থে মুক্তি। তাঁদের বাড়ির নিয়মকানুন ছিল কড়া, ছেলেমেয়েরা বাড়ির বাইরে যেতে পারত না। বাড়ির ভিতরেই খেলাধূলা ও আমোদের জায়গা ছিল। কিন্তু কল্পনাশীল বালক সেই সীমাঘেরা স্থানের বাইরের মুক্ত বিশ্বের উদার আমন্ত্রণ নিজের হৃদয়ে অনুভব করে, দিগন্তকে স্পর্শ করবার জন্য তার অবোধ ব্যাকুলতা তাকে চঞ্চল করে। সুভাষের মনে হয়েছিল স্কুলে যাওয়া বিশাল বাহ্য জগতের মধ্যে উত্তীর্ণ হবার সুযোগ এনে দেবে। দাদাদের তিনি স্কুলে যেতে দেখতেন, ওঁরা যে বড় জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছে এ কথাই ওঁদের দেখে তার মনে হত। পরিষ্কার জামা প্যান্ট পরে গাড়িতে করে স্কুলে যাবার অধিকার পেলে যে সেই বড় জগতে প্রবেশ লাভের পাশপোর্ট পাওয়া যাবে—এই ধারণাই তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় আর আনন্দ জাগিয়ে তুলল। এতদিনে নিজেকে তিনি সাবালক বলে মনে করতে পারলেন। বড়দের বড়ত্বের একটা পরিমাপ হল তারা ছুটির দিনে, যেমন রবিবারে, বাড়ি থাকে; আর সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে কার্যোপলক্ষে বাইরে যায়। স্কুলে যাওয়ার ফলে এই ব্যাপারটায় বড়দের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব। তাই স্কুলগামী বালক সেজন্য নিজেকে বেশ খানিকটা বড়, পদস্থ ও মর্যাদাযোগ্য বলে বিশ্বাস করার সুযোগ পায়।

স্কুলে যাবার প্রথম নির্দিষ্ট দিনটিতে তাই সুভাষের আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল। স্কুলে ক্লাস সুরু হয় দশটায়, সেজন্য দশটার কিছু আগেই বাড়ি থেকে বেরোবার কথা ছিল। তাঁর সমবয়সী দুজন মামাও ঐ একই সঙ্গে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল—তাদেরও একই সঙ্গে গাড়িতে যাওয়া স্থির ছিল। ঘোড়ার গাড়ি নির্দিষ্ট সময়ে এসে যথাস্থানে অপেক্ষা করছিল নতুন ছাত্রদের স্কুলে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে। ছাত্ররাও ছিল বেজায় খুশি—তারা সবাই মিলে গাড়ির দিকে ছুটতে সুরু করে দিল। আর সবাই ঠিকমতো গাড়িতে যেয়ে উঠল, কিন্তু সুভাষের কপাল মন্দ এই মন্দ ভাগ্যের দুঃখ চিরকাল পদে পদে তাঁকে অনুসরণ করেছে,—ছুটতে যেয়ে পা হড়কে তিনি পড়ে গেলেন আঘাতটা লাগল মাথায়ই। বাড়ির লোকরা ধরাধরি করে নিয়ে এল তাঁকে, মাথায় বেঁধে দেওয়া হল ব্যাণ্ডেজ। স্কুলে যাওয়া রইল সেদিনের মতো স্থগিত, বিছানায় শুয়ে থাকতে হল সারাদিন। সুভাষের ছাত্রজীবনের মধ্য পর্যায়েও একটা দুর্যোগ সৃষ্টি হয়ে তার লেখাপড়া স্থগিত হয়েছিল—এমন কি লেখাপড়া আর আদৌ না হবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। সেই ভাবী ঘটনার অশুভ ছায়াপাত কি এই প্রথম স্কুল যাবার জন্য নির্দিষ্ট দিনটিতে পড়েছিল? নিয়তির ইঙ্গিত কি এই পতন ও আঘাতের মধ্যে ফুটে উঠেছিল?

সেদিন সুভাষ শুয়ে রইলেন বিছানায়, গাড়ির চাকার শব্দ ক্রমে গেল মিলিয়ে। সৌভাগ্যবান সমবয়সীরা নির্বিবাদে চলে গেল স্কুলে। আর সুভাষের নিজের বর্ণনায়: "আমি পড়ে রইলাম, আমার সামনে সবই অন্ধকার মনে হতে লাগল এবং আমার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।"

কিন্তু পরের দিনই এল স্কুলে যাবার সুযোগ। ইতিপূর্বে গৃহেই সুভাষের বিদ্যারম্ভ হয়ে গিয়েছিল। অক্ষর পরিচয়ের পর্ব তাঁর সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সম্ভবত প্রথম পাঠ নেবার পর্বও শেষ হয়ে

গিয়েছিল। পঞ্চম বর্ষে তিনি যখন স্কুলে ভর্তি হলেন তার আগেই তিনি বেশ খানিকটা শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন।

স্কুলটির নাম ছিল Protestant European School—সংক্ষেপে পি. ই. স্কুল। স্কুলটি পরিচালনা করতেন ব্যাপ্টিস্ট মিশন। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। ছাত্রদের অধিকাংশই—শতকরা পঁচাশি ভাগ ছিল ইয়োরোপীয়ান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। মুখ্যত তাদের শিক্ষার জন্যই স্কুলটি পরিচালিত হত। স্কুলে মাত্র শতকরা পনেরটি আসন সংরক্ষিত হত ভারতীয় ছাত্রদের জন্য। জানকীনাথ বসুর পরিবারের ছেলে ও মেয়েরা কিন্তু প্রত্যেকেই এই স্কুলেই লেখাপড়া শিখেছেন। জানকীনাথ সম্ভবত তাঁর ছেলেমেয়েদের ইংরেজি ভাষা ভালো করে শেখাবার উদ্দেশ্যেই এই স্কুলে ভর্তি করতেন। তখনকার দিনে ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে শিখতে ও বলতে পারার যথেষ্ট মূল্য ছিল—আজও হয়তো তা আছে। পি. ই. স্কুলে ইংরেজ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, কাজেই তাঁদের কাছে ইংরেজিভাষা শিক্ষা করলে যে ঐ ভাষার ওপর ছাত্রদের দখল সহজ, সাবলীল ও নিপুণ হবে এই আশা পোষণ করাই ছিল সঙ্গত। সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে এই স্কুলে পাঠ নেবার ফলে তিনি ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

শুধু ভাষাই নয়, অন্যান্য বিষয়েও এই স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত দেশী স্কুলগুলির তুলনায় উৎকৃষ্ট ছিল। ইংলণ্ডের স্কুলগুলির আদর্শে ও তাদের নীতি অনুসারে এই স্কুলটি পরিচালিত হত। স্কুলটির প্রধান শিক্ষক ও প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন ইংলণ্ড থেকে আগত ইয়ং দম্পতি। বাকিরা সবাই ছিলেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যাই ছিল বেশি। সুভাষ লিখেছেন, এই স্কুলে পড়ার ফলে কতকগুলি সুফল তিনি পেয়েছেন। শুধু বই পড়া বা বই মুখস্থ করার ওপর ঝোঁক এখানে দেওয়া

হত না। ভালো আচরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা-পরায়ণতা প্রভৃতির ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হত। খেলাধুলা, সঙ্গীতশিক্ষা প্রভৃতির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দেওয়া হত, অধীত বিষয়গুলি ছাত্ররা কতটা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে তা সঙ্গে সঙ্গে যাচাই করে নেওয়া হত, ছাত্ররা নিয়মিত পড়াশোনা করছে কিনা তা দেখা হত, সারা বছরই ছাত্ররা যাতে প্রস্তুত থাকে তার ব্যবস্থা করা হত। তার ফলে পরীক্ষার সময় কোনো ছাত্রকেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত না। সমস্ত শিক্ষাধারাটাই ছিল আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ছাত্রদের সুনাগরিক করে গড়ে তোলার উপযুক্ত।

নিবেদিতা ও ওকাকুরা। স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে ফিরে আসেন ও একদিন রাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে বেলুড় মঠের পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে মঠের সাধুদের বিস্মিত ও আনন্দিত করেছিলেন। আর তিনি কখনো ভারত ত্যাগ করেননি। নিবেদিতা কিন্তু তাঁর সঙ্গে ফেরেননি। নিবেদিতা ফিরলেন ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ইতিমধ্যে দুজন জাপানী বিদগ্ধ ব্যক্তি ভারতে এসে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। শিকাগোর মতো জাপানেও একটি বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন হবে এবং স্বামীজী যেন ঐ সম্মেলনে যোগ দেন, এই ছিল তাঁদের অনুরোধ। স্বামীজীর শরীর তখন অসুস্থ— কাজেই তার যাওয়া শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে একথা তিনি জানালেন। জাপানী ভদ্রলোকরা কিছুদিন বেলুড় মঠেই বাস করলেন। এঁদের একজনের নাম রেভারেণ্ড ওডা, আর একজনের নাম মি. ওকাকুরা। ওকাকুরা শিল্পের সমঝদার, আদর্শবাদী ও প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। তিনি ১৯০২ সালের জানুয়ারিতে স্বামীজীর সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন, পরে সেখান থেকে কাশীতেও গিয়েছিলেন।

বেলুড় মঠেই নিবেদিতার সঙ্গে ওকাকুরার পরিচয় হয়। ওকাকুরার প্রাচ্যবাদ নিবেদিতারও ভালো লাগল—বিশেষত আর্টের ক্ষেত্রে। ওকাকুরা ও নিবেদিতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—তাঁরাও একত্রে বুদ্ধগয়া গিয়েছিলেন ও প্রাচ্য দেশের আদর্শ নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। তারই কিঞ্চিৎ ফলশ্রুতিরূপে ১৯০৩ সালে অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য বছরের পরের বছরই ওকাকুরার বিখ্যাত গ্রন্থ Ideals of the East প্রকাশিত হয় নিবেদিতা কর্তৃক লিখিত ভূমিকাসহ। ঘটনার শেষ সেখানেই নয়। বাংলা দেশে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রভৃতি যুগস্রষ্টা শিল্পীদের দ্বারা শিল্পের ক্ষেত্রে যে নব যুগ,—অভিনব ভাবতত্ত্ববোধের যুগ প্রবর্তিত হয়েছিল তার মূলে ওকাকুরা-নিবেদিতার দান অনেকখানি। সে কথায় আমরা পরে আসব। এখানে উল্লেখ্য শুধু এই যে বিংশ শতকের গোড়ায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারা শুধু রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, শিল্পের মাধ্যমেও আত্মপ্রকাশ করেছিল; শিল্পের মধ্যে জাতি নিজেকে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করেছিল। নিবেদিতা সেই নতুন শিল্প সৃষ্টির মূলে প্রেরণাদাত্রীরূপে অবস্থান করেছেন।

অনুশীলন সমিতি। কিন্তু জাতীয়তাবাদ তখন শুধু ভাব বা রসলোকের মধ্যেই সীমিত থাকতে পারেনি। দেশমুক্তির বাস্তব কর্মের মধ্যে তার আত্মপ্রকাশ তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। অনুশীলন সমিতি সেই কর্মের অন্যতম বাহন। অনুশীলন সমিতির কর্মধারায় বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের স্থান প্রথমদিকে ছিল না। সরলাদেবী ও পি. মিত্র অনুশীলন সমিতিতে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল পথে ঘাটে, রেল স্টীমারে গোরার অত্যাচার থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করবার কৌশল যুবকদের শিক্ষা দেওয়া। সরলাদেবী মনে করতেন যে কোনো জাতি শারীরিক শক্তির ক্ষেত্রে দুর্বল হলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী—প্রাচীন গ্রীস, রোম ও বর্তমান ভারত তার দৃষ্টান্ত। এমন কি উচ্চনৈতিক মান

বজায় রাখতে হলেও দেশবাসীদের শারীরিক শক্তির অধিকারী হওয়া দরকার। তিনি এই উদ্দেশ্যে গোয়ার বিখ্যাত ক্রীড়া ও ব্যায়ামবিদ প্রোফেসর মর্তজাকে নিজের আখড়ায় লাঠি ও তরবারি খেলা শেখাবার জন্য নিয়োগ করেন। মহারাষ্ট্রের শিবাজী উৎসবের অনুকরণে তিনি এখানে প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্য উৎসবেরও প্রচলন করেন। ঐ উৎসবে প্রতাপাদিত্য বা উদয়াদিত্যের কোনো চিত্র থাকত না, তার বদলে তরবারি রেখে সেই তরবারির পূজা করা হত। সরলাদেবী বীরাষ্টমীরও পুন প্রচলন করেন।

অরবিন্দের দূত। অরবিন্দ আলোচ্য বছরে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক পত্র দিয়ে সরলাদেবীর কাছে পাঠান। অরবিন্দ সেসময়ে শুধু গুপ্ত বিপ্লবী চক্রের সভাপতি--তাঁর আদেশে যতীন্দ্রনাথ অম্লান বদনে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন এখানেও বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়ার দায়িত্ব নিয়ে। সরলাদেবীকে তিনি অরবিন্দের পত্র দিলেন, সেই পত্রে বাংলায় গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পরামর্শ ছিল। সরলাদেবীর সঙ্গে অরবিন্দের পূর্বেই বরোদায় পরিচয় হয়েছিল। অরবিন্দের পরামর্শ অনুসারে সতীশ বসু প্রতিষ্ঠিত জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) এর ছাত্রদের একটি দলের সঙ্গে পি মিত্র ও সরলাদেবীর দলকে মিলিত করে "অনুশীলন সমিতি" প্রতিষ্ঠা হল। এই বিপ্লবী দলটির সভাপতি হয়েছিলেন পি মিত্র, সহ-সভাপতি হয়েছিলেন অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন দাস একত্রে। সমিতির পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ ও আশীর্বাদ লাভের জন্য যাওয়া হয়েছিল। স্বামীজীর তখন জীবনের শেষ লগ্ন আসন্ন--কিন্তু তিনি এই বিপ্লবী সমিতিকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।

বারীন্দ্রকুমার। বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে আর একজন ব্যক্তির এই বছর প্রবেশ ঘটেছিল--অল্প বয়স্ক, চঞ্চল, বোখা, উত্তেজিত এই ব্যক্তির নাম বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। ইনি অরবিন্দের কনিষ্ঠ

ভ্রাতা। তাঁর জন্ম হয় ইংলণ্ডে, ১৮৮০ সালে। জন্মের তিনমাস পর অবশ্য তিনি দেশে ফিরে আসেন ও আর কখনও দেশের বাইরে যাননি। তাঁর মা উন্মাদগ্রস্তা হওয়ায় বাল্যজীবন তাঁর স্বাভাবিক হয়নি। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে দেওঘরে মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর কাছে তিনি লেখাপড়া শেখেন। দেওঘর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বারীন পাটনা কলেজে এফ. এ. বা তখনকার দিনের ইন্টারমিডিয়েট পড়তে গিয়েছিলেন। পাটনা কলেজে পড়া মাঝ পথে সাঙ্গ করে তিনি চলে গিয়েছিলেন ঢাকায়, মেজদা মনোমোহন ঘোষের কাছে। পড়া লেখা আর হয়নি। কৃষি, ব্যবসা ইত্যাদি নানারকম পরিকল্পনায় হাত লাগিয়ে ও ব্যর্থ হয়ে বারীন্দ্র চলে যান বরোদায় অরবিন্দের কাছে। বারীন বরোদায়ই অরবিন্দের কাছে গুপ্ত বিপ্লব কর্মে যোগ দেবার নির্দেশ পান। তাঁর 'আত্ম কথায়' তিনি লিখেছেন: "তাঁর কাছে (অরবিন্দের কাছে) আদেশ পেয়ে বরোদা সেনা বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকেতায় চলে গেছেন এবং সেখানে গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলেছেন। আমার ডাক পড়লো বাংলা দেশের তরুণদের ও ছাত্র সমাজের মনের ভূমিতে স্বাধীনতার বীজ বপন করার জন্যে। যতীনদা কয়েকজন মাতব্বর ধরে টাকারও নাকি ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেননি। আমাকে বাংলা দেশে গিয়ে সেইটি করতে হবে। পোষা হাতী দিয়ে যেমন করে হাতী ধরে, গনগনে আগুনে গড়া আমার তরুণ প্রাণের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবার ব্যবস্থার জন্যে গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আমাকে দেশে পাঠান হল।" (পৃঃ ১৮২-৮৩)

বরোদা থেকে বাংলায় বিপ্লবের আগুন জ্বালাবার জন্য অরবিন্দের দূত হয়ে যে দুজন পর পর এলেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রের বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ, আর বারীন্দ্রের বয়স বাইশের সামান্য বেশি বা তেইশ। বাংলায় বিপ্লব যুগের প্রবর্তনে এই অনভিজ্ঞ

অর্বাচীনদের, বিশেষত বারীন্দ্রের দান কম নয়। বারীন্দ্র কয়েক বছরের মধ্যেই একজন জাতীয় বীরের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন।

স্বদেশী ডাকাতি। যতীন্দ্র সরলা দেবীর সাহায্য পেলেন ও কলকাতার কয়েকজন অর্থবান ব্যক্তিরও সাহায্য পেলেন, কিন্তু যুবকদের পেলেন না—বারীন্দ্রের অভিমত এই। যতীন্দ্র কি সত্যই ধনীদের সাহায্য পেয়েছিলেন? পেলেও তার পরিমাণ কত? মনে হয়, দান বা সাহায্য হিসাবে বেশি টাকা পাওয়া যায়নি। তাই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য যতীন্দ্র ডাকাতির পরিকল্পনা করেন, আর ১৯০২ সালেই বাংলায় প্রথম স্বদেশী ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই ডাকাতির প্রশ্নেই অনুশীলন সমিতির ভিতর মতভেদের সূচনা হয়। আমরা সামান্য পরেই সেকথায় আসব।

বিবেকানন্দের দেহত্যাগ ও নিবেদিতা। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই রাত ন'টায় স্বামীজী তাঁর নরদেহ রক্ষা করেন। পরদিন খুব ভোরে বেলুড় মঠের সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দ এক ব্যক্তিকে দিয়ে একখানি চিঠি বাগবাজারে নিবেদিতার কাছে পাঠান। চিঠিতে লেখা ছিল "প্রিয় নিবেদিতা, সব শেষ হয়ে গেছে। গতকাল রাত ন'টায় স্বামীজী ঘুমিয়েছিলেন—আর কখনো সে ঘুম ভাঙবেনা। —সারদানন্দ।" চিঠির অক্ষরগুলি নিবেদিতার চোখের সামনে নাচতে লাগল। সেদিন তিনি যে বেদনা ও দায়িত্বভার অনুভব করেছিলেন তার অংশ নেবার মতো যোগ্য আর কোনো ব্যক্তি বর্তমান ছিল না। সুভাষ তখন ছ'বছরের বালক, নিচুতলার ছাত্র—তাঁর বয়স যদি আরও কিছু বেশি হত তাহলে তিনিই একমাত্র নিবেদিতার পাশে এসে দাঁড়াতে পারতেন। স্বামীজীকে এই দুজনই জীবনে সত্য মালো গ্রহণ করতে পেরেছিলেন—এইখানেই তাঁদের মিল; যদিও এঁদের সাক্ষাৎ ঘটার কোনো সুযোগ হয়নি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। বাংলার আর একজন বরণীয় স্বদেশ সাধক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কথাও এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই মানুষটিরও সাক্ষাৎ ঘটার কোনো অবকাশ হয়নি। কিন্তু যে সময় জাতীয় ভাবমণ্ডল থেকে ভাবরাশি আত্মসাৎ করে সুভাষের চেতনা বিকশিত হয়ে উঠছিল ও একটা নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করছিল সেই সময়ে জাতির ভাবধারার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এই বিচিত্র চরিত্রের অতি তেজস্বী সন্ন্যাসী। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সময় তিনি কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। তাঁর কাকা বিখ্যাত খৃষ্টান রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনার ফলে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৮৯১ সালে তিনি খৃষ্টান হন। তিনি হয়েছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী—সেই কারণেই তিনি ব্রহ্মবান্ধব নাম নেন; পরে অবশ্য তিনি প্রোটেস্টান্ট হয়েছিলেন। ক্রমে বেদান্তের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। তিনি দর্শন, ধর্ম, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধও লিখতেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৭ই পৌষ রবীন্দ্রনাথ বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে তিনি সেখানে অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। তিনি ছাত্রদের উপনিষদ পড়াতেন। ১৯০২ সালের ৫ই জুলাই তিনি বোলপুর থেকে কলকাতায় আসছিলেন। হাওড়া ষ্টেশনে এসেই শুনলেন, গত রাতে স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করেছেন। শোনামাত্রই তিনি ঊর্ধ্বশ্বাস বেগে বেলুড়মঠের দিকে ধাবিত হলেন। বেলুড়ে যখন পৌঁছলেন তখন চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই চিতাপার্শ্বে নীরবে নতমুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি ধ্যানস্থ হলেন। অন্তরে যেন একটা বাণী শুনলেন তিনি: "তোমার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু কাজে লাগাও, বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গ-জয় ব্রত গ্রহণ ও উদযাপন করতে চেষ্টা কর।" সেই মুহূর্তেই ব্রহ্মবান্ধব স্থির করলেন তিনি ইংলণ্ড যাবেন ও সেখানে হিন্দুর দর্শন ও শাস্ত্র প্রচার করবেন। সত্যই তিন মাস পর মাত্র সাতাশ টাকা পকেটে নিয়ে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ৫ই নভেম্বর তিনি অক্সফোর্ডে পৌঁছেছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত

অক্সফোর্ডের কলেজগুলি খোলা ছিল। তিনি এই একমাসের মধ্যেই অক্সফোর্ডে তিনটি বক্তৃতা দেন: (১) হিন্দুধর্মে ঈশ্বরবাদ (২) হিন্দুর নীতিশাস্ত্র (৩) হিন্দুর সমাজবিজ্ঞান। তারপর তিনি আর একটি বক্তৃতা করেন—হিন্দুর চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। পরের বছর তিনি কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজেও তিনটি বক্তৃতা দেন—হিন্দু নির্গুণ ব্রহ্ম, হিন্দু ধর্মনীতি, হিন্দু ভক্তিতত্ত্ব। তাঁর বক্তৃতার প্রভূত সমাদর হয়েছিল ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার ফলে হিন্দু দর্শনের জন্য একটি নতুন অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়েছিল।

উপাধ্যায় হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথার গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। তিনি গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু সমাজে ফিরে আসার সঙ্কল্প প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন ও ফিরে এসেছিলেনও।

বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হয়ে ইংলণ্ড আমেরিকা গিয়েছিলেন তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান শিখতে ও ব্রাহ্ম মতবাদ প্রচার করতে। আমেরিকায় নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সে কারণেই হয়ত তিনি এর পর থেকে 'হিন্দুপন্থী' হয়ে গেলেন। তিনি ধর্মপ্রচার করতেন, কিন্তু নিউইয়র্কে একজন আমেরিকান তাঁকে বলেন যে পরাধীন, দুর্বল ভারতের লোকেরা যদি ধর্মপ্রচার করে তবে তাদের কথা কেউ শোনবার যোগ্য মনে করবে না। বিপিন পাল লিখেছেন "কথাগুলি যেন আমার প্রাণের অন্তস্থল পর্যন্ত খোঁচাইয়া দিল। আর নিউইয়র্কের হোটেলের পান্থাগারে এই সামান্য বক্তার এই অপ্রত্যাশিত সম্বর্ধনার মধ্যেই মনে হয় আমার অজ্ঞাতসারে সেই সাহেবের অপরাহ্নে আমার নূতন স্বাদেশিকতার জন্ম হয়। তখন হইতেই বুঝিলাম, যতদিন না ভারতের রাষ্ট্রীয় দাসত্ব ঘুচিয়াছে এবং আমরা চারিদিকের স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ জাতি সকলের মাঝখানে স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি ততদিন আমাদিগের যাহা দিবার আছে জগতের লোক তাহা গ্রহণ করিবেনা। ভারতবর্ষ যতদিন ইউরোপের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ

থাকিবে ততদিন তাহার রত্নভাণ্ডার বিদেশীয়েরাই লুটিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। সে নিজের হাতে সে ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া বিশ্বমানবের জ্ঞানকোষের সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না। এই কথাটা এমন সোজাসুজি ভাবে আর কেহ কহে নাই। আর আমিও আধুনিক ভারতের সকল সাধনের পূর্ববর্তী সাধন যে জাতীয় স্বাধীনতালাভ, একথাটা সমুদয় জ্ঞান ও সমুদয় ভাব দিয়া ধরিতে পারি নাই।"

বিপিন পালের কথা এতদূর সত্য ছিল যে এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী অর্থাৎ যাঁর দেশ নেই কুল নেই জাতি নেই —এমন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা, উন্নতি ও শক্তির জন্য এত ব্যাকুল ছিলেন। তাঁর তীব্র স্বদেশপ্রেমের নিহিতার্থ এই। আর সুভাষচন্দ্র, যাঁর জীবন বিচার করে আমরা দেখব যে তিনি ছিলেন মূলত একজন সন্ন্যাসী ও ঈশ্বরপ্রেমিক—তিনিও ভারতের স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম করেছেন। এই শতাব্দীর গোড়ায় বিপিন চন্দ্র পাল বুঝেছিলেন যে ধর্ম প্রচার করে ততদিন পর্যন্ত কোনো লাভ নেই যতদিন পর্যন্ত না ভারত স্বাধীন হয়—সুভাষের জীবনের গতিভঙ্গীরও মূল রহস্য এইখানে। বিপিন পাল আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসেন ১৯০১ সালে—দেশের রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে New India নামে তিনি একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন ঐ বছরেই। এই পত্রিকার মলাটে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর ছবি ছিল। পত্রিকার নীতি ছিল মডারেট-বাদী আবেদনধর্মিতার বদলে আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীল আপসহীন জাতীয়তাবাদ, পূর্ণ স্বাধীনতা। বিবেকানন্দ এই পত্রিকা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ বিপিন চন্দ্রের মনোভাবের পরিবর্তন দেখে খুশি হননি। বিপিন পাল প্রচারিত জাতীয়তাবাদকেই সুভাষ নিজ জীবনে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

অরবিন্দের বাংলায় আগমন। অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্র কুমারকে বাংলায় পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি, ১৯০১ সালে তিনি নিজেও দুবার এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা দেশের সর্বত্র গুপ্ত সমিতির জাল বিস্তার করা। তাঁর পরিকল্পনা ছিল বাংলা দেশকে ছয়টি ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ভাগে একটি কেন্দ্র থাকবে। প্রত্যেক কেন্দ্রের উপকেন্দ্র থাকবে। কলকাতায় ও মেদিনীপুরে এই কেন্দ্র গঠিত হয়েছিল। অরবিন্দ দুবারই কলকাতা ছাড়াও মেদিনীপুরও গিয়েছিলেন। দুবারই তার সঙ্গে বারীন্দ্র ছিলেন। চাঁদমারিতে মাঠের মাঝে ঘোড়া গাতে বন্দুকের গুলি ছোড়া অভ্যাস করেছিলেন অরবিন্দ ও বারীন্দ্র—উপস্থিত অন্যরাও গুলি ছুঁড়েছিলেন।

দ্বিতীয়বারের আগমনে অরবিন্দ বাংলায় বিপ্লবকর্মে তাঁর প্রথম দীক্ষা দানের কাজ সম্পন্ন করেন—দীক্ষা দিয়েছিলেন মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাস কানুনগোকে। সন্ধ্যাবেলা হেমচন্দ্রের এক হাতে তরবারি আর এক হাতে গীতা দিয়ে 'সত্যপাঠ' অর্থাৎ 'ভারতের অধীনতা মোচনের জন্য সব করব' এই সঙ্কল্প বাক্য তাঁকে উচ্চারণ করতে বলা হয়েছিল। এই সব ঘটনার আগে অবশ্য যতীন্দ্রনাথই এসে মেদিনীপুরের ক্ষেত্রটি তৈরী করে গিয়েছিলেন। হেমচন্দ্র লিখেছেন: "১৯০১ খৃঃ মাঝামাঝি . . . শুনলাম 'ক' বাবু (অরবিন্দ) বাংলা দেশে সিক্রেট সোসাইটি স্থাপনের চেষ্টা করছেন। বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের সর্বত্র সিক্রেট সোসাইটি হয়ে গেছে। কলকাতার অনেক বড় বড় লোক তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

দিনকতক পরে 'ক' বাবুর একজন ভীমাকৃতি সহকারী (যতীন্দ্র নাথ) এসে হাজির হলেন। তিনি যা বল্লেন তার প্রায় সবই অসম্ভব আজগুবি। সমস্ত ভারত ইংরেজ তাড়াবার জন্য তয়ের। করদ রাজ্যগুলি এবং প্রত্যেক প্রদেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য তলোয়ার সানাচ্ছে। এমন কি নাগা, গারো, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদেরও হাজার

হাজার লোক পায়তাড়া দিচ্ছে; খালি বাংলা দেশ তয়ের নয় বলে তারা আটকে বসে আছে। সেইজন্যই তাকে দূত স্বরূপ 'ক' বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। এক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশকে তয়ের করে ফেলতেই হবে। কামান বন্দুক প্রভৃতি হাতিয়ারের ভাবনা এতটুকুও নেই। জেনারেল কাপ্তেনও তয়ের, কিন্তু বাঙালী কমাণ্ডার ও কাপ্তেন এ চাই। যে আগে যোগ দেবে, তাকেই এইসব পদগুলি দেওয়া হবে।" (বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ১০-১১)

এখন এইসব কথার ভিতরের অতিরঞ্জনের দিকগুলি আমাদের কাছে হাস্যকর ঠেকতে পারে। কিন্তু এইসব অতিরঞ্জিত ভাষণের পিছনে বিপ্লবের যে স্বপ্ন ছিল, দেশকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের যে কল্পনা ছিল জাতির ইতিহাসে তা ব্যর্থ হয়নি। এই বীজই একদিন অঙ্কুরিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের জীবনে এই স্বপ্ন ও কল্পনা একদিন বাস্তব রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অরবিন্দের মতো মানুষ শতাব্দীর প্রারম্ভে মেদিনীপুরের চাঁদমারিতে নিজের হাতে বন্দুক নিয়েছিলেন স্বাধীনতার যুদ্ধের তালিম নিতে। ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ক্ষেত্রে বেশি দূর গড়ায়নি, কিন্তু তাঁর হাতের বন্দুক সেদিন নিশানা দিয়েছিল যে ইতিহাসের বেগ কোনদিকে বইবে: অরবিন্দ নিজে সামরিক ক্ষেত্রে যাননি, কিন্তু সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন। ইতিহাসের নিয়মই এই যে এক পুরুষ যা ভাবে, যে চিন্তাকে রূপ দিতে চেষ্টা করে,—পরবর্তী পুরুষ সেই ভাবনাকে গ্রহণ করে বলিষ্ঠ ও সার্থক ভাবে রূপ দেয়। সুভাষচন্দ্রের জীবন আলোচনায় অরবিন্দের স্বপ্ন ও কল্পনার একটা স্থান আছে বই কি! অরবিন্দ হেমচন্দ্রকে গীতা ও তরবারি দিয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে যুদ্ধ পরিচালনায় রত তখনও তাঁর সঙ্গে গীতা ও অস্ত্র! ইতিহাসের পূর্বাপর ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিতই হয়েছে। সেই ধারার ক্রম অনুসরণ না করে সুভাষের জীবনী আলোচনা সম্ভব নয়।



মাষ্টার মশাই :   বেণীমাধব দাশ

অরবিন্দ-নিবেদিতা সাক্ষাৎকার। বিধাতা যেন নিজের হাতে সেদিন ঘটনার পর ঘটনা যোজনা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন—বাংলায় বিপ্লববন্যা আনার জন্য ঠিক যেখানে যেটি দরকার সেখানে ঠিক সেই যোগাযোগটি অভ্রান্ত ভাবে তাই সাধিত হচ্ছিল। এই ১৯০২ সালেই নিবেদিতা ও অরবিন্দের মধ্যে শুধু সাক্ষাৎ নয়, বিপ্লবের নীতি ও কৌশলের ব্যাপারে ঐকামত ঘটেছিল—এবং তাও কলকাতায় বসে নয়, বাংলায়ও নয়, সুদূর বরোদায়।

স্বামীজীর মৃত্যুর পর সেপ্টেম্বর মাসে নিবেদিতা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে বক্তৃতা দিতে সুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সুপ্ত জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করা। সর্বত্রই তিনি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বরোদার গায়কোয়াড় তাঁকে নিমন্ত্রণ করায় তিনি অক্টোবর মাসে বরোদায় যান। তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে অরবিন্দও এসেছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত করার বিষয়ে উভয়েই একমত হলেন। বিপ্লবপন্থায়ও দুজনের আস্থা সমান গভীর ছিল। নিবেদিতা অরবিন্দকে বলেছিলেন: "কলকাতা আপনাকে চায়। আপনার উপযুক্ত স্থান বাংলা দেশ।" অরবিন্দ উত্তর দিয়েছিলেন: "না, আমি অন্তরালে থাকব। আমার কাজ মানুষ তৈরী করা।" নিবেদিতা অরবিন্দের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: "আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন। আমাকে আপনার বন্ধু বলে জানবেন।"

নিবেদিতার কথা ও কাজ বরাবরই ছিল অভিন্ন। অতএব বাংলায় এসেই তিনি অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হলেন। বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

অরবিন্দ-সরলা দেবী সংঘর্ষ। বিপ্লবের ইতিহাসে শুধু মিলনের ঘটনাই ঘটেনা, বিরোধও মাঝে মাঝে অনিবার্য হয়ে ওঠে। সরলা

দেবী ও পি, মিত্রের মধ্যেও একটা বিরোধ ছিল,—কেননা সরলা দেবী বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না, পি. মিত্র বিপ্লব চাইতেন। তবে সরলা দেবী অবশ্যই দেশের স্বাধীনতা চাইতেন। যাই হোক, অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটেছিল অন্য ব্যাপারে। বাংলা দেশে সেই সময় যেসব স্বদেশ সাধক সমিতি ছিল, যেমন অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি, সরলা দেবীর আখড়া, বাঁকুড়ার দল, আড়বেলের দল ইত্যাদি গোষ্ঠীর যুবকরা অরবিন্দ-বারীন্দ্রের দলে যোগ দিতে সুরু করে। সরলা দেবী তাতে নিজের নেতৃত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, টাকার প্রয়োজনে গুপ্ত সমিতির পক্ষ থেকে ডাকাতি সুরু করা হয়েছিল। ১৯০২ সালেই বাংলায় প্রথম স্বদেশী ডাকাতি হয়। সরলা দেবী তাতে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হয়ে পুণায় গিয়েছিলেন তিলকের কাছে তাঁর মতামত জানাতে; তিলক তাঁকে বলেন যে যদিও তিনি ডাকাতির সমর্থক নন তবু প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে তিনি কিছুই বলবেন না। সরলা দেবী বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হলেন; ক্রমে তিনি বাংলার রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে এই ডাকাতি জিনিসটাকে সুভাষচন্দ্রও সমর্থন করেন নি। তিনি বরং এর প্রতি বিরূপই ছিলেন।

১৯০৩। সুভাষ এবার ছয় বছর বয়স পেরিয়ে সাত বছরে পা দিলেন। এই বয়সে ব্যক্তির মন ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে ও নির্দিষ্ট আকারও নিয়ে নিতে শুরু করে। কোনো ব্যক্তির জীবন আলোচনা করতে গেলে এই বাল্যাবস্থার বয়সগুলিতে তাঁর বিকাশের ধারা বিশেষভাবে অনুসরণ করা দরকার। পরিবার ও স্কুলের গণ্ডীতে সুভাষ এ সময় কী ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করছিলেন তাও জানা দরকার। এই দুই স্থানের সীমার বাইরে যাবার অধিকার এখনো তিনি অর্জন করতে পারেন নি। জানকীনাথ বসুর বাড়ির নিয়ম ছিল ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবার সময়

ছাড়া মা বাবা বা আত্মীয়দের সঙ্গে ভিন্ন বাড়ির সীমার বাইরে যেতে পারবে না। তাদের খেলাধূলার ব্যবস্থা বাড়ির ভিতরেই ছিল। বাড়িতে ভাইবোন ও অন্যান্য ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি এত বেশি সংখ্যায় ছিল যে খেলার সঙ্গীর অভাব ছিলনা। অবশ্য এসব সত্ত্বেও বাবার মৈত্রী নিয়মের বিরুদ্ধতা করেও সুভাষকে বাইরে যেতে হয়েছিল, কেননা বাইরের জগৎ তাঁকে দুর্নিবার আহ্বান পাঠিয়েছিল ;—কিন্তু সেকথা যথা সময়ে।

সুভাষ বড় পরিবারে জন্মাবার ফলে যে সব অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন আগেই সেগুলির উল্লেখ করেছি। কিন্তু বড় পরিবারে মানুষ হবার পক্ষে কয়েকটি সুবিধার কথাও বলেছেন তিনি। সামাজিক বোধের দিক এবং বাড়ে ব্যক্তির আত্মপরতন্ত্রতা কমে। আধুনিক যুগের মানুষ যে বহুল পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক তার কারণ আধুনিক পরিবারের গঠন-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও অনেক পরিমাণে নিহিত। শিল্প যুগটাই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির চিরকালীন নাড়ীর যোগ ছিন্ন করে দিয়েছে. আধুনিক শিল্প-সহরের মানুষরা যতটা যূথবদ্ধ ততটা সমাজবদ্ধ নয়। এমনকি ঐতিহ্য ও কালানুমোদিত রীতি ও প্রথার সঙ্গেও তাদের বিচ্ছেদ বহুল পরিমাণে ঘটে গেছে। আধুনিক সেকুলার বা ধর্মসম্পর্কহীন ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাধারা মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বাড়িয়ে দেয়, জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাগুলিরও সেই ভূমিকা। যেহেতু পরিবারের গঠন এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, অতএব আধুনিক পরিবারও ক্ষুদ্র এবং পিতামাতা ও দু তিনটি সন্তানকে নিয়েই গঠিত হয়ে থাকে। সুভাষ আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিজীবী পরিবারে জন্মালেও সে পরিবারটি ক্ষুদ্র আত্মকেন্দ্রিক ছিলনা ;—সুভাষের মানস গঠনে তাই আত্ম বা স্বার্থ-কেন্দ্রিক চিন্তাধারার বদলে একটা উদার, অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, বহুকে নিয়ে তৃপ্ত মনোভাবের প্রভাব পড়েছিল। 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' জীবন ধারণেই যে মানবজীবনের সম্পূর্ণতা, সুভাষ

অবশ্যই তাঁর পরিবার থেকে এ দীক্ষা পেয়েছিলেন। এমন কি তিনি এ শিক্ষাও লাভ করেছিলেন যে শুধু নিকট বা দূর আত্মীয়ই নয়, অনাত্মীয়, ভৃত্য সকলেই মর্যাদার, যত্নের ও আন্তরিক ব্যবহারের দাবী রাখে,—শুধু তারাও নয়, গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, ময়ূর, পাখি, বেজি এদেরও মানবপরিবারের সদস্য রূপেই গণ্য করতে হয়। তাঁদের বাড়িতে এই জীবগুলি বিশেষ আদরের সঙ্গে প্রতিপালিত হত।

এই পারিবারিক পরিবেশ সুভাষের চিত্তের প্রসারের পক্ষে অনুকূল ছিল, কিন্তু আবার তাঁকে কতকটা গোপনচারীও করে তোলার পক্ষে এই পরিবেশ কাজ করেছিল। এত বড় বাড়িতে এত লোকজনের ভিতর সুভাষ স্বচ্ছন্দে নিজেকে, নিজের একান্ত গোপন ভাবনাকে আড়াল করে রাখতে পারতেন, সবদা কোনো অনুসন্ধিৎসু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁকে পীড়িত করে তুলত না। নিজের চারপাশে তাঁর একটা আব্রু ছিল। স্পর্শকাতর, সংবেদনশীল বালকের কল্পনার ও অনুভবের জগৎ সংগুই প্রসারিত হয়, বয়স্কদের অত্যধিক মনোযোগ সেই প্রসারকে ক্ষুণ্ণ করে, ব্যাহত করে,—বালকের দূরবিসারী কল্পনাকে বিদ্রুপবিদ্ধ করে তারা আমোদ পায়। সুভাষ যেন বিধাতার চক্রান্তেই একটা আড়াল পেয়ে গিয়েছিলেন, নিজের ভাব ও কল্পনাকে অনুসরণ করতে তাতে তাঁর সুবিধাই হয়েছিল।

সুভাষ ছিলেন অতিশয় লাজুক বালক—এই লাজুকতার স্বভাব তাঁর কোনোদিন কাটেনি। যখন তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত নেতা, অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ও সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন—সেই সময়ও তাঁর স্নেহকাতর হৃদয় আর লাজুক স্বভাব অন্তর্হিত হয়নি। কটকের সরল, আর্দ্র, মুগ্ধ বালকটি পরিণত বয়সের গম্ভীরাত্মা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যেও নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কোনো কোনো দুর্লভ দুর্বল মুহূর্তে এই

বালকের আত্মপ্রকাশ দেখা যেত ;—তখন সুভাষ হয়ে যেতেন যেন একেবারেই সেই লাজে লাজানো আবেগভরা শিশু।—

স্কুলে সুভাষের মন্দ কাটছিল না। কোথাও কোনো অসঙ্গতি তখন পর্যন্ত তাঁর ঠেকেনি। একটা নতুনত্বের আকর্ষণ ও রোমাঞ্চও নিশ্চয়ই স্কুলে ছিল। বিশেষত স্কুলে যাওয়ার ফলে বাইরের জগৎটার সঙ্গে একটা নতুন সম্পর্ক তাঁর স্থাপিত হয়েছিল। স্কুলে চেনা মুখও ছিল—তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়ত। স্কুলে প্রবেশের কিছুকালের মধ্যে একটা কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। স্কুলে প্রবেশের সময় ইংরেজি জ্ঞান তাঁর সামান্যই ছিল—অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত। কিন্তু স্কুলে কথাবার্তা লেখাপড়া সবই হত ইংরেজিতে—তা তিনি বুঝতেনই বা কী করে, কাজ চালাতেনও বা কী করে সেকথা ভেবে পরবর্তী জীবনে নিজেই তিনি কৌতুকমিশ্রিত বিস্ময়বোধ করেছেন। আসলে কাজ চলে নিজের ধারায়, প্রয়োজনে উপায় আপনিই হয়ে যায়। সেই উপায় হবার একটা নমুনা—হাসির ব্যাপারই বলতে হবে—এইরকম : একদিন ক্লাসে সব ছাত্রদের স্লেট আর পেন্সিল নিয়ে শিক্ষয়িত্রী বললেন লেখা সুরু করার আগে প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ পেন্সিল ছুঁচলো করে নেয়। সুভাষ আর সুভাষের মামা রণেন্দ্র এক ক্লাসেই পড়তেন। রণেন্দ্রের পেন্সিলটির চেয়ে সুভাষের পেন্সিলটি ভালো ছুঁচলো হয়েছিল, আর শিক্ষয়িত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সুভাষ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : Ranendra mot I shor—অর্থাৎ রণেন্দ্রের পেন্সিল মোটা রয়ে গেছে (mot = মোটা) আর আমারটি সরু হয়েছে (shor = সরু)। সুভাষ ইংরেজিতে চমৎকার কথা বলতে পেরেছেন বলে বেশ স্বস্তিবোধ করেছিলেন সেদিন—কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে তাঁর অদ্ভুত ইংরেজি বাক্যটিতে ইংরেজি শব্দ ছিল সাকুল্যে একটা—I.

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব। লর্ড কার্জন ছিলেন এই সময় ভারতের বড়লাট। বছরের গোড়াতেই তিনি দিল্লীতে মহাসমারোহের সঙ্গে একটি দরবার আহ্বান করেন—রমেশ দত্ত বলেছিলেন: The Durbar of 1903 is a mockery and a delusion. তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় বিল, কলকাতা কর্পোরেশনকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার চেষ্টা, সংবাদপত্র দলনের উদ্দেশ্যে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ব্যবহার—ইত্যাদি তাঁর জনপ্রিয়তা হারাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁকে আর একটা দুর্মতি পেয়ে বসল—বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য তিনি দৃঢ় পণ করলেন। বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তারই ফলে দুর্বার আকার ধারণ করতে পেরেছিল।

বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব অবশ্য নতুন ছিলনা। ১৮৬৮ সালে স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে বঙ্গদেশ অত্যন্ত বিশালকায়, এতবড় একটা প্রদেশ প্রশাসনের পক্ষে অসুবিধাকর। ১৮৭৪ সালে চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে আসামকে বাংলা থেকে পৃথক একটি প্রদেশ রূপে গঠন করা হয়। গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও শ্রীহট্ট (সিলেট) এই তিনটি বঙ্গভাষাভাষী জেলাকে তখনই আসামের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। বাংলা এখনও বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুরের সমবায়ে গঠিত রয়ে গেল। তখন ভারতের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশ ছিল এই বাংলা। তার আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ, রাজস্ব ছিল ১১ কোটি টাকা। ১৮৯৬ সালে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর চার্লস এলিয়ট আবার প্রস্তাব করেন যে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ আসামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হোক। হাইকোর্টের জজরা এই প্রস্তাবের নিন্দা করে বলেন: "The proposal seems to be a step in the wrong direction...... It seems, therefore, that a transfer of the Chittagong Division

to the Government of Assam as at present constituted would not fail to be a retrograde and mischievous step."

এই মন্তব্যের ফলে প্রস্তাবটি চাপা পড়ে যায়। কিন্তু ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লর্ড জর্জ হ্যামিলটনকে লেখেন। ১৯০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের গেজেটে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে সরকারের ইচ্ছা আবার প্রচারিত হয়। চট্টগ্রাম ডিভিশন এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা বাংলা থেকে কেটে নিয়ে আসামে জুড়ে দেবার প্রস্তাব কার্জন সরকার করেছিল। এই প্রস্তাব প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। অমৃত বাজার পত্রিকা ১৪ই ডিসেম্বর লিখেছিল যে এই বৈপ্লবিক ও সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় প্রস্তাব সারা দেশে বিপুল আলোড়ন আনবে। ইণ্ডিয়ান মিরর, বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, চারু-মিহির, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দ বাজার পত্রিকা, জ্যোতি, সঞ্জীবনী, প্রতিনিধি, ট্রিবিউন ইত্যাদি পত্রিকা একযোগে এই প্রস্তাবের নিন্দা করে। ইংরেজদের বাণিজ্য সঙ্ঘ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ও তাদের পত্রিকা ইংলিশম্যানও প্রস্তাবটির নিন্দা করে। পূর্ববঙ্গের শহরে ও গ্রামাঞ্চলে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচশত জনসভা আহূত হয়েছিল এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানাবার জন্য। হাজার হাজার পুস্তিকা ও ইস্তাহার প্রচারিত হয়েছিল প্রস্তাবটির বিপক্ষে।

লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন তাঁর প্রস্তাবের প্রতি জনসাধারণের সত্যকার বিরূপতা কতখানি তা নিজেই যাচাই করতে। অচিরেই তিনি নিঃসংশয় হলেন যে তাঁর প্রস্তাবটিকে বাঙালীরা যে কোনো মূল্যে নাকচ করে দেবে। তিনি চিন্তান্বিত হলেন। তাহলে বাংলার জাতীয়তাবাদ তো একটা মুখের কথা মাত্র আর নেই, শিক্ষিতদের বিলাসবস্তুও নয়, ওতো একটা বাস্তব

শক্তি! ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের পক্ষে এ একটা অশুভ সঙ্কেত—একদিন না একদিন তো এর সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া করতেই হবে। তাহলে আর কালহরণ করে লাভ কী? কার্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, বাংলার জাতীয়তাবাদকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করলেন, বাঙালী জাতিও সেই প্রস্তাবকে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে ফেলে দিয়ে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ হল। বাংলার সেই প্রথম সার্থক জাতীয় সংগ্রামের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র এই নেতার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, তাঁর বক্তৃতাদিও শুনেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁকে মুগ্ধ বা প্রভাবিত করতে পারেননি—তার কারণ সুরেন্দ্রনাথ যে জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, সুভাষ তাকে দুর্বল ও আপসধর্মী বলে পরিত্যাজ্য মনে করতেন। আসলে সুরেন্দ্রনাথের যুগ ও সুভাষচন্দ্রের যুগের মধ্যে ছিল অনেকখানি ব্যবধান—এই দুই যুগের মাঝখানে অরবিন্দ-নিবেদিতা-বিপিন পাল-তিলক নব্য জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছেন ও বিপ্লবীরা রক্তের অক্ষরে জাতির চিত্তে সেই জাতীয়তাবাদকে মুদ্রিত করে দিয়ে গেছেন। সুভাষ তাই সুরেন্দ্রনাথের আদর্শকে নাকচ করে দিয়েছেন। এমন কি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি লড়াইও করেছেন। কিন্তু বাংলা ও ভারতের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের দানের গুরুত্ব তাতে ম্লান হয়নি। সুভাষ যে যুগে, যে বয়সে অন্তরের মণিকোঠায় স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রবীজকে গ্রহণ, ধারণ ও পালন করতে শিখছিলেন—যখন বাংলার জাতীয়তাবাদের দ্বারা তিনি আচ্ছন্ন ও গ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন, সেই তাঁর বাল্য বয়স একান্তভাবে সুরেন্দ্রনাথেরই যুগ ছিল।

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪৮ সালে—সুভাষচন্দ্রের জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ও বাংলার নবজাগৃতির দ্বিতীয় পর্বে। তাঁর পিতামহ

যেমন ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল, তেমনি তাঁর পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রগতিপন্থী, ব্রাহ্ম, ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বাসী। বিশ বছর বয়সে ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ড যান আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে; পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে সসম্মানে পরীক্ষা পাশও করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এক জাহাজেই গিয়েছিলেন তাঁর সমবয়সী রমেশচন্দ্র দত্ত, তিনিও আই. সি. এস. হন। এঁরা দুজনেই পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পরীক্ষায় পাশ করলেও সুরেন্দ্রনাথের বয়স নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির দরুণ চাকরি পাওয়া নিয়ে গোলযোগ ঘটেছিল। শেষে চাকরি তিনি পেলেন, কিন্তু ভারতে ফিরে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি ওপরওয়ালার অসন্তোষভাজন হন, তাঁর চাকরি যায়। প্রতিকারার্থে আবার তিনি বিলেত যান ১৮৭৪ সালে। কিছু ফল তো হলই না, উপরন্তু তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার চেষ্টা করলে সে সুযোগও তাঁকে দেওয়া হয়নি। সেই তরুণ বয়সে উচ্চাভিলাষী সুরেন্দ্রনাথের সামনে জীবিকা অর্জনের সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার বিলেতযাত্রা ও আপীল করার ব্যাপারে তাঁর সব টাকাও তখন শেষ হয়ে গেছে, পিতাও মৃত। সর্বস্বান্ত সেই যুবক সেদিন উপলব্ধি করলেন: "আমি বুঝলাম যে আমাকে দুঃখভোগ করতে হল শুধু এই কারণে যে আমি ভারতীয়। ভারতের জন-সম্প্রদায় তখন সংগঠিত নয়, জনমত বলে কোনো জিনিস নেই এবং দেশের প্রশাসনে ভারতবাসীর কথা বলার কোন উপায়ও নেই। যৌবনের সমস্ত উত্তপ্ত আবেগ দিয়ে আমি অনুভব করলাম যে আমরা আমাদের জন্মভূমিতে দাসানুদাস মাত্র, হুকুম তামিল করাই আমাদের একমাত্র কাজ। আমার প্রতি যে অন্যায় করা হল সে আমাদের দেশবাসীর অসহায় অক্ষমতার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। যে দুঃখ আমি পেয়েছি আমার জীবনে, অন্যদেরও কি ভবিষ্যতে সেরকম দুঃখ ভোগ করতে হবে? নিশ্চয়ই

করতে হবে, আমার মনে হল, যদি না আমরা ভারতবাসীরা ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে আমাদের প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারি ও আমাদের অধিকার রক্ষা করতে পারি। সেই সর্বনাশ ও অন্ধকারময় ভ্রূকুটিকুটিল দুর্ভাগ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি গ্রহণ করলাম এই সঙ্কল্প যে এই বিষয়ে আমার অসহায় দেশবাসীকে সাহায্য করার কাজে আমি ব্রতী হব।" (A Nation in Making pp. 30-31)

সেবার সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে ছিলেন ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৮৭৫ সালের মে মাস পর্যন্ত—এই তেরো মাস। এই সময়ে শুধু যে তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল তাই নয়, তিনি সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতেও সুরু করলেন। ইস্ট মোলেমি নামে এক গ্রামে তিনি একখানি ঘর নিলেন আর রাতদিন সেখানে পড়াশোনা করতে লাগলেন, বিশেষত ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও আন্দোলন সম্পর্কে। মাজ্জিনি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করলেন. তিনি লিখছেন যে সে বছরটা ছিল তাঁর জীবনে প্রস্তুতির বছর। পরপদানত স্বদেশের সেবায় নিঃস্বার্থ জীবনোৎসর্গের আদর্শ যত তাঁর হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ততই তাঁর হতাশা ও মনঃপীড়া কেটে গেল, তিনি দেশে ফিরলেন নতুন মানুষ হয়ে।

বিদ্যাসাগর তখনও জীবিত। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপনার চাকরি দিয়ে ডেকে নিলেন। অধ্যাপকরূপে সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রদের সাহচর্যে আসার সুযোগ পেলেন ও সেই সুযোগে তিনি ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকলেন এবং কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে ছাত্র সংগঠনেও তিনি মন দিলেন। এরপর ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই তিনি ভারত সভা—Indian Association—প্রতিষ্ঠা করেন একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র রূপে। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকজন Bengal Association নামে একটি রাজনৈতিক

সংস্থা গড়তে চেয়েছিলেন, যদিও কার্যত সেটা ঘটেনি। সুরেন্দ্রনাথ দেখলেন শুধু বাংলার কথা চিন্তা করলে হবে না, সারা ভারতের ঐক্যের কথা ভাবতে হবে এবং সর্বভারতীয় সংগঠন গড়তে হবে। তাই তিনি উপরোক্ত নামটি বেছে নিলেন। তাঁর সামনে তখন চারটি লক্ষ্য ছিল :

1. The creation of a strong body of public opinion in the country.

2. The unification of the Indian races and peoples upon the basis of common political interests and aspirations.

3. The promotion of friendly feeling between Hindus and Mohammedans.

4. The inclusion of the masses in the great public movements of the day.

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৯)

অর্থাৎ দেশে একটা শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলা, সাধারণ রাজনৈতিক স্বার্থ ও অভীপ্সার ভিত্তিতে ভারতের সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করা, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের বিকাশ ঘটানো, সেদিনের মহতী গণআন্দোলনগুলির মধ্যে জনসাধারণকে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হল তাঁর লক্ষ্য। বোঝা যায়, প্রখর ও পরিণত রাজনৈতিক চেতনা নিয়েই সুরেন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্রে নেমেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ এই নতুন জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন, একবার নয়, বারবার। প্রথমবার তিনি গিয়েছিলেন লাহোর, অমৃতসর, এলাহাবাদ, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়। পর বৎসর তিনি যান মাদ্রাজ, বম্বে, সুরাট, আমেদাবাদ, পুণা ইত্যাদি শহরে। এই সব স্থানে তিনি জনসভায় বক্তৃতা

দিয়েছিলেন, বিপুল পরিমাণে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ভারত সভার শাখাও স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার বহু আগেই সুরেন্দ্রনাথ একটি নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন এবং ১৮৮৫ সালে যাঁরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন, দশ বৎসর আগেই সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত যুবক বয়সেই তাঁদের চেয়ে অধিক রাজনৈতিক চেতনা, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মদক্ষতা ও নেতৃত্বগুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার প্রথম অধিবেশন হয় বম্বে শহরে তখন সে খবরটি পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল, শুধু এই ভয়ে যে তাঁকে এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে না রাখলে নেতৃত্ব তাঁর হাতে চলে যাবে। কিন্তু একথা বুঝতেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের বিলম্ব হয়নি যে সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে কংগ্রেস কখনোই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে না। সুরেন্দ্রনাথ তখন অতিশয় জনপ্রিয়। নির্ভীক সাংবাদিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে ১৮৮৩ সালে ৫ই মে থেকে ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত দু মাস তিনি যখন জেল খেটেছিলেন তখনই তিনি বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত নেতা এবং ভারতের নির্ভীক জাতীয়তাবাদী নেতাদের অগ্রগণ্য বলে পরিচিত হয়ে গেছেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৮৮৩ সালেই তিনি কলকাতায় জাতীয় কনফারেন্সের অধিবেশন ডাকেন। অ্যালবার্ট হলে এই অধিবেশন বসেছিল ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সারা ভারত থেকে প্রতিনিধিরা কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৮৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ আবার ভারত ভ্রমণে বের হন এবং ১৮৮৫ সালে কলকাতায় দ্বিতীয়বার জাতীয় কনফারেন্সের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, ২৫শে থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি তখন সারা ভারতে শিকড় গেড়েছে। পরের বছর, ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগ দেন। সেই থেকে জাতীয় কনফারেন্সের কাজ চাপা পড়ে যায় ও কংগ্রেস

ঝাঁকিয়ে ওঠে। ১৮৯৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রথম বার।

ইতিপূর্বেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর কথা আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজের সময় এসেছিল এই ১৯০৩ সালে ও তারপর—যখন বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের তিনিই নেতৃত্ব দান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে লিখেছিলেন যে সমগ্র বাঙালী জাতির একচ্ছত্র অধিনায়ক পদে তাকে বৃত করা হোক। কার্জনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে তিনি সারা ভারতে এই সময় অসাধারণ মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

বিপ্লবী সমিতি। নিবেদিতা ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় ফিরে আসেন। এসেই অরবিন্দ-বারীন্দ্রের গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিতে যোগ দিলেন। বারীন্দ্র কুমার লিখেছেন: "সিস্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব-কেন্দ্রটিকে তাঁর লাইব্রেরির জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় এক দেড় শ' বই দিয়েছিলেন। কথা ছিল রাজনীতির স্কুল করে ইতিহাস, জীবনী ও ডিগবী, রমেশ দত্ত, নৌরজী আদির অর্থনীতির বই প্রভৃতি পড়িয়ে এখানে প্রথমে কতকগুলি পলিটিক্যাল মিশনারী গড়া হবে; এবং তার পরে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাদের পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্লবের ছোট বড় মৌচাকে ছেয়ে দেওয়া হবে। আমি হলুম প্রথম ছাত্র এই রাজনীতির ক্লাসের। তারপর জুটল এসে দেবব্রত, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ইন্দ্র নন্দী, এই ধরণের অনেক মানুষ। সখারাম গণেশ দেউস্কর মশাইকে এই বিপ্লব-কেন্দ্রটির সহিত পরিচয় করিয়ে দিলুম। দেশে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেবার এমন একটা দল আছে শুনে এই শিবাজী-ভক্ত মহারাষ্ট্রসন্তান তো আনন্দে অধীর। তিনি তখনই এসে যতীনদার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে গেলেন এবং স্কুলের অর্থনীতির ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন।" —স্বদেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্যায়ে কারা এসে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের নাম মোটামুটি জানা গেল। সখারাম, দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ, নিবেদিতা—এঁরা প্রত্যেকেই উজ্জ্বল, প্রতিভাবান ব্যক্তি। পি. মিত্রের সাহচর্যও ছিল। তিনি প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা করে গুপ্ত সমিতিতে চাঁদা দিতেন। ঠাকুর পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বারীন্দ্রকে বিপ্লবকর্মের জন্য এক হাজার টাকা দান স্বরূপ দিয়েছিলেন।

নিবেদিতা। নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন—মাত্র এটুকু তথ্যই যে তাঁর সম্পর্কে উদ্ধারযোগ্য তা নয়। তিনি এই সময়ে ভারতবর্ষে খাঁটি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনিই ভারতে প্রথম 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেন। বাঙালীকে, ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীকেই,—জ্বলন্ত ঈশ্বরপ্রেম ও বৈরাগ্য কী ভাবে ভারতের মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তা নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রথম বুঝিয়েছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার জীবনের মূল জিজ্ঞাসা ছিল ঈশ্বর জিজ্ঞাসা। তাঁর জন্ম ধর্মযাজকের পরিবারে, স্বামীজীও তাঁকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়েছিলেন, যা ভারতের গুরুগণ ঈশ্বরলাভার্থী শিষ্যদের দিয়ে থাকেন। স্বামীজীর জীবিত কালে প্লেগপীড়িত কলকাতাবাসীদের সেবা ও নারী শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ছাড়া জনজীবনের ক্ষেত্রে নিবেদিতার আর কোনো উদ্যম দেখা যায়নি। অথচ স্বামীজীর মৃত্যুর পরদিন তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত করার পর রাত্রে যখন বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীরা প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করছিলেন তাতে শোকনিমগ্না নিবেদিতাকেও যোগ দিতে আহ্বান করা হলে তিনি বলেছিলেন: "সন্ন্যাসীরা প্রার্থনা করছেন, কিন্তু আমার সময় নেই। স্বামীজী আমাকে একটি কাজের ভার দিয়ে গিয়েছেন, আমাকে তা পালন করতে হবে।" মঠ থেকে সেই রাত্রে বিদায় নেবার সময় অস্ফুট

কণ্ঠে তাঁকে শুধু বলতে শোনা গিয়েছিল: "গুরুদেব, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

সুভাষচন্দ্রের জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ঈশ্বরজিজ্ঞাসু নিবেদিতা কেন ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য এত ব্যগ্র হলেন? কেন তিনি ধাবিত হলেন বিপ্লবের পথে? কেনই বা ভারতে জাতীয়তাবাদ—রাজনীতিতে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানেও —প্রচারের জন্য তিনি আমৃত্যু পরিশ্রম করেছেন? সুভাষের জীবন-জিজ্ঞাসা ও কর্মধারার স্বরূপ বুঝতে গেলেও ঠিক এই প্রশ্নগুলিই অনিবার্যভাবে দেখা যায়। এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা তাই দরকার যে নিবেদিতা-কথিত সেই ইচ্ছা কী, সেই কাজ কী—যা স্বামীজী নিবেদিতাকে পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন? অরবিন্দ বলেছেন, তা হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করা।

কথাটা সত্যই মনে হয়, কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে স্বামীজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শোকাবনত চিত্তকে সংযত করে নিবেদিতা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে প্রজ্বলিত করার কাজ শুরু করেছেন। তিনি কলকাতায় একটি সভায় স্বামীজীকে ভারতের জাতীয় নেতা আখ্যা দিয়ে প্রচার শুরু করেন। এবং সেই প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন:

My role is to awaken the nation

অর্থাৎ, এই জাতিকে জাগ্রত করাই আমার কাজ। জুলাইয়ে স্বামীজীর মৃত্যু, সেপ্টেম্বরেই নিবেদিতা ভারতের উত্তর ও দক্ষিণে তাঁর একক ভ্রমণ শুরু করেন। দেশের প্রধান প্রধান নেতাদের সঙ্গে তিনি সংযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাতির হৃদয়ে তীব্র ভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য সর্বত্র জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালে বিপিন চন্দ্র পাল সম্পাদিত New India পত্রিকায় নিবেদিতা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Web of Indian Life-এর প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করতে সুরু করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল: এক, সমগ্র এশিয়ায় প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে একটা সভ্যতার ধারা বহমান, যে সভ্যতা পাশ্চাত্য বা জগতের অন্যান্য সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্র। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই এক অখণ্ড সভ্যতারই নানা রূপে প্রকাশ ঘটেছে। দুই, এশিয়ার এই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সভ্যতার জন্মস্থল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ থেকেই দর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা এশিয়ার সব দেশে বিস্তৃত হয়েছে। তিন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও বৈচিত্র্য ও বিরোধ আছে—তবু তাদের সকলের মধ্যে এক অখণ্ড ভারত সংস্কৃতি বহমান। জাতীয়তাবোধই ভারতের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিধায়ক শক্তি। জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত জীবন্ত করে তুলতে পারলেই ভারতের ঐক্য সুনিশ্চিত হবে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: Sister Nivedita has uttered the vital truths about Indian life.

নিবেদিতা বক্তৃতা করছেন, প্রবন্ধ লিখছেন, অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় শিল্পরীতির অনুসরণে প্রেরণা দিচ্ছেন, জগদীশচন্দ্র বসুকে তাঁর বিজ্ঞানগ্রন্থ লিখতে সহায়তা করছেন, একদিকে অরবিন্দের সঙ্গে বিপ্লবকর্মে যোগ দিচ্ছেন, অন্যদিকে গোখলে ও রমেশচন্দ্র দত্তের মতো নরমপন্থী নেতাদেরও সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে তাঁদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের কাজে যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে টেনে আনছেন —এ এক অভূতপূর্ব ব্যক্তিত্ব; ভারতের মুক্তি ও উত্থানের জন্য আত্মনিবেদনই এই ব্যক্তিত্বের বিকাশের মূল রহস্য। ঈশ্বর-সাধিকা, সন্ন্যাসিনী নিবেদিতা গভীর তপস্যায় মগ্ন হয়ে যেতেন। ধ্যান করতে করতে সমাধির অবস্থায় পৌঁছে যেতেন তিনি। আবার চিত্তের সেই

অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থেকেই তাঁর বহুবিধ বহিরঙ্গ কাজ সুচারুভাবে ও তীব্র গতির সঙ্গে তিনি সম্পন্ন করতেন। বঙ্কিমের প্রচারিত তত্ত্বের এমন বাস্তব মূর্তি সত্যই সেদিন বাঙালীর দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে দেখাও কৌতূহলী জনতার দেখা ছিল না। নিবেদিতাকে দেখে বাঙালী নতুন জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার রক্তরাঙা সাধনার পথে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল —এবং নিবেদিতার পথের মতো সেও ছিল ভক্তিসাধনারই পথ।

কেন আমরা নিবেদিতার কথা এত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি? কারণ নিবেদিতার যে চরিত্র ও নিবেদিতার যে ভাব তারই বৃহত্তর ও পূর্ণতর প্রকাশ আমরা পেয়েছি সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। নিবেদিতা নিঃসন্দেহে সুভাষের পূর্বসূরী—যদিও সুভাষের কর্ম ও প্রকাশ ক্ষেত্র ব্যাপ্ততর, তবু নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর গভীর মানস আত্মীয়তা ছিল। যদিও উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়নি এবং সেজন্য সুভাষেরই আপশোষ হবার কথা।

ডন সোসাইটি। এই সময় কলকাতায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটি স্থাপন করেন। বাংলায় জাতীয় ভাবের প্রচারে ডন সোসাইটির অবদান আছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর তিন শিষ্য— বিপিন পাল, সতীশ মুখার্জি ও অশ্বিনী কুমার দত্ত বাংলায় জাতীয়তা-বাদের সাধনায় অগ্রপথিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যদের কাজ দেখে মনে হয়, ভারতের জাগরণ, মুক্তি ও উত্থান এই দুই ধর্মগুরুরও অভিপ্রেত ছিল। ধর্মোপদেশ বিতরণের আড়ালে এঁরা নিঃশব্দে আরও কী কাজ করেছিলেন কে জানে?

বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যধারা। ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবায়োজন শুধু ভারতের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি— বিদেশেও কাজ সুরু হয়েছিল। বিদেশে প্রথম ভারতের স্বাধীনতা-কামী সমিতির সংগঠক ছিলেন শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা। তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, ব্যারিস্টার ও অসাধারণ সাফল্যের

অধিকারী পুরুষ। কিন্তু র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট হত্যার পর তিলক গ্রেপ্তার হলে সম্ভবত তাঁরও গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা ঘনিয়ে ওঠে—তখন তিনি চিরতরে দেশ ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী। তাঁর বিদেশে কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা যথাসময়ে আলোচনা করব। এখানে কেবল এটুকু উল্লেখযোগ্য যে তাঁর সহকর্মিনীরূপে আর একজন বিপ্লবী নারীও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন—তিনি মাদাম কামা (সম্পূর্ণ নাম মাদাম ভিখাজী রুস্তম কে. আর. কামা)। মাদাম কামার স্বামী ছিলেন বম্বে শহরের একজন প্রতিষ্ঠাবান পার্শী। পুণা ও বম্বে শহরে যে প্লেগ দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে মাদাম কামা তীব্র মত পোষণ করতেন ও এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯০২ সালে তিনি ইয়োরোপে চলে যান। বিদুষী ও বিপ্লবিনী এই নারী বিদেশে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনপ্রসঙ্গে বিদেশে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের কথা আলোচনা করা একান্তভাবে আবশ্যক। কারণ তিনি নিজেও এই আন্দোলনের অন্যতম শরিক ও পরিচালক হয়ে উঠবেন।

১৯০৪। সুভাষচন্দ্রের বয়স সাত বছর পূর্ণ হয়ে গেল। আট বছরে পড়লেন তিনি। পি. ই. স্কুলেও তাঁর দুই বছর পার হয়ে গেল। স্কুলের অসুবিধার দিকগুলি এখন তাঁকে অল্প অল্প করে পীড়িত করতে লাগল। আগেই বলেছি, স্কুলটি ছিল ইংলণ্ডের স্কুলের আদর্শে পরিচালিত। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে সেটাই ছিল অসুবিধার কারণ। কোনো ভারতীয় ভাষা স্কুলে শেখানো হত না। পি. ই. স্কুলের ভারতীয় ছাত্ররা তাই মাতৃভাষা শিক্ষার কোনো সুযোগ পেতনা। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় দানের কোনো আয়োজনও এখানে ছিল না, কারণ তা অনাবশ্যক মনে করা হত। ছাত্রদের বাইবেল পড়ানো হত। পড়াবার পদ্ধতিটিও ছিল অনুপযুক্ত—কারণ বাইবেলের কাহিনী ও বাণীগুলির মর্মার্থ বোঝাবার দিকে শিক্ষকদের

ঝোঁক ছিল না, হয়তো নিজেরাও তাঁরা তা বুঝতেন না। যাঁরা বাইবেলের পাঠ দিতেন তাঁরা অবশ্যই বাইবেলের ইংরেজি সংস্করণের ভাষার আক্ষরিক অর্থ বুঝতেন,—আর তারই আলোয় তাঁরা বাইবেলের বাণীকে ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতেন। তার ফলে বাইবেল শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের কাছেই দুর্বোধ্য থেকে যেত। ছাত্রদের বাইবেল মুখস্থ করতে হত—অন্তত: ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে সেটা হত বিরক্তিকর। সুভাষচন্দ্র এই পি. ই. স্কুলে সাতটি বছর পড়েছিলেন, আর এই সাত বছরের প্রতিটি দিন তিনি বাইবেল মুখস্থ করেছেন। পরবর্তী জীবনে এই বাইবেল পাঠ সুভাষচন্দ্রের উপকারে এসেছিল নিশ্চয়ই, কেননা তিনি বলেছেন যে বাইবেলের রহস্য ও মর্মার্থ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন একসময়।

পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ভারত সংক্রান্ত কোনো বিষয়ই প্রায় ছিল না। ভূগোল ও ইতিহাস পড়ানো হত—তাও গ্রেট বৃটেনের। ল্যাটিন ভাষার পাঠ নিতে হত। ল্যাটিন শব্দরূপ মুখস্ত করতে হত ভারতীয় ছাত্রদেরও, কিন্তু সংস্কৃত শব্দরূপ মুখস্ত করার কোন দরকার তাদের ছিল না। গানের ক্লাসে তাদের সুর সাধতে হত "ডো, রে, মী, ফা" অনুসারে, সা, রে, গা, মা অনুসারে নয়। যে স-' গল্পের বই স্কুলে ছাত্রদের পড়তে হত ভারতীয় গল্প তাতে স্থান পেত না, ইয়োরোপের লোকপ্রচলিত উপকথা, ঐতিহাসিক কাহিনী প্রভৃতি ছিল সে-সব বইয়ের বিষয়বস্তু। এমনকি কোনো ভারতীয় নাম যদি উচ্চারণ করার দরকার পড়ত তবে ছাত্ররা সেই সব নামের ইংরেজি কায়দায় বিকৃত উচ্চারণই শিখত।

এই সম্পূর্ণ অভারতীয় পরিবেশে সুভাষচন্দ্রের লেখাপড়া চলছিল। তখন মনে করা শক্ত ছিল যে এই পি. ই. স্কুলের ছাত্র শ্রীমান সুভাষচন্দ্র বসু একদিন গভীর দেশপ্রেমিক হয়ে উঠবেন, জাতীয়তা-বাদই হবে তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁর মানস বিকাশের প্রথম পরিবেশটাই ছিল সম্পূর্ণ বিজাতীয়, দেশপ্রেমের অঙ্কুর সেখানে দগ্ধ,

নষ্ট হয়ে যাবার কথা। কারণ তিনি নিজেই লিখেছেন যে ছাত্রদের মনকে ইংরেজিয়ানার ছাঁচে ঢালাই করাই ছিল স্কুলটির শিক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য ;—আর সুভাষ সেখানে অধ্যয়ন করেছিলেন একটানা সাতটি বছর। তার অর্থ এই যে পাঁচ বছর বয়সে প্রথম যখন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের মন গঠিত হয়ে উঠবার উপক্রম ঘটে এবং বারো বছর বয়সে যখন মোটামুটি ব্যক্তির মানস বৈশিষ্ট্যগুলি দৃঢ় ও সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হয়ে যায়,—জীবনের সেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গঠন পর্বটাই সুভাষ কাটিয়েছিলেন ইংরেজিয়ানার পরিবেশে, ইংরেজের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুশীলনে, তাদের ধর্মীয় মতের চর্চায়। এর মধ্যে যে কোনো অন্যায়, অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা নিহিত ছিল তাও সে সময়ে তিনি বুঝতে পারেননি, কারণ তাঁর ধারণা ছিল শিক্ষালাভের এটাই একমাত্র ও স্বাভাবিক ধারা। তাঁর মনের মধ্যে তাই পি. ই. স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ মুখরিত হতে পারেনি। তার বালক মনের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে এই রকম শিক্ষা ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত এবং যা তিনি শিখছেন ও জানছেন তার কোথাও ভুল বা ফাঁকি বা উদ্দেশ্যমূলক কিছু নেই এবং যথার্থ শিক্ষাই তিনি লাভ করছেন। তাই তাঁর কথা : "এরকম সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে যে আমাদের স্কুল জীবন নিরানন্দে কেটেছে। বরং তার উল্টোটাই সত্য। প্রথম কয়েক বছর তো এখানকার শিক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী কিনা সে সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন ছিলাম না। যা আমাদের শেখানো হত আমরা সাগ্রহে তাই শিখতাম এবং আর ছাত্রের মতোই স্কুলের ধারার সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। এই স্কুলের একটা সুখ্যাতি ছিল যে এখানে সদাচারী ছাত্রছাত্রী তৈরী হয় আর আমরা সেই সুখ্যাতি রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। আমাদের মা বাবাও আমাদের অগ্রগতিতে মোটের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন বলে মনে হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকটও আমাদের সুনাম ছিল, কেননা

আমাদের বাড়ির ছেলে ও মেয়েরা যে যে ক্লাসেই পড়ুক না কেন সেই ক্লাসেই সাধারণত সে শীর্ষস্থান দখল করত।"

সুভাষচন্দ্রের স্কুল জীবনটা ছিল এইরকম,—স্বদেশবোধের কোনো বিকাশ সেখানে সম্ভব ছিলনা। তবু তিনি যে বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন সেটা আশ্চর্যের বিষয়। অরবিন্দের জীবনেও এই রকমই একটা ব্যাপার ঘটেছিল, যদিও অরবিন্দের বাল্য-কৈশোরের বিজাতীয় পরিবেশ ও বিজাতীয় শিক্ষা ছিল আরও দুর্ভেদ্য, কেননা সাত বছর বয়স থেকেই অরবিন্দ বিলাতে কাটিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র স্কুল থেকে জাতীয়তাবাদের ভাবধারা সংগ্রহ করেননি, করেছিলেন তাঁর স্বদেশের বৃহত্তর পরিবেশ থেকে, তাঁর যুগ থেকে : সেই ঐতিহাসিক ক্ষণটাই ছিল স্বাদেশিকতার বিকাশের কাল। সুভাষচন্দ্রের জীবনের কথা আলোচনা করতে যেয়ে এজন্যই আমরা তাঁর যুগের কথা, তাঁর সমকালীন ঐতিহাসিক পরিবেশের কথা এত বিশেষ ও বিশদভাবে আলোচনা করছি। সেই সময়ে যে সব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ভাব বা শক্তি সক্রিয় থেকে যুগটাকে ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়ে নতুন রূপ দিচ্ছিল, তাদের কথা বাদ দিয়ে সুভাষের জীবন-কাহিনী আলোচনা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। ব্যক্তি নিজেই নিজের ভিতর সম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সে অন্তর্লীন জীবনের ক্ষেত্রে। যে ব্যক্তি ইতিহাসের প্রবাহকে ধারণ করেন, সেই প্রবাহের নতুন দিক নির্দেশনা করেন ও তাতে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেন, তাঁকে ইতিহাসের ধারার মধ্যে স্থাপন করে দেখতে হয়—সম্পূর্ণ এককভাবে তাঁকে দেখলে সে দেখা যথার্থ হয় না। এই কথাটি মনে রেখেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবক লর্ড কার্জনকে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রস্তাবের জন্য য- দায়ী করা হোক না কেন, বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা যে আসলে কোনো ব্যক্তির নয়, ইংরেজের রাজ্য শাসনের এটা একটা নীতি ও কৌশল তা প্রমাণিত হয়েছিল যখন

কার্জনের পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মিন্টোও এই পরিকল্পনাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিলেন। কার্জন ব্যক্তি হিসাবে যে খুব খারাপ ছিলেন তাও নয়। রেঙ্গুন ও শিয়ালকোটে বৃটিশ সৈন্যদের হাতে দুবার দুটি ভারতীয় নারী লাঞ্ছিত হলে তিনি সৈন্যদের কঠোর শাস্তি বিধান করেছিলেন। ট্রান্সভালের স্বর্ণখনির জন্য ভারতীয় মজুর নিয়োগ করতে দিতে তিনি অস্বীকৃত হন। ভারতের প্রাচীন স্মৃতিসৌধ রক্ষা আইনেরও তিনিই প্রবর্তক; কিন্তু বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি তাঁর ছিল ভীষণ বিদ্বেষ। হিন্দু বাঙালী শিক্ষিতশ্রেণী তখন সারা ভারতের অগ্রগণ্য সম্প্রদায়—সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, ধর্মে, রাজনীতিতে তাদের প্রতিষ্ঠা সে সময়ে ছিল অবিসম্বাদিত। কিন্তু সেটা বিদ্বেষের কারণ নয়। ইংরেজেরা তখন বাঙালীর নব্য জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছিল। মহারাষ্ট্রে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টের হত্যার পর বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন পাল, নিবেদিতা প্রভৃতির বক্তব্য বাঙালীর ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্পর্কে তাদের সংশয়ান্বিত করে তোলে। শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী শ্রেণীর শক্তি ও সংহতিকে বিনষ্ট করে দেওয়ার আশু প্রয়োজন তারা অনুভব করেছিল। সেই প্রয়োজনবোধই কার্জনের মনে বাঙালী 'বাবু' সম্পর্কে ভয় ও বিদ্বেষ জাগ্রত করে তুলেছিল। কলকাতা কর্পোরেশন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বাঙালীর এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে তিনি বাঙালী বাবুর প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন! এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে তিনি অসাধু ও মিথ্যাবাদী বলে তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন। কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবটিকে কার্যকর করার সপক্ষে প্রশাসনিক সুবিধার উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর যুক্তি ছিল অসঙ্গতিপূর্ণ। কেননা বিহার ও ওড়িশাকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ও পূর্ববঙ্গকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার বদলে তিনি আসাম, বিহার, ওড়িশা ও বাংলা এই চারটি আলাদা প্রদেশ করার কথা

ভাবতে পারতেন—প্রশাসনিক সুবিধার দিক থেকেও সেটাই হত বেশি লাভজনক। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গকে আসামের অহমিয়া ও পার্বত্য জাতিদের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা। একই কৌশলে বিহারের অশিক্ষিত বিহারী জনসাধারণ ও ওড়িশার ওড়িয়াদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের যোগ করে দিয়ে এখানেও বাঙালী হিন্দুকে মাইনরিটি করে দিতে তিনি চেয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের আসল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী হিন্দু- যারা জাতীয়তাবাদের অগ্রপথিক ছিল—তাদের সর্বনাশ সাধন। কার্জন ভেবেছিলেন পূর্ববঙ্গের দুজন ভূস্বামী—ময়মনসিংহের মহারাজা ও ঢাকার নবাবের সমর্থন অন্ততঃপক্ষে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে তিনি পাবেন। কিন্তু ময়মনসিংহের মহারাজা সরাসরি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন, ঢাকার নবাবও প্রথম দফায় সমর্থন করেননি। কার্জন তাঁকে সরকারী কোষাগার থেকে ১০০,০০০ পাউণ্ড দান করেন,—নবাব তারপর বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। সরকারী পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করা হতে থাকে যে হিন্দুর প্রাধান্য থেকে মুক্ত মুসলমানদের নিজস্ব প্রদেশ হবে পূর্ববঙ্গ। ফলে ঢাকার নবাব সলিমুল্লা ও তৎসঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গ বিভাগকে স্বাগত জানায়। ঐতিহাসিক লিখেছেন :

"The Hindu nationalists were usually the cream of their society, while some of the Muslims who came out in favour of East Bengal were the scum ; their leaders, who were decent men, had no control over these people who committed atrocities, and the leaders found excuse for them under the cloak of religion." A. K. Majumdar : Advent of Indipendence, p. 33.

অর্থাৎ হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা ছিলেন সেদিন জাতীয়তাবাদী

আর কার্জন সমর্থক মুসলমানরা ছিল অধিকাংশই সমাজের জঞ্জাল স্বরূপ ; তারা রাহাজানি করত আর অনন্যোপায় মুসলমান নেতারা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে ধর্মের নামে তাদের সমর্থন করে যেতেন।

১৯০০ সালের ১৮ই নভেম্বর কার্জন হ্যামিলটনকে এক পত্রে লিখেছিলেন : "ভারতে থাকাকালে আমার সবচেয়ে বড় উচ্চাভিলাষ হল কংগ্রেসকে ধ্বংস করা।"

কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ছিল সেই উদ্দেশ্যেই রচিত—কিন্তু ফল ঘটে গেল সম্পূর্ণ বিপরীত। কংগ্রেস এতদিনে প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবার সুযোগ পেল—বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন পরিচালনা করতে যেয়ে কংগ্রেস জনতার মধ্যে এসে সেই প্রথম দাঁড়িয়েছিল। ভালেন্টিন চিরোল লিখেছিলেন : "বাঙালীরা বুদ্ধিমান, কল্পনাশক্তিসম্পন্ন ও উদার উত্তপ্ত হৃদয়ের অধিকারী ; কিন্তু তারা চিরকাল ইতিহাসের রথচক্রতলে নিষ্পিষ্টই থাকবে, কোনোদিন ইতিহাস স্রষ্টার ভূমিকা নিতে পারবে না।" (Valentine Chirol : Indian Unrest, p 73).

চিরোল বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে ও সেই সময়েই এই মন্তব্যটি করে বলেছিলেন যে বাংলা বিভাগ একটি ন্যায্য ও সঙ্গত কাজ হয়েছে ও কয়েকজন হিন্দু জমিদার, আইনজীবী প্রভৃতির কথা বাদ দিলে সাধারণ বাঙালী, বিশেষত মুসলমানগণ এতে উপকৃতই হয়েছে। কিন্তু কার্জন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মতোই ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরাও যে সেদিন বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে কতখানি ভুল করেছিল তা যেদিন বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবকে কার্যকরী করা হয় সেদিনই প্রমাণিত হয়েছিল।

সারা বাংলায় একটা অভূতপূর্ব ভাববন্যা ও কর্মের উদ্দীপনা সে সময়ে দেখা গিয়েছিল। যেন একটা বিপুল শক্তির প্রপাত ঘটেছিল বাংলা দেশে, আর গোটা জাতি একসঙ্গে আত্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে

উঠেছিল। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে দুই হাজার জনসভা বাংলা দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর সেই সব সভায় লোক সমাগম হত পাঁচশত থেকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ। এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ বাংলার জাতীয় জীবনের খর প্রবাহের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বয়স তখন চল্লিশের ঊর্ধে, বাংলার একজন প্রধান কবি ও ও সাহিত্যিক রূপে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন—জনজীবনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও আছে, কিন্তু সে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে। বাংলা দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্ব থেকেই কিন্তু তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁদের বাড়িতেই পিতা দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক সাহায্যে ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা প্রবর্তিত হয়—পাঁচ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ সেখানেই স্বাদেশিকতার দীক্ষা লাভ করেন। হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম মুদ্রিত কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন। সেই কবিতার পংক্তিগুলির মধ্যে ছিল :

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন
পাইবে হায়রে নূতন জীবন
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

তারপর একদিন রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যুবকদের নিয়ে গঠিত জাতীয়তাবাদী গুপ্ত সমিতি 'সঞ্জীবনী সভা'—গুপ্ত ভাষায় যাকে সদস্যরা 'হামচুপামুহাফ' বলে উল্লেখ করতেন, তাতেও রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন দিল্লীতে মহা সমারোহপূর্ণ দরবার ডেকে রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারত সম্রাজ্ঞী

বলে ঘোষণা করেন ; ষোলো বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই দরবার আহ্বানের বিরোধিতা করে কবিতা লিখেছিলেন :

হা রে হতভাগ্য ভারতভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?

সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাংলা দেশে যখন রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হয়—সেদিন যার নাম ছিল political agitation—রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই ছিলেন তার একজন সমালোচক। এই আন্দোলনের ফাঁকির দিকটি তাঁর নজর এড়ায়নি। ১৮৮৩ সালেই এই বাগবিলাসী রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি লিখেছিলেন : "আমাদের সমাজের পদে পদে এত শত প্রকাব কর্তব্য রহিয়াছে যে, কতকগুলা অস্পষ্ট বাঁধিবোল বলিয়া সময় ও উদ্যম নষ্ট কবা উচিত হয় না।······এত সামাজিক শত্রু চারিদিকে রহিয়াছে তাহাদিগকে কে নাশ করিবে। ·······আগে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাহবণ সংগ্রহ কর, ভাবিতে আরম্ভ কর ও বলিতে শেখ, তাহা হইলে আব সকলে শুনিতে আরম্ভ করিবে। বেশি করিয়া বলিলে কিছুই হয় না, ভালো কবিয়া বলিলে কি না হয়। আতিশয্যেব দিকে যাইয়ো না, কাবণ যেখানেই যুক্তিহীন আতিশয্যপ্রিয় প্রজা, সেইখানেই স্বেচ্ছাচারী প্রভুতন্ত্র শাসন প্রণালী।" (জিহ্বা—আস্ফালন, ভাবতী, ১১৯০ শ্রাবণ)

এই সময়েই আর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : "আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।····ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।····ইংরেজের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না।···ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী। ····যাহা আমরা নিজেই করিতে পারি, এবং যাহা কিছু আমরা নিজে করিব তাহা সফল না হইলেও তাহার কিছু-না-কিছু শুভ ফল স্থায়ী

হইয়া থাকিবে।....গভর্ণমেণ্টকে চেতন করাইতে তাঁহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে যে বিস্তর শুভ ফল হইত।" (ন্যাশনল ফণ্ড, ভারতী, ১২৯০ কার্তিক।)

রবীন্দ্রনাথ কেন সেদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেননি তার কতকটা কারণ তাঁর এই মনোভাবের মধ্যেও নিহিত ছিল। তাঁর দেশপ্রেম ছিল অকৃত্রিম ও গভীর। তিনি দেশীয় ভাব ও দেশীয় সাহিত্যের যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন করেছেন, ইংরেজের অনুকরণের তীব্র নিন্দা করেছেন, বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা চেয়েছেন এবং দেশবাসীকে আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করতে বলেছেন। অন্তঃসারশূন্য ধোঁয়াটে বাগবিভূতিসর্বস্ব রাজনীতিকে তিনি বরাবর পরিহার করেই চলেছেন।

কিন্তু 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদনাকালে ১৮৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন—আলোচনাগুলির অধিকাংশই তাঁর 'রাজা-প্রজা' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তিলকের কারাবরণে দেশের অন্যান্যদের মতো রবীন্দ্রনাথও ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—সক্রিয়ভাবে তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তিনিও অংশ নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ধারাকে সমালোচনা করে দেশের প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের অনুকূল পথের সন্ধানও দিয়েছিলেন। ইংরেজ আগমনের আগে আমাদের দেশে নেশন ছিলনা, অতএব ইংরেজের আদর্শে আমাদের দেশে নেশন গড়ে তুলতে হবে—কংগ্রেসের এই ছিল দৃষ্টিভঙ্গী: কংগ্রেসের কর্মধারা এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশ-সাধনার পক্ষে এই ধারণাটাই বড় বাধা বলে মনে করেছিলেন। তাঁর কথায়: "লোকচিত্তের একতা সব দেশে একভাবে সাধিত হয় না। এইজন্য

য়ুরোপীয়ের ঐক্য ও হিন্দুর ঐক্য এক প্রকারের নহে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে-কথা বলা যায় না। সে-ঐক্যকে ন্যাশনাল ঐক্য না বলিতে পার—কারণ নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা আমাদের নহে, য়ুরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।....য়ুরোপের কাছে ন্যাশনাল ঐক্য অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্র-মূলক ঐক্যই শ্রেষ্ঠ; আমরাও য়ুরোপীয় গুরুর নিকট হইতে সেই কথা গ্রহণ করিয়া পূর্বপুরুষদিগের ন্যাশনাল ভাবের অভাবে লজ্জা বোধ করিতেছি।....রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ, মিলন যত প্রকারে হয় ততই ভালো।....কিন্তু এ-কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের চেয়ে বড়।" (ভারতবর্ষীয় সমাজ, বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ শ্রাবণ)

এই সিদ্ধান্তকে আরও বিস্তারিত করে তিনি লিখেছিলেন: "ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।...আমাদের দেশে সরকার-বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা

স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে।....আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভূত স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমনকি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরেজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্তনীয়রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি—কোনো আপত্তি করি নাই।....এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। (স্বদেশী সমাজ, বঙ্গ-দর্শন ১৩০৮ কার্তিক)

রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই সেদিনের স্বদেশপ্রেমিকদের কাছে বার বার বলতে চেয়েছিলেন যে দেশের প্রকৃত শক্তি আছে দেশের ভিতরে এবং সকল স্বদেশ সাধনার গোড়ার কথাই হবে সেই শক্তির পরিচয় লাভ করা ও তার ব্যবহার করা। বিশ শতকের প্রথম দিকেও ইংরেজের প্রতি একটা অন্ধ বিশ্বাস ও সম্ভ্রমবোধ আমাদের মধ্যে ছিল। তখন দেশের প্রতিটি অভাব, সঙ্কট বা সমস্যার বিষয়ে আমরা প্রতিকারের জন্য ইংরেজের কাছে আবেদন নিবেদন করতাম। যখন অভিজ্ঞতা হল যে ইংরেজ সরকার তাতে কর্ণপাত করেনা, তখন এল ভীষণ ক্রোধ ও ক্ষোভ, এল ইংরেজকে সমুচিত শিক্ষা দেবার বাসনা—যেন আমাদের অস্তিত্বের গুরুত্ব সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। কিন্তু এই ক্রোধের বিস্ফোরণের ভিতরেও আমরা প্রকারান্তরে ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকার এবং অভাব মোচনে তার সামর্থ্যকেই স্বীকার করে নিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন যে সেখানেই আমাদের ভুল। বিবেকানন্দ বলেছিলেন দরিদ্র কৃষক, মজুর, জনসাধারণের ভিতর থেকে নতুন ভারতবর্ষ আবির্ভূত হবে। মাদ্রাজ বক্তৃতামালায় বিপিন পাল বলেছিলেন দেশের সর্বসাধারণই দেশের শক্তির আধার। রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীবিভাগের দিকে মন না দিয়ে সর্বাত্মক অর্থে 'সমাজ' শব্দটি ব্যবহার করে বলতে চাইলেন যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ, ধনী সমাজপতি ও জনগণ, নেতা ও জনতা সকলে সম্মিলিত ভাবে দেশের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ধারণ করে আছে, সেই

শক্তির উদ্বোধন ঘটানোর দায়িত্বও তাদের। বিদ্বান, সংযত, ত্যাগ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, বীর্যশালী, অটুটসঙ্কল্প ক্ষত্রিয় এবং সৎ, প্রাণবান জনসমাজকে একত্রে একটা স্থানে এসে মিলতে হবে—সমাজের আঙ্গিনাই হবে সেই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। মিলনের ও ঐক্যের ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় শক্তির সন্ধান পাব। সেই জাতীয় শক্তিতে আস্থাবান হয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের একটা পাল্টা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সরকার যেমন শক্তির কেন্দ্র, তেমনি আমাদের সমাজের ভিতর আর একটি পাল্টা শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। এই নতুন শক্তিকেন্দ্র থেকেই জাতির সকল কাজকর্ম চালিত হবে, ফলত ইংরেজ সরকারকে আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের কোনো ক্ষেত্রেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না এবং তার ফলে ইংরেজ সরকার এদেশে নিজেকে প্রতিপদে নিরর্থক করে তুলবে। রবীন্দ্রনাথ অহিংস অসহযোগিতার কথা বা শুধু স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের কথাই বলেননি, প্রকৃতপক্ষে এই শতাব্দীর একেবারে সুরুতে তিনি পাল্টা গণ-সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীই করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র ত্রিশের দশকে দেশের সামনে এই পাল্টা সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবই রেখেছিলেন। সেকথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবার সুযোগ পাব—কিন্তু রবীন্দ্র চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর মিল কতখানি ছিল, অথবা রবীন্দ্র চিন্তাধারা থেকে তিনি কী পরিমাণে পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন এখানে তার একটু ইঙ্গিত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ত্রিশের দশকে সুভাষচন্দ্র ইংরেজের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক্রমে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় সামান্য সামান্য ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন এটা আপস পন্থা। কংগ্রেস সেদিন তাঁর আপত্তি গ্রাহ্য না করে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল বিভিন্ন প্রদেশে। কার্যত সেই মন্ত্রীসভাগুলি ছিল সর্বতোভাবে ইংরেজ সরকারের অধীন। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন: ভারতবর্ষে

একটা পাল্টা গণ-সরকার করতে হবে, ভারতবাসীদের একমাত্র আনুগত্য থাকবে সেই সরকারেরই প্রতি, সকল সমস্যার সমাধান ও বিচার পাবার আশায় মানুষ যাবে সেই সরকারেরই কাছে ; ফলে ইংরেজ সরকার কার্যত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং তার আর কোনো ভিত্তি থাকবে না।

এই পাল্টা গণশক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছিলেন যে এমন একজন মানুষকে অধিনায়ক রূপে সমাজকে স্বীকার করে নিতে হবে, যাঁকে কেন্দ্র করে সমাজের বিরোধী ও বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। তিনি লিখেছিলেন : "আমাদের প্রথম কাজ হইবে—যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিদিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা।" (স্বদেশী সমাজ)

কথাটাকে আরও ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছিলেন : "আমাদের এমন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন যাঁহারা দেশের জন্য কেবল বাক্যব্যয় নহে, ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কী করিবেন, কোথায় যাইবেন, কী দিবেন, কাহাকে দিবেন, কাহারো কোনো ঠিকানা পান না। বিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নষ্টই করা হয়। দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত তবে যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, যাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, যাঁহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত— আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, সাহিত্যানুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঐক্যের চতুর্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।" (সফলতার সদুপায়)

রবীন্দ্রনাথ এই সকল কথা বলেছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও পূর্বে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি তাঁর বক্তব্যকে দেশবাসীর

সামনে আরও সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করেন। তিনি তখন লিখেছিলেন: "স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই, তাহা ঈশ্বরদত্ত—স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজা সৈন্য লইয়া পাহারা দিন, কৃষ্ণ বা রক্ত গাউন পরিয়া বিচার করুন, কখনো-বা অনুকূল কখনো-বা প্রতিকূল হউন. কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-অধিকার তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই। সে অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে অধিকার গ্রহণ যদি না করি তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্তব্যশৈথিল্যের জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করি তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা। তাই আমি বলিতেছি, স্বদেশের মঙ্গল সাধনের কর্তৃত্বসিংহাসন আমাদেব সম্মুখে শূন্য পড়িয়া আমাদিগকে লজ্জা দিতেছে। হে স্বদেশ সেবকগণ, এই পবিত্র সিংহাসনকে ব্যর্থ করিয়ো না, পূর্ণ করো।........তবে প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হইয়া অসংযত হইয়া উঠিলে চলিবে না। একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থ-ভাবে আপনাকে মানিব। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকাব করিব। একজনের দক্ষিণ হস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রণাগাবে মিলিত হইবে এবং তাঁহাব আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।" (দেশনায়ক)

বহু বছর পর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সুভাষচন্দ্রই তাঁর উদ্দিষ্ট দেশনায়ক। প্রকাশ্য সম্বর্ধনা-সভার মাধ্যমে সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে অধিনায়কের পদে বরণ করেছিলেন. ১৯০৪ সালে সুভাষ যখন বালক মাত্র, রবীন্দ্রনাথ তখনই দেশনায়করূপে সুভাষের আত্মপ্রকাশের উপযোগী ক্ষেত্র তাঁর বাণীর মাধ্যমে প্রস্তুত করে তুলছিলেন। ইতিহাসে এইসব

যোগাযোগগুলি লক্ষণীয়। সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব সত্যই জাতীয় ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা নয়।

গুপ্ত সমিতিতে দুর্যোগ। ১৯০৪ সালে বাংলা দেশে অরবিন্দের বৈপ্লবিক সমিতিই গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছিল। অরবিন্দের সমিতিটি তখনো কোনো স্বতন্ত্র নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। অরবিন্দ নিজেও তখনো রাজনীতিতে প্রকাশ্য কোনো নেতৃত্বের ভূমিকা নেননি। তখনো তিনি বরোদার গায়কোয়াড় কলেজের অধ্যাপক—বাংলায় যাওয়া আসা করেন, কিন্তু স্থায়ীভাবে থাকেন না। বাংলায় তাঁর সমিতিটিব নেতৃত্বভার যতীন্দ্র ও বারীন্দ্রের ওপর ন্যস্ত ছিল। আর নেতৃত্বের প্রশ্নেই এই দুই ব্যক্তির বিরোধের ফলে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতিটি ১৯০৪ সালেই ভেঙে গিয়েছিল।

যতীন্দ্র মিলিটারি মেজাজের লোক ছিলেন, সবার ওপর কড়াভাবে শাসন চালাতেন। সমিতির কেউ কেউ তাতে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। বারীন্দ্র অরবিন্দ ভিন্ন আর কারও নেতৃত্ব মানতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। গোলযোগেব সূত্রপাত হয়েছিল এই ভাবে। সার্কুলার রোডে সমিতির কেন্দ্র ছিল—যতীন্দ্র সেখানেই সস্ত্রীক বাস করতেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁর এক বিধবা বোন। বারীন অপবাদ দিলেন যে ঐ মহিলার সঙ্গে সমিতির কয়েকজন অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত —যতীন্দ্রও সে কারণে অপরাধী। বারীনের মামা সত্যেন বসুও সমিতির সদস্য ছিলেন, অভিযোগটা তাঁর বিরুদ্ধেও উঠল। এই নিয়ে তীব্র মন কষাকষি হয়ে দল ভেঙে যায়। বারীন গ্রে স্ট্রীট ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের মোড়ের কাছে গ্রে স্ট্রীটের একটা আস্তাবলের ঘরে চলে গেলেন ও সেখানে আলাদা ভাবে দল গড়ার চেষ্টা করলেন। যতীন্দ্রও আলাদা দল রাখাব জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। দলাদলির খবর পেয়ে অববিন্দ বরোদা থেকে কলকাতায় এসে বারীনের গ্রে স্ট্রীটের আস্তানায় উঠেছিলেন। ঘটনার বিবরণ তিনি বারীনের কাছেই শুনলেন ও তাঁর পক্ষেই রায় দিলেন। তাঁর বিচার

একদেশদর্শী ও পক্ষপাতমূলক বলে অভিযোগ উঠেছিল। সরলাদেবী ও পি, মিত্র যতীন্দ্রকে নিরপরাধ বলে মনে করতেন—কাজেই অরবিন্দের বিচার দেখে তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। অরবিন্দ ও পি, মিত্রের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদও ঘটেছিল। যাই হোক, বারীন্দ্র অথবা যতীন্দ্র কারও পৃথক দলই আর দাঁড়ায়নি। যতীন্দ্র রাজনীতি ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে নিরালম্ব স্বামী নাম ধারণ করেছিলেন, বিপ্লবের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকারও এখানে পরিসমাপ্তি। বারীন্দ্র অরবিন্দের সঙ্গে দেওঘর হয়ে বরোদায় চলে যান। অরবিন্দের বিপ্লবী কার্যধারার প্রথম পর্বের এইভাবে অবসান ঘটেছিল। পরে অবশ্য দুই ভাই-ই আবার বাংলায় ফিরে এসে নতুন করে আগুন জ্বালিয়েছিলেন, কিন্তু সেকথা পরে।

১৯০৫। সুভাষচন্দ্রের আট বছর বয়স পূর্ণ হয়ে গেল। এখন তিনি নবম বৎসরের বালক। বিশ্বজগতের সংবাদ গ্রহণের মতো ক্ষমতা তাঁর মধ্যে এখন অল্প অল্প করে আসছে। এ সময়ে বাংলা দেশে যেসব ঘটনা ঘটছিল তা এতই উত্তেজনাকর যে তাঁদের পরিবারে তা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হত। তাঁর দাদারা, আত্মীয়-স্বজন, অভ্যাগতগণ, বাবা নিশ্চয়ই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ও তার বিরোধী আন্দোলন নিয়ে বাড়িতে কথাবার্তা বলতেন। বাইরের দুনিয়ার খবরেও উত্তেজনা ছিল। বুয়র যুদ্ধে ইংরেজদের শোচনীয় দুর্দশা ও রুশ-জাপান যুদ্ধ শিক্ষিত বাঙালীদের সেসময়ে আলোচনার বিষয় ছিল। সুভাষের মতো প্রখর চেতনা সম্পন্ন বালক সেইসব আলোচনা শুনতে আগ্রহ বোধ করতেন, আলোচনার ধারা ইতস্ততঃভাবে হলেও তাঁর কানে আসত। কটকের বাড়িতে সংবাদপত্র নিয়মিত যেত। সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয় আমাদের জানিয়েছেন যে অমৃত বাজার পত্রিকা অথবা অন্য কোনো ইংরেজি পত্রিকা সে সময়ে তাঁদের বাড়ি আসত। মিশনারী স্কুলের ছাত্র সুভাষ ইংরেজি ভাষা ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন ততদিনে; ভাষা

আয়ত্ত করার প্রতিভা তাঁর বরাবরই অসাধারণ। ছাত্র জীবনে এবং পরবর্তী কালেও তাঁর প্রতিভার এই দিকটির পরিচয় আমরা পাব। যাই হোক, ইংরেজি সংবাদপত্র পাঠ করার মতো ভাষাজ্ঞান তাঁর ছিল; ১৯০৫ সালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংবাদপত্র থেকে আহরণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। অবশ্য নয় বছরের বালকের নিকট জগৎটা খুব স্পষ্ট হবার কথা নয়। সংবাদ পড়ে সংবাদের তাৎপর্য অনুধাবন করা তাঁর পক্ষে খুব বেশি সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না।

সুভাষ যে সময়ে পি. ই. স্কুলের ছাত্র ছিলেন সে সময়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিঃ ইয়ং। তাঁর স্ত্রী মিসেস ইয়ং ছিলেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, এঁরা ছিলেন খাঁটি ইংরেজ—বিলেত থেকে আগত। মিঃ ইয়ং ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও দৃঢ়চেতা পুরুষ। স্কুলের সীমানার মধ্যে প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর চরিত্রের ছাপ পড়ত। শৃঙ্খলার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শৈথিল্যকেও তিনি মার্জনা করতেন না। ভদ্র ও নিখুঁত আচরণ তিনি সকলের কাছ থেকে দাবী করতেন। ছাত্রদের প্রগ্রেস রিপোর্টে শুধু পাঠ্য বিষয়েই নম্বর দেওয়া হত না, (১) স্বভাব (২) আচরণ (৩) পরিচ্ছন্নতা (৪) সময়ানুবর্তিতা—এই সব বিষয়েও নম্বর দেওয়া হত। তার ফলে পি. ই. স্কুলের ছাত্ররা মার্জিত ও ভদ্র ব্যবহারের অধিকারী হত। প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী ছাত্রদের আচরণের ত্রুটির জন্য বেত মারতে পারতেন—গম্ভীর ও পবিত্র স্বভাবের জন্য সুভাষকে সে অবমাননা কোনদিন সইতে হয়নি।

স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের চরিত্রেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। মিঃ ইয়ংকে ছাত্ররা শ্রদ্ধা করলেও তাঁকে ভয় করত সবাই—তাঁর রাশভারী স্বভাব ও বেত মারার অবাধ অধিকারের দরুণ। মিস ক্যাডোগান এবং আর কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা বা ভয় কোনোটাই ছিল না, অসন্তোষও ছিল না। মিস এস্-

এর মতো কয়েকজন ছিলেন, ছাত্ররা যাদের ঘৃণা করত। মিস এস যেদিন স্কুলে অনুপস্থিত হতেন সেদিন ছাত্রদের আনন্দের পরিসীমা থাকত না। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিসেস ইয়ংকে সকলেই খুব পছন্দ করত। তিনি ছিলেন উদার ও স্নেহবৎসলা। কিন্তু শিশু ক্লাসগুলির প্রথমা শিক্ষিকা মিস সারা লরেন্সকেই ছাত্রছাত্রীরা সবচেয়ে ভালবাসত। শিশু মন বুঝবার তাঁর ছিল স্বাভাবিক ক্ষমতা আর ছিল তাঁর অফুরন্ত দরদ! তাঁর প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধার আকর্ষণ বালক সুভাষও অন্যদের মতোই অনুভব করেছিলেন।

সুভাষ এই ইংরেজিভাষী স্কুলে ঢুকে অসুবিধায় পড়েননি কতকটা সারা লরেন্সের সহানুভূতিশীল ব্যবহারের জন্য, আর কতকটা তাঁর সরল আত্মবিশ্বাসের জন্য। ইংরেজি অবশ্য ক্রমে ক্রমে তিনি রপ্ত করে নিয়েছিলেন। প্রথম দিককার সেই পেন্সিল সরু মোটার মতো কাহিনী আর বিশেষ পুনরাবৃত্ত হয়নি।

এই স্কুলে ভারতীয় ছাত্রদের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারে আঘাত দেবার কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। ভারতীয় ছাত্রদের ওপর জোর জুলুম বা অন্যায় ও পীড়নমূলক ব্যবহার স্কুল কর্তৃপক্ষ করেননি। তাদের প্রতি বিশেষ ধরণের কোনো ব্যবহারও করা হত না। তাই বেশ সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনের দিনগুলি এখানে কেটে যাচ্ছিল। ক্লাসের সেরা ছেলে, একটি মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের বালক, আচরণে ত্রুটিহীন—কে না তাঁকে স্নেহ করবে? অন্ততঃ তাঁকে কোনো রকম পীড়ন বা অপমানকর ব্যবহার ভোগ করতে হয়নি। স্কুলের আবহাওয়া ও ভাবধারার সঙ্গে তিনিও বেশ খাপ খাইয়েই নিয়েছিলেন।

তবু সেই মধুর সম্পর্কেও একদিন ফাটল ধরল। একটা ভিন্ন ভাব যেন কোথা হতে এসে উপস্থিত হল। বাঁশির সুর কেটে গেল। ইংরেজিয়ানার পরিবেশ সুভাষের চিত্তকে অসোয়াস্তিতে ভরে তুলল। হয়তো তাঁর বয়স বাড়ছিল, স্বাভাবিক চেতনাও জাগ্রত হয়ে উঠছিল

—তাই আর ইংরেজ সুলভ পরিবেশে নিজের চিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা শক্ত হয়ে উঠছিল। ১৯০২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯০৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এই সাতটি বছরে তাঁর অভিজ্ঞতা, বোধ ও পছন্দ-অপছন্দের শক্তি যেমন বাড়ছিল, গোটা দেশের মানসিকতাও তেমনি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। কত না ঘটনা ঘটে গেল দেশে মাত্র এই কয়েক বছরে। তার প্রতিক্রিয়া সুদূর কটকের এই স্কুল গৃহের অভ্যন্তরেও এসে পৌঁছেছিল। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে কটক তখনও বাংলা দেশেরই একটি শহর বলে পরিগণিত হত ; বাংলা দেশের বাইরে ওড়িশা স্বতন্ত্র প্রদেশ রূপে তখনও গঠিত হয়নি।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত। লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবটি নিয়ে বাঙালীর সঙ্গে একটু চাতুরী খেলেছিলেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমস্ত বাংলা দেশে যখন প্রতিবাদের তরঙ্গ উঠেছিল তখন তিনি প্রকাশ্যে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালের অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে। ১৯০৫ সালের ১১ই জানুয়ারি কলকাতায় বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত তিন শত জন প্রতিনিধির একটি সম্মেলন স্যার হেনরি কটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কটন বলেছিলেন: যদি প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গবিভাগ করতেই হয় তবে বিহার ও ছোটনাগপুরকে বাংলা থেকে আলাদা করে পৃথক প্রদেশ করা হোক এবং তার বদলে আসামভুক্ত সিলেট ও কাছাড় এই দুটি বাংলা ভাষাভাষী জেলাকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হোক। এই সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সম্পর্কে সরকার তখন পর্যন্ত কোনো পাকা সিদ্ধান্ত করেননি জেনে সম্মেলন সুখী হয়েছে এবং এবিষয়ে সরকারের মত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা হোক।

এই অনিশ্চয়তার মধ্যে মে মাসে লণ্ডনের সংবাদপত্র স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত হল যে সেক্রেটারি অফ স্টেট বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবটি

মেনে নেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। সেক্রেটারি অফ স্টেট বা ভারতসচিব ছিলেন মিঃ ব্রোডোরিক। তিনি হাউস অফ কমন্সে জানালেন যে না, সিদ্ধান্ত হয়নি, প্রস্তাবটি তখনও বিবেচনাধীন। কিন্তু ৪ঠা জুলাই তিনি পুনরায় কমন্স সভায় জানালেন যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার মেনে নিয়েছেন। সরকারী সিদ্ধান্ত হল আসাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ডিভিশন মিলে পূর্ববঙ্গ নামে একটা আলাদা প্রদেশ হবে। বিহার, ওড়িশা, ছোটনাগপুর সহ পশ্চিমবঙ্গও একটা নতুন প্রদেশ রূপে গঠিত হবে। ৬ই জুলাই কলকাতার সংবাদ-পত্রগুলি এই সংবাদ প্রচার করে—সরকারও তা সত্য বলে স্বীকার করে নেন। ৭ই জুলাই তারিখেই সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পত্রিকায় লিখলেন তাঁর বিখ্যাত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ A Grave National Disaster. তিনি লিখেছিলেন যে সরকার যদি তার সিদ্ধান্ত না পাল্টায় তবে এদেশে ব্যাপকতম জাতীয় সংগ্রাম সুরু হয়ে যাবে। দেশবাসী নিয়মতান্ত্রিক পথে এই সংগ্রাম পরিচালনা করবে ও সেজন্য যে কোনো রকম ত্যাগ বরণেও কুণ্ঠিত হবে না। তাঁর কথায়: "We are not guilty of the smallest exaggertion when we say that we are on the threshhold of an agitation which, for its intensity and its universality, will be unrivalled in the annals of this province."

না, সুরেন্দ্রনাথের মন্তব্যে কোনো অতিরঞ্জন ছিলনা—সত্যই এই উপলক্ষে দেশে যে আন্দোলন দেখা দিল তার ব্যাপকতা ও গভীরতা ইতিপূর্বে আর কোনো আন্দোলনেই দেখা যায়নি। সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই যে প্রতিবাদের ঝড় দেশের সর্বত্রই উঠেছিল ইতিপূর্বে সে বিষয়ে উল্লেখ করেছি। কলকাতা টাউন হলে হিন্দু, মুসলমান, মহারাজা, নবাব, রাজা, শিক্ষিত শ্রেণী ও জনসাধারণ ইত্যাদি সকলের সমবেত সভা অন্ততঃ পাঁচবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করার জন্য। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-

সিয়েশন, বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য সমিতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মেমোরাণ্ডাম দিয়েছিল। সত্তর হাজার লোকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি দরখাস্ত পূর্ববঙ্গ থেকে ভারত সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সমস্ত ভারতীয় সংবাদপত্র একযোগে এই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেছিল। সরকার এসব প্রতিবাদ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাই লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরকে সম্বোধন করে অম্বিকা চরণ মজুমদার বলেছিলেন: খুনী আসামীকেও দণ্ডাদেশ দেবার আগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী তা জানানো হয়, কিন্তু ৩ কোটি বাঙালীর সর্বনাশ করার আগে তাদের কথাটা সরকার একবার শোনাও দরকার মনে করেনি। ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন: মুঘল ও পাঠান রাজত্বেও বাঙালীর যে সর্বনাশ কল্পনা করা যায়নি ইংরেজ রাজত্বে তাই ঘটল—বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে ভেঙ্গে দু টুকরো করা হল। এখন থেকে আমাদের একমাত্র কাজ হবে সরকারী সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য চেষ্টা করা।

বাংলা দেশের সংবাদপত্রগুলি দেখিয়ে দিল যে বঙ্গ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা মিলিয়ে যে নতুন প্রদেশটি গঠিত হচ্ছে তাতে বাঙালীর সংখ্যা হবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ, হিন্দীভাষীর সংখ্যা হবে ২ কোটি ও ওড়িয়াভাষীর সংখ্যা তার সঙ্গে যুক্ত হবে,—ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী হবে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। পূর্ববঙ্গে হিন্দু বাঙালীর অবস্থাও যে শোচনীয় হবে আগেই সেকথা উল্লেখ করেছি।

বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দুদের পাশাপাশি প্রথমে বাঙালী মুসলমানরাও দাঁড়িয়েছিল। ও'ডনেল লিখেছেন: "বাংলার মুসলিম সমাজের দেশপ্রেমিক, অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণী প্রথমাবধি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিল।" (O'Donnell: The Causes of Present Discontent in India, ch. v.)

কিন্তু কার্জন সুকৌশলে মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লার চারপাশে জমায়েৎ হল কিছু মুসলমান—১৯০৬ সালে যারা মুসলিম লীগ সংগঠিত করেছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কলকাতাকেও পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল বাংলার জেলাগুলি। সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত এই আন্দোলনের আবেদন পৌঁছেছিল। ময়মনসিংহের মুচিরা বিলেতী জুতো সারাতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছিল। বরিশালের ওড়িয়া পাচকরা যে বাড়িতে বিলেতী খানা হয় সে বাড়ীতে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ফরিদপুরের ধোপারা বলেছিল বিলেতী কাপড় তারা কাচবেনা। ঐতিহাসিক তাই লিখেছেন: "Thus while Calcutta was talking, history was being made in "the mofussial" (R. C. Majumdar, History of Freedom Movement, vol II, p. 14)। এই সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বাংলার ছাত্রসমাজ। অকুতোভয়, ত্যাগব্রতী এই ছাত্ররাই পরে বাংলায় বিপ্লবকে আহ্বান করে এনেছিল।

সরকার পক্ষ থেকে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব কার্যকর করার দিন ধার্য হয়েছিল ১৬ই অক্টোবর। লেফটেন্যান্ট গভর্ণর রূপে স্যার জোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলার ঐদিন নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের কার্যভার গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণাও করা হয়। এই ঘোষণা প্রকাশের পর আন্দোলন আরও সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী রূপ নেয়। এমনকি সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সুদূর মফঃস্বল অঞ্চলে নিভৃত পল্লীর অশিক্ষিত কৃষকরা পর্যন্ত বহু গ্রাম হেঁটে পার হয়ে ডাকঘরের কাছে এসে অপেক্ষা করত, কলকাতা শহর থেকে ডাকযোগে সংবাদপত্র গেলেই বাবুদের মুখে পাঠ শোনার জন্য—আন্দোলনের প্রতিটি খবর জানার জন্য তারা ছিল উদগ্রীব। মুসলমান সম্প্রদায় সাধারণভাবে এ

আন্দোলনে যোগ না দিলেও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান, যেমন, আব্দুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, আব্দুল হালিম গজনভী, ইয়ুসুফ খাঁ বাহাদুর, মোহাম্মদ ইসলাম চৌধুরী প্রভৃতি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুসারে ১৬ই অক্টোবর বা ৩০শে আশ্বিন রাখি-বন্ধন-উৎসব ও অরন্ধন ব্রত পালিত হয়েছিল। সেদিন ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ ছিল, গাড়ি ঘোড়া রাস্তায় চলেনি, দোকানপাট খোলেনি। বিকালে ২৯৫ আপার সার্কুলার রোডের মাঠে ফেডারেশন হল বা মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে আহূত জনসভায় পঞ্চাশ হাজার লোক যোগ দিয়েছিল। বৃদ্ধ আনন্দমোহন বসুকে রোগশয্যা থেকে আরাম কেদারায় বহন করে এনে সভাপতির আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে শপথ বাক্য সেদিন সভায় পঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। শপথ বাক্যটি ছিল এই: "যেহেতু বাঙালী জাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহাকিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

১৯০৫ সালের আন্দোলন পাঁচটি নতুন রাজনৈতিক ধারণা ও কর্মপথের জন্ম দিয়েছিল। এ যাবত কাল পর্যন্ত আমাদের রাজনীতি ছিল আবেদন-নিবেদনধর্মী; বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ তীব্রভাবে এই ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধতা করলেও সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই নীতিকেই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এইবার দেখা গেল ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত হাজার হাজার জনসভা, দরখাস্ত, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের কাছে যে আবেদন

জানানো হয়েছিল তা পদদলিত করে বঙ্গবিভাগে সরকার উদ্যত হল। তার ফলে দেশে শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন সবাই উপলব্ধি করল। দ্বিতীয়ত ইংরেজকে শিক্ষা দেবার জন্য, বিপদে ফেলার জন্য বিলিতী দ্রব্য বয়কট করার কথা ওঠে—পরে এটিই সার্বিক অসহযোগের নীতিতে রূপান্তরিত হয়। এই অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধী ও দেশবন্ধুর মতো সুভাষচন্দ্রও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হবেন—কাজেই অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা যে বাংলা দেশের ১৯০৫ সালের বয়কট আন্দোলনে ঘটেছিল একথা মনে রাখা দরকার। তৃতীয়ত বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের কথা উঠেছিল—এই স্বদেশীর প্রস্তাবই পরবর্তী কালে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ভাবধারায় ও কার্যক্রমে রূপান্তরিত হয়। জাতীয় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিল্প, জাতীয় সরকার ও পূর্ণ স্বরাজের চিন্তা ও দাবীর সূত্রপাত ঘটে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন কালেই। সুভাষচন্দ্র জাতীয় বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিল্প, জাতীয় সরকার ও স্বরাজ—এই সবকটি দাবী ও কার্যক্রমের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হবেন। চতুর্থত, ছাত্রশক্তি যে দেশমুক্তির রাজনীতিতে অপরিহার্য, ছাত্ররাই যে স্বাধীনতা-আন্দোলনকে শক্তি জোগায়, ১৯০৫ সালের আন্দোলনে সেকথা প্রথম প্রমাণিত হয়েছিল। ছাত্ররাই ছিল সেদিনের আন্দোলনের প্রাণ। সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ছাত্র ও যুবকদের সংগঠিত করার দায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তারুণ্যশক্তির সহযোগ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর মতো এত বেশি করে আর কেউ চায়নি, পায়ওনি। পঞ্চমত, অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের সীমার বাইরে যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিপ্লবযজ্ঞের আয়োজন দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন ১৯০৫ সালেই দেশে সেটা প্রথম ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে। আমরা দেখেছি, এর আগে অরবিন্দ-বারীন্দ্রের বিপ্লবী সমিতি গড়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ তাঁদের মতে ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না।

১৯০৫ সালের আন্দোলনে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। তারই ফলে অনুশীলন সমিতি সারা বাংলায় প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে গড়ে ওঠে, যুগান্তর দলের আবির্ভাব এবং বহির্ভারতে বিপ্লবী সংগঠন দানা বেঁধে ওঠে। সুভাষ এই বিপ্লবী ধারারও ধারক ও বাহক। এই সব কারণে একথা বলা চলে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এমন কতগুলি ভাব ও শক্তির সৃষ্টি করেছিল যা সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব-ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছিল এবং তাঁর মত ও পথকেও অনেকাংশে নির্ধারিত করে দিয়েছিল।

ছাত্র জাগরণ। ছাত্ররা ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাণ। সরকার তাই ছাত্র দলন নীতি অবলম্বন করেছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন: "তোমরা গোলদীঘির গোলামখানায় প্রস্রাব করে দিয়ে চলে এস।" ছাত্ররা এই কথায় সম্মতি জানিয়েছিল। কলেজ স্কোয়ারে দশ হাজার ছাত্রের এক সমাবেশে বিপিন পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশ মুখার্জী প্রভৃতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বললে ছাত্ররা তুমুল করতালি ধ্বনি দিয়ে তাঁদের সমর্থন করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। ছাত্রদের এক সভায় সভাপতিত্ব করতে যেয়ে তিনি যখন বলেছিলেন: "তোমরা গবর্নমেণ্টের স্কুল-কলেজ বয়কট কোরোনা, কোরোনা", তখন ছাত্ররা ক্ষেপে উঠে 'থামুন মশায়' বলে তাঁকেও বসিয়ে দেয়।

নরম পন্থা ও চরম পন্থা। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পরম মুহূর্তেই বাংলায় নরম পন্থা ও চরম পন্থার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। বস্তুত এ পার্থক্য পূর্বেই ছিল। তবে চরমপন্থীরা এতদিন নেতৃত্বভার পায়নি—এখন তারা দেশের নেতৃত্বের দাবীদার হয়ে উঠল, তাই এই প্রকাশ্য সংঘাত। নরমপন্থীদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাত একদিন আসতই, কিন্তু শীঘ্র সেটা যখন এসেই পড়ল

তখন চরমপন্থীরা কাল বিলম্ব না করে নিজেদের সংগঠিত করতে চাইল। মনে রাখা দরকার যে চরমপন্থীদের সকলেই সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না কিংবা হিংসাত্মক কার্যকলাপেও লিপ্ত ছিলেন না—যেমন বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি।

কাশী কংগ্রেস। কাশী কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন গোখলে। দেশবন্ধু পরিচালিত বাংলার চরমপন্থীরা যখন স্বদেশী ও বয়কট এই দুই প্রস্তাব উত্থাপিত করলেন তখন গোখলে বললেন স্বদেশী অত্যুত্তম জিনিস, তাছাড়া ওতে ইংরেজ বিদ্বেষও নেই; সুতরাং সারা ভারতের জন্যই স্বদেশী প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু বয়কট (বিলিতী দ্রব্য ও বিলিতী শিক্ষা) প্রস্তাবে ইংরেজর প্রতি বিদ্বেষ আছে—অতএব ভারতবর্ষ বা কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে না। গোখলের এই কথায় অধিবেশনে তুমুল গোলযোগ হতে পারত—কিন্তু হল না; কারণ কাশী কংগ্রেসের অন্তরাল থেকে ভগিনী নিবেদিতা নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে একটা সাময়িক আপস ঘটিয়েছিলেন। গোখলে সেই আপসের শর্ত মেনে তাঁর ভাষণে একথাও বললেন যে বয়কট প্রস্তাব সারা ভারতের ক্ষেত্রে আপাতত প্রযোজ্য না হলেও বাংলায় তা প্রযোজ্য হবে এবং সমগ্র ভারত বাংলার আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সমর্থন করবে। কাশী কংগ্রেসে বাংলার চরমপন্থীদের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ আত্মপ্রকাশ ঘটে,—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই দলের অন্তরালবর্তী পরিচালক ও বিপিন পাল প্রকাশ্য নেতা ছিলেন,—অরবিন্দ তখনো বরোদায়।

ভবানী মন্দির। অরবিন্দ বরোদায় তখনো অধ্যাপনা করেন, যদিও স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলকাতায় এসে তিনি আন্দোলনে অংশ নিয়ে গেছেন। প্রকাশ্য বক্তৃতা তিনি তখনো করতে পারতেন না, তাঁর বিপ্লবী দলও তখন ভেঙে গেছে—তাঁর বিপুল লেখার যুগও তখন সুরু হয়নি। কাজেই তিনি সে সময় নেতা হননি।

যোগসাধনার বলে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা ভারত স্বাধীন করার কথা তিনি তখনই চিন্তা করতেন ও বরোদায় যোগাভ্যাস করতেন। সেই অবস্থায় ১৯০৫ সালের শেষ দিকে "ভবানী মন্দির" নামে পনেরো-ষোলো পৃষ্ঠার একখানি ইংরেজি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি তিনি বারীন্দ্রের হাত দিয়ে বাংলায় পাঠান। বারীন্দ্র কলকাতায় এসেই বইখানি ছাপিয়ে বিলি করেন। এই বইয়ের প্রথমে ছিল মা ভবানীর উদ্দেশ্যে একটি স্তব। বইয়ে একটি পরিকল্পনা দেওয়া ছিল এই মর্মে যে কোনো দূর দুর্গম পাহাড়ে একটি মন্দির স্থাপিত হবে। এই মন্দিরে মা ভবানীর মূর্তির সামনে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবনোৎসর্গকামী বিপ্লবীদের দীক্ষা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়া হবে। এই গ্রন্থের বক্তব্য বাংলার বিপ্লবীদের ওপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। অরবিন্দ এই বইয়ে লিখেছিলেন—Bhawani is Shakti.····India needs shakti alone. The deeper we look, the more we shall be convinced that the one thing wanting, which we must strive to acquire before all others, is strength···· If we have strength everything else will be added to us easily and naturally. In the absence of strength we are like men in a dream who have hands but cannot seize or strike, who have feet but cannot run". অরবিন্দের বক্তব্য ছিল স্বচ্ছ ও গভীর। সত্যদ্রষ্টার মতোই তিনি লিখেছিলেন: "ভারতকে আবার পুনর্জন্ম লাভ করতে হবে, কেননা বিশ্বের ভবিতব্যই তার পুনর্জন্ম দাবী করে।····এই মহান কাজ—যে কোনো জাতির পক্ষেই এটি মহত্তম ও আশ্চর্যতম কাজ— সুরু করার জন্যই ভগবান রামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন ও বিবেকানন্দ প্রচার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। একদিন মনে হয়েছিল যে এই কাজ দ্রুতগতি এগিয়ে যাবে। আজ দেখছি

কাজের অগ্রগতি থেমে এসেছে, তার কারণ আমাদের আত্মার ওপর তামসিকতার ভয়ঙ্কর মেঘ নেমে এসেছে—ভয়, সংশয়, দ্বিধা ও আলস্যই সেই মেঘ। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিয়েছে ভক্তির পথ, কেউ বা নিয়েছে জ্ঞানের, কিন্তু শক্তির অভাবে, কর্মের অভাবে সেই ভক্তি জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। আমাদের মনে রাখা দরকার যে যিনি কালী, যিনি ভবানী, যিনি শক্তিময়ী জননী রামকৃষ্ণ তাঁরই আরাধনা করতেন ও তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন।....ব্যক্তির দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতার ওপর ভারতের ভবিতব্য নির্ভর করবে না; মা চান তাঁর পূজা স্থাপনা ও বিশ্বজনীন করাব উপযুক্ত মানুষ দেশে দেখা দিক।" (অনুবাদ লেখকের)

অরবিন্দের ভবানী-মন্দির দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে, বিশেষত বিপ্লববাদীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল—কিন্তু সে সময়কাব বাজনৈতিক নেতারা অরবিন্দের বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি যুক্তিবাদী বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য শক্তিপূজার তত্ত্বে আস্থা রাখবেন না এটাই ছিল স্বাভাবিক, তিলক বিপিন পাল, লালা লাজপৎ রায়েব মতো চরমপন্থী নেতারাও অরবিন্দ-প্রচারিত তত্ত্বেব অনুকূলে ছিলেন না। বস্তুতঃ নেতাদের মধ্যে কেউই—এক নিবেদিতা ও চিত্তরঞ্জন দাস ছাড়া—এই তত্ত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেননি। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জীবনে ভবানী-মন্দিরের মতবাদ অমোঘ মন্ত্রের মতো ছিল—তিনি এর সব কথাই সত্য বলে জীবনে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। 'ভবানী-মন্দিরে' যে সত্যোপলব্ধি ছিল সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে ও জীবনে তা সার্থক ও ফলপ্রসূ হয়েছিল। 'ভবানী-মন্দিরের' লেখকের কল্পনা ও ঋষিদৃষ্টি আগে, সুভাষচন্দ্রের মতো পুরুষের আত্মপ্রকাশ তার পরে—এটাই ইতিহাসের ধারা সম্মত। অরবিন্দ ভারতের মুক্তির জন্য, গৌরবোজ্জ্বল

ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য যে শক্তি সাধনার আবশ্যকতার কথা বলেছেন সেই প্রয়োজনবোধের মূলেই সুভাষচন্দ্রের মতো সিদ্ধকাম শক্তিসাধকের আবির্ভাব ঘটে থাকে। এটাই কালপ্রমাণিত সত্য। আমরাও সে কারণে ভবানী-মন্দির গ্রন্থের প্রচারিত তত্ত্বের কথা আলোচনা না করে পারিনি।

কয়েকটি ঘটনা। ১৯০৫ সালের অন্যান্য ঘটনার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৯শে জানুয়ারি) উল্লেখযোগ্য। মহর্ষির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের একটা অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গেল। উনিশ শতকের বাংলায় সবচেয়ে বড় আন্দোলন ছিল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন—একদিন দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তার পুরোধা। বিশ শতকের বাংলায় সবচেয়ে বড় আন্দোলন রূপে দেখা দিল রাষ্ট্রমুক্তির আন্দোলন। এই নতুন আন্দোলনের সূচনা পর্বেই বিগত যুগের নেতার মৃত্যু হল। নবযুগের নতুন বাংলায় দেবেন্দ্রনাথের পুত্ররা ততদিনে নেতার আসনে বসেছেন। পুরানো বিদায় নেয়, নতুন আসে—ইতিহাসের ধারা এইভাবে বজায় থাকে।

সরলা দেবী,—দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী—বাংলার রাজনীতি থেকে এই সময় একরকম বিদায় নেন। তিনি বিয়ে করলেন পাঞ্জাবে—রামভুজ দত্তচৌধুরী নামে এক পাঞ্জাবী যুবককে। তাঁর স্বদেশ সাধনায় তার ফলে ছেদ পড়েনি, বরং বাংলার উত্তপ্ত রাজনীতিকে তিনি ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাবে নিয়ে আসেন। পাঞ্জাবে বিপ্লবী সমিতির গোড়াপত্তন তাঁরাই করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই বছর 'ভাণ্ডার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা ও ব্রহ্মবান্ধব তাঁর 'সন্ধ্যা' দৈনিক প্রকাশ করেছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা এই দুটি পত্রিকাতেই আলোচিত হত। ব্রহ্মবান্ধব সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কালোপযোগী একটা নতুন ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন—তীব্র ব্যঙ্গ ও আক্রমণপূর্ণ, সাধারণ

মানুষের, এমনকি মুটে ও মজুরের ও বাজারে চলতি কথোপ-কথনের ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে এক অদ্ভুত তেজোপূর্ণ ভাষা তাঁর হাতে স্বতঃসিদ্ধ রূপ নিয়েছিল। রাজনৈতিক আলোচনাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তাঁর অনায়াস সাফল্যকে আজ পর্যন্ত আর কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।

১৯০৬, ১৯০৭, ১৯০৮। সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু বলেছেন যে তাঁদের পরিবারে রাজনীতির আলোচনা বেশী স্থান পেত না। জানকীনাথ ছেলেমেয়েদেব সঙ্গে এসব আলোচনায় যোগ দিতেন না, আত্মীয় স্বজনরাও রাজনীতির চর্চা করতেন না,—বাড়ির ছেলেমেয়েরা বাইরের কারও সঙ্গে মেশার সুযোগও পেতনা। অথচ একথাও সত্য এবং সুরেশ বাবুও আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন যে তাঁর বাবা জানকীনাথ প্রত্যেক বছর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং তিনি ছিলেন একজন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী। ১৯০৪ সালে বম্বে শহরে কংগ্রেসের যে বিংশতি বার্ষিক অধিবেশন বসে সুরেশ বাবুর বয়স তখন মাত্র তেরো বছর—বাবা-মার সঙ্গে তিনিও সেই বয়সে কংগ্রেস অধিবেশনে গিয়েছিলেন। জানকীনাথ সঙ্গে প্রভাবতী দেবী ও একটি ছেলেকে নিয়ে যেতেন। এবং প্রত্যেক দিন বিকালে ঘোড়ার গাড়িতে জানকীনাথ ও প্রভাবতী কটক শহরের প্রান্তে মহানদী তীরে দুজন ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতেন—সুরেশ বাবু একথাও আমাদের জানিয়েছেন। এই সব ভ্রমণে সুভাষচন্দ্রও সঙ্গী হতেন মাঝে মাঝে—বাবার মুখে রাজনীতির কথা, বিশেষত জাতীয় আন্দোলনের কথা তিনি একবারও শোনেন নি তা মনে হয় না। সুভাষচন্দ্রের মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসু তাঁর চেয়ে সাত আট বছরের বড় ছিলেন; শরৎবাবু ছিলেন তীক্ষ্ণধী, রাজনীতি সচেতন ও বাগ্মী—ছাত্রজীবনেই এই সব গুণ তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল। সুরেশ বাবু বলেছেন

শরৎচন্দ্র জাতীয় বিষয় নিয়ে বক্তৃতা অভ্যাস করতেন, সমকালীন বিখ্যাত বক্তাদের বক্তৃতা অধ্যয়ন করতেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিষয়গুলি থাকত তাঁর নখদর্পণে। সুরেশ বসু মহাশয় এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর আশ্চর্য সজীব স্মৃতি, এমনকি খুঁটিনাটি ব্যাপার ও সন তারিখের কথাও যেমন অভ্রান্তভাবে তিনি বলতে পারেন তাতে তাঁর কাছে বসে সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিকথা শুনতে শুনতে বিস্মিত হয়েছি। তিনি বলেছেন প্রায় দেড় বছরের ব্যবধানে তাঁর এক একটি ভাই-বোনের জন্ম—বাবা মা কোনো একজনের প্রতি দীর্ঘদিন তাই তাঁদের স্নেহ উজাড় করে দিতে পারতেন না। ভাইবোনরা তাই কেউ আত্ম-কেন্দ্রিক হতে পারেনি, কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও হৃদ্যতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যকে অবলম্বন করতে গোড়া থেকেই অভ্যস্ত হয়েছিল। ভাইবোনরা কেউ কারও ব্যাপারে বেশি নাক গলাত না: একসঙ্গে খেলা, বসা, খাওয়া, শোওয়া হলেও নিবিড় সখ্যতার বদলে তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্নতার ভাব ছিল—নিজ নিজ চিন্তা, বোধ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা প্রত্যেকে এক একটা স্বতন্ত্র লোক সৃষ্টি করে নিয়েছিল। একটা স্বাভাবিক আভিজাত্যের বোধ তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল—তাই একের ব্যক্তিগত বিষয়ে অন্যের অনাবশ্যক কৌতূহল বেশি প্রশ্রয় পায়নি। তাই একই বাড়ির সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও ভাইবোনদের মধ্যে বেশি গা-ঘেঁষাঘেঁষি ভাব দেখা দেয়নি। পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যকে তারা সমীহ করত। সুরেশ বাবু বলেছেন দেশের ব্যাপার নিয়ে ভাইবোনরা পারস্পরিক আলোচনায় বেশি মাতামাতি করত না। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন ছিল যুগ প্লাবনের মতো,—তার তরঙ্গ এসে কটকের বসু পরিবারে নিশ্চয়ই আছড়ে পড়েছিল। তেরো বছরের কিশোর সুরেশচন্দ্র বাবা মার সঙ্গে বোম্বাই কংগ্রেসে গিয়েছিলেন—বাড়ি ফিরে এসে তিনি যা

দেখে এলেন, শুনে এলেন, সে বিষয়ে কোনো কথাই কি বলেননি ? সে সব আলোচনা হত নিশ্চয়ই ; এবং সে সব আলোচনা একেবারে বন্ধ করাই যদি জানকীনাথের কাম্য হত তবে তিনি কোনো পুত্রকে নিয়েই কংগ্রেস অধিবেশনে যেতেন না ; সেই জাতীয়তাবাদের খরতর বন্যাবেগের দিনে কংগ্রেসের সভায় কিশোর পুত্রকে নিয়ে যাবার তাৎপর্য অনুমান করা তো দুঃসাধ্য নয়। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের জাতীয়তাবাদে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। সুভাষের সারগ্রাহী মন এই সবের ভিতর দিয়ে তাঁর যুগের অন্তর্নিহিত সমস্ত ভাব ও বেদনাকে, সংগ্রামের সমস্ত তরঙ্গক্ষোভকে বুঝে নিয়েছিল, আসল সত্য যেটুকু গ্রহণ করার তা ঠিক গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাঁর গ্রহিষ্ণু ও চলিষ্ণু মন ততদিনে নিজের স্বভাব ও গতি খুঁজে পেয়েছে। পি. ই. স্কুলে পড়তে পড়তে তিনি বাল্যাবস্থা কাটিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের একজন বন্ধু ও কটকের স্কুলজীবনের সহপাঠী চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও আর একজন বন্ধু ও সমবয়সী সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্রের বাল্যজীবনের পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন :

"যে মহৎ ও উদার পারিবারিক পরিবেশে সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে তাঁর শিশুচিত্তে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ, কোন পার্থক্য স্থান পেল না। তিনি দেখলেন, তাঁদের সংসারে ঝি, চাকর, সহিস, কোচম্যান বা অন্যান্য পোষ্যবর্গ আর মনিব সকলেরই সমান স্থান। সাধারণ পরিবারে চাকর-বাকর ও অন্যান্য পোষ্যবর্গের ওপর একটা অবহেলার ভাব দেখা যায়। এই অবস্থা থেকেই শিশুচিত্তে গড়ে ওঠে ছোট-বড়র প্রভেদ। এই থেকেই শিশুর মনে জন্মায় মানুষে মানুষে প্রভেদ ও পার্থক্য। শুধু তাই নয়, এই পার্থক্য থেকে মনের মধ্যে জন্মায় অহঙ্কার ও বিনয়ের অভাব। ভবিষ্যৎ জীবনে সুভাষচন্দ্রের চরিত্র যে বিনয়, অমায়িকতা

ও সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার প্রভৃতি সদগুণে বিভূষিত হয়েছিল, শৈশবেই এই পারিবারিক পরিবেশে তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র শৈশবেই আর একটা সদগুণের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে কোন জিনিস পেলে বাড়ির সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। কোন জিনিস নিয়ে তিনি কাড়াকাড়ি করতে শেখেননি। সুতরাং হিংসা, দ্বেষ, নীচতা আর স্বার্থপরতা তাঁর চরিত্রে স্থান পেলনা। এ গুণ বাঙালীর চরিত্রে দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয়না।

পিতামাতার বিশেষ স্নেহস্পর্শ না পেলেও সুভাষচন্দ্র পিতামাতার এতগুলি সদগুণের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। বাল্যের এই গুণগুলিই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে মহত্বে গরীয়ান, উদারতায় মহীয়ান, আত্মত্যাগে বরণীয় করে তুলেছিল। আর এগুলির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তাঁর মহৎ ও উদার পিতামাতার পারিবারিক পরিবেশে। পিতামাতার মহত্ব ও উদারতা, পবিত্রতা ও তেজস্বিতা সাধারণতঃ সংক্রামিত হয় সন্তানের মধ্যে। তাই সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন মহৎ ও উদার, পবিত্র ও তেজস্বী।" (সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, পৃঃ ৪-৫)

সুভাষচন্দ্রের জন্মের পর যে ভাইবোনদে' জন্ম হয়েছিল তাঁরা হলেন : মলিনা, প্রতিভা, কনকলতা, শৈলেশ ও সন্তোষ। ভাইবোনদের মধ্যে পারস্পরিক বয়সের ব্যবধান গড়ে দেড় বছর। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি সে সময়ে সুভাষচন্দ্রের ভাইবোনদের সকলেরই জন্ম হয়ে গেছে। বড় বোনদের কারও কারও বিবাহও হয়ে গেছে। বড় দিদি প্রমীলা বসুর বিবাহ হয়েছিল সুশীলকুমার মিত্রের সঙ্গে ও মেজদিদি সরলা বসুর বিবাহ হয়েছিল বিশ্বেশ্বর দে'র সঙ্গে। সুভাষচন্দ্রের শৈশবকাল মধ্যেই তাঁদের বিবাহ হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি এই দিদিদের সঙ্গ বিশেষ পাননি— তাঁর স্মৃতিকথায় এঁদের উল্লেখও তাই বড় একটা পাইনা। আর

এক দিদি তরুবালা বসু তাঁর চেয়ে সামান্য বড় ছিলেন—তাঁরা পিঠোপিঠি ভাইবোন। সুভাষচন্দ্রের জীবনে ভাইবোনদের প্রভাব কতখানি পড়েছিল তা বলা শক্ত—প্রকৃতিতে তিনি সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিলেন, খানিকটা একগুঁয়ে স্বভাবও তাঁর ছিল; আর সুরেশবাবু বলেছেন যে তাঁরা ভাইবোনরা নিজ নিজ স্বতন্ত্র কক্ষপথে বিচরণ করতেই ভালোবাসতেন, কেউ কাউকে প্রভাবিত করতে বা কেউ কারও দ্বারা প্রভাবিত হতে চাইতেন না। বাঙালী পরিবারে এই বৈশিষ্ট্যটি কতকটা ব্যতিক্রমেরই নিদর্শন বলব।

এই সময়টাতেও সুভাষ পি. ই. স্কুলের ছাত্রই ছিলেন। ঐ স্কুলে এইগুলিই তাঁর শেষ কয়েক বছর। পূর্বের বছরগুলিতে সুভাষ পি. ই. স্কুলে বেশ সহজ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন—স্কুলের বিদেশী ভাবধারা সত্ত্বেও সেখানকার পরিবেশটাকে অস্বাভাবিক বা অনাত্মীয় বলে তাঁর মনে হয়নি। সেখানে বাইবেলের পাঠ নেবার সময় তাঁর মনে হয়নি ভারতীয় শাস্ত্র বা পুরাণ, গীতা বা রামায়ণ-মহাভারত পাঠের সুযোগ স্কুলে নেই কেন? এমন কি ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করার সময় তাঁর মনে প্রশ্ন জাগেনি যে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা স্কুলে হয়না কেন? স্কুলের সঙ্গে একটা আপাত সামঞ্জস্য তাঁর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই শেষ কয়েক বছরে সেই সামঞ্জস্য আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ল, স্কুলের ভাবধারা, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, এমন কি স্কুল-পরিচালনার উদ্দেশ্যও যে বিজাতীয় একথা বুঝতে তাঁর বাকি রইল না, এবং ভারতীয় ও অ্যাংলো ছাত্রদের মধ্যে যে সেখানে একটা পার্থক্য সৃষ্টির প্ররোচনা আছে ও সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে এই উভয় পক্ষের ছাত্রদের মধ্যে তারতম্য করা হয় তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে এল। না, স্কুলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মধ্যে হঠাৎ দোষ ঢুকে পড়েছিল তা নয়,—সুভাষের মনে বিক্ষোভ দেখা দেবার কারণ তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল, বাতাসে তখন নব-জাগ্রত

জাতীয়তাবাদের মন্ত্র মিশে আছে, স্বদেশীর পাগল-করা গান, যা রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে সুরু করে অজ্ঞাত ও অখ্যাত কবিরাও অজস্রধারায় রচনা করে চলেছিলেন, তা দূর থেকে ভেসে এসেও বালক সুভাষের হৃদয়কে নতুন বিশ্বাসে, নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলছিল,—আর ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়দের মৌলিক বিরোধ ও সংগ্রামের চেতনা,—এ সমস্ত মিলে সুভাষের সদ্য উন্মীলিত বোধ ও চিন্তারাশিকে পাল্টে দিচ্ছিল। সুভাষ বুঝলেন—পি. ই. স্কুল ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে পাঠ নেবার যোগ্য স্কুল নয়। তিনি লিখেছেন: "Things went on smoothly for some years and we seemed to have fitted into our milieu splendidly, but gradually there appeared a rift within the lute. Something happened which tended to differentiate us from our environment. Was it the effect of local causes or was it the echo of larger socio-political disturbances; that is a poser I shall not answer for the present." (An Indian Pilgrim, p. 22.)

অর্থাৎ, কয়েক বছর বেশ স্বচ্ছন্দেই কেটে গিয়েছিল এবং পরিবেশের সঙ্গে আমরা বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃই বাঁশির সুর কেটে যেতে লাগল। এমন কিছু ঘটল যার ফলে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে আমাদের বিরোধ অনুভব করা গেল। স্থানীয় কারণই তার জন্য দায়ী, না এটা বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক আলোড়নের প্রতিধ্বনি এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর এখন আমি দেব না।

বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক আলোড়ন সেদিন কী ছিল তা আমরা বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছি। স্থানীয় কারণ, অর্থাৎ স্কুলের পরিবেশের মধ্যে যেসব কারণ নিহিত ছিল সেগুলি সম্পর্কে

এখন উল্লেখ করা দরকার। স্কুলের ক্লাসগুলিতে ভারতীয় ছাত্ররাই প্রথম স্থান অধিকার করত। বসু পরিবারের ছেলেমেয়েরা তো যে যখন যে ক্লাসে পড়ত সেই তখন সে ক্লাসে ফার্স্ট হত। স্কলারশিপের জন্য সেসময় যেসব পরীক্ষা প্রচলিত ছিল তাতে ভারতীয় ছাত্ররা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের হারিয়ে দিয়ে স্কলারশিপগুলি নিয়ে যাবে এরকম শঙ্কা স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকায় স্কুল কর্তৃপক্ষ নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে ভারতীয় ছাত্ররা স্কলারশিপ পরীক্ষা দিতে পারবে না। স্কুলের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষাগুলিতে ভারতীয় ছাত্ররা তাই অংশ নিতে পারত না—এতে তাদের মনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। বিক্ষোভের দ্বিতীয় কারণ, স্কুলের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্ররা ভলান্টিয়ার কোরে যোগ দিতে পারত। তারা বন্দুক রাইফেল চালনা শিক্ষা করতে পারত, ব্যবহারও করতে পারত। ভারতীয় ছাত্ররা এই সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। যে যুগে মহারাষ্ট্রের দামোদর হরি চাপেকার, বাংলার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো যুবকরা দেশসেবা ও সামরিক শিক্ষালাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, সে যুগে ভারতীয় ছাত্ররা ভলান্টিয়ার কোরে যোগ দিতে না পারার জন্য দুঃখ অনুভব করবে সেটাই স্বাভাবিক; পাশাপাশি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের ঐ অধিকার লাভ ও প্রয়োগ করতে দেখে ঈর্ষা, অসন্তোষ, বিরক্তি এমনকি অপমান পর্যন্ত তারা বোধ করতে পারত। এইসব ব্যাপার থেকে তারা বুঝতে শিখল যে এক স্কুলে পড়া সত্ত্বেও as Indians we are a class apart—আমরা ভারতীয়রা একটি আলাদা শ্রেণী।

এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করা হলে তার স্বাভাবিক ফল স্বরূপ গোলমাল দেখা দিল। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের বিরোধ ও সঙ্ঘর্ষ ঘটতে লাগল। ঝগড়ার ফল ঘুষোঘুষিতে দাঁড়াত। ঘুষোঘুষি হয়ত সুরু

হত ব্যক্তিগতভাবে ও ব্যক্তিগত কারণে—কিন্তু তাতে সমর্থনকারীরূপে দুই সম্প্রদায় দুই পক্ষে যোগ দিত। বসু পরিবারের ছেলেরা, যে আত্মীয় বালকরা ঐ বাড়িতে থেকে পড়ত, তারাও, এইসব মারামারিতে যোগ দিত ও হার স্বীকার সাধারণত করত না। সুরেশ বসু বলেছেন তিনি সুভাষের চেয়ে ছয় ক্লাস ওপরে পড়তেন, পি. ই স্কুলে তিনি অন্যান্য ভাইদের চেয়ে পড়েছেনও বেশি সময়। তিনি মারামারিতে অংশ নিতেন ও নিজেই অ্যাংলো ছাত্রদের সঙ্গে কোনো ছুতায় গোলমাল লাগিয়ে দিতেন ও বক্সিংয়ে তাদের আহ্বান করতেন। তিনি অবশ্য আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে সুভাষ কখনো এইসব ব্যাপারে লিপ্ত হননি। যাই হোক বসুরা ক্রমেই স্কুলের সীমানার মধ্যেই ইংরেজ-ভারতীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ছিলেন। না, সুভাষের মধ্যে কোনো নীতিবায়ুগ্রস্ততা ছিল না; অ্যাংলোদের সঙ্গে ঘুষোঘুষি বা কলহে প্রবৃত্ত হবার ব্যাপারে ওরকম ভালো ছেলেসুলভ মনোভাব তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করেনি। কারণ কয়েক বছর পর কলকাতায় তাঁকে দেখব ট্রামে বা পথে ইংরেজ বা অ্যাংলোদের সঙ্গে তাঁকে শারীরিক সমরে প্রবৃত্ত হতে: ইচ্ছাকৃত ও উদ্ধত অন্যায় আচরণে এই বিজাতীয় ব্যক্তিরা সেদিন অভ্যস্ত ছিল ও তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবার দায় দেশের তরুণরা অনেক সময় নিজেদের হাতে তুলে নিত। সুভাষ ছিলেন তেমনই একজন তরুণ। পি. ই. স্কুলে অবশ্য তাঁর সে রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়েনি।

স্কুলে তাঁর একজন সহপাঠী, একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ ভারতীয় অফিসারের ছেলে, ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করত। ম্যাচ অনুষ্ঠিত হত তারই নিজের বাড়ির কাছে। ভারতীয়দের মধ্যে যারা ভালো খেলত তারা ঐ ম্যাচে ভারতীয় পক্ষে নামত। এই সব ম্যাচে হারজিত নিয়ে জাতিগত বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠত সহজেই।

স্কুলের পাঠ্যক্রম নিয়েও ছাত্রদের মধ্যে বিচার দেখা দিল।

বাধ্যতামূলকভাবে বাইবেলের নীরস পাঠ নিতে ছাত্ররা মনে মনে অস্বীকার করল। এই নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি হল গুঞ্জন। তাদের মনে সন্দেহ জাগল যে হয়তো বা ভারতীয় ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেবার মতলব স্কুল কর্তৃপক্ষ পোষণ করে। তখন তারা স্থির করল যে কোনো কারণেই তারা ধর্মান্তরিত হবে না—প্রলোভন, ভয় বা যুক্তি কিছুই তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসকে টলাতে পারবে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ তখন সত্যই বিগত; মনে রাখতে হবে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে আজীবন বিলাত প্রবাসী ও ব্রাহ্ম অরবিন্দ এরই কিছু আগে হিন্দু হয়েছেন, খ্রীস্টান সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রকাশ্যে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হবার পক্ষে প্রচার করেছেন ও কেশব সেনের খ্রীস্টধর্ম ঘেঁষা ব্রাহ্ম মতের বদলে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর তন্ত্র-যোগ-বৈষ্ণব মত সমন্বিত হিন্দুভাব সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। মনে রাখতে হবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ সেসময়ে সুরু হয়ে গেছে। বিদেশিনী অ্যানি বেসান্ত ও নিবেদিতা হিন্দুধর্মেরই বন্দনা করে ফিরছেন। ভারতীয় ছাত্রদের এই স্বধর্মনিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা তাই সেদিন ছিল স্বাভাবিক ও যুগোচিত।

সুভাষচন্দ্রের মন তখন দুটি আলাদা জগতে ঘুরে ফিরছে, আর সে দুটি জগতের মধ্যে পারস্পরিক কোনো মিল ছিল না। স্বদেশ ও স্বজাতি একদিকে, আর একদিকে এই ইংরেজ-পরিচালিত স্কুলের বিদেশী ভাবাপন্ন পরিবেশ। দুই জগতই তাঁর কাছে তখন সমান সত্য ছিল। স্কুলের পরিবেশে তাঁর মনে যত অসোয়াস্তি জাগুক না কেন তিনি সেই পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হননি। যে সব ঘটনা বিক্ষোভ, বিদ্বেষ ও অশান্তি নিয়ে আসত স্কুলের জীবনে, বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে, সেসব ঘটনার রেশ সর্বক্ষণ স্থায়ী হত না। বালক-বালিকারা বাস করে কল্পনার রাজ্যে—নিজেদের মনের সৃষ্ট

জগতে। তাদের কোমল হৃদয় ও সরল বুদ্ধি ষড়যন্ত্র, স্থায়ী শত্রুতা বা বিদ্বেষ জর্জরতার পথে যায় না; তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ভীষণ কাণ্ড করতে পারে বটে, কিন্তু সে ক্ষোভ তারা ভুলেও যায়। বয়স বাড়ার গতির তুলনায় তাদের দেহ ও মন বাড়ে দ্রুত—চারদিকে বিশ্বের আনন্দ তাদের সর্বদাই হাতছানি দিয়ে ডাকে। শুধু ক্ষোভ নিয়ে দুঃখ নিয়ে কাতরতা অনুভব করার সময় তাদের কতক্ষণ থাকে? তাই স্কুলের ঘটনাগুলি সুভাষচন্দ্রের মনে গভীর ও স্থায়ী রেখাপাত করতে পারেনি। তিনি লিখেছেন যে ঐ সব ঘটনার ফলে তিনি স্কুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন তা মনে করলে ভুল হবে। বরং তিনি স্কুল সম্পর্কে সুখীই ছিলেন। তাঁর ভাষায়: The disturbing factors referred to above were passing incidents which did not affect the even tenor of life অর্থাৎ, যে সব অস্বস্তিকর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি ছিল সাময়িক ঘটনা—আমাদের সুশৃঙ্খল জীবনধারা তাতে ব্যাহত হয়নি।

বরং স্কুলে যেমন অস্বস্তিকর ঘটনার দিক ছিল তেমনি কৌতুককর ঘটনার দিকও ছিল। কৌতুকের একজন প্রধান পাত্র ছিলেন হেডমাস্টার মশাই স্বয়ং। তিনি অ্যাংলো নন, খাঁটি ইংরেজ; স্বভাবে রাশভারী ও অত্যন্ত গম্ভীর। শিক্ষকদের মধ্যে ছাত্রদের বেত মারার অধিকার ছিল একমাত্র তাঁর ও তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রী প্রধান শিক্ষিকার। প্রধান শিক্ষিকার মাতৃসুলভ ব্যবহারে ছাত্রছাত্রীরা মুগ্ধ ছিল, তাঁকে তারা ভালবাসত, তিনি তাদের ব্যথা দেবার উদ্দেশ্যে কখনো বেত মারতেন না। যদি বেত মারার জন্য কাউকে তিনি তাঁর ঘরে ডেকে পাঠাতেন তবে তাতে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী ভয় পেত না; বেত খেয়ে তাঁর ঘর থেকে তারা বেরিয়ে আসত হাসতে হাসতে। কিন্তু প্রধান শিক্ষক মিঃ ইয়ং ছিলেন কড়া মানুষ, বেত তিনি যাকে মারতেন তার পক্ষে সেটা সহ্য করা কষ্টকর হত। তাই তাঁর

ঘরে কোনো ছাত্রকে যখন তিনি যেতে বলতেন সে ভয়ে কালো হয়ে যেত। ছাত্ররা তাঁকে ভয় পেত। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আচরণ ছিল এমনই যে ভয়ের সঙ্গে ছাত্ররা তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহও করত। তাঁর গাম্ভীর্য, শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও যোগ্যতা সমস্ত স্কুলের ওপর ছাপ রেখে গিয়েছিল। এ হেন গম্ভীর ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিটিও হাসির পাত্র হয়ে উঠতেন, কারণ তাঁর অদ্ভুত কয়েকটি হাস্যকর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর এক বড় দাদাও এই স্কুলে পড়াতেন, তিনি ছিলেন অবিবাহিত, মিশনারী, শ্মশ্রুবহুল। তিনি ছেলেমেয়েদের ভালোবাসতেন ও তাদের সঙ্গে খেলাধূলা করতেন। তাঁর ও তাঁর ভাই—দুইজনের নাম মিঃ ইয়ং। কাজেই ছেলেরা দুজনকে আলাদাভাবে বোঝাবার জন্য তাঁর নাম দিল ওল্ড ইয়ং ও হেড মাষ্টারমশাইয়ের নাম দিল ইয়ং ইয়ং। এই হচ্ছে তাঁকে নিয়ে ইয়ার্কির সুরু। তিনি ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারতেন না, ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে ছিলেন জড়ো সড়ো। এমন কি গরমের দিনেও তিনি ঘরের সব জানালা বন্ধ করে রাখতেন—পাছে বাতাস ঢুকে ঠাণ্ডা লেগে যায়। তিনি ছাত্রদেরও প্রতি পদে সতর্ক করে দিতেন যেন তারা ঠাণ্ডা না লাগায়, কেননা তাঁর মতে ঠাণ্ডার ফলে কলেরা পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তিনি শরীর একটু অসুস্থবোধ করলে এমন কড়া ডোজের কুইনাইন খেতেন যে তাঁর কাণ বধির হয়ে যাবার জোগাড় হত। বিশ বছর ধরে এদেশে বাস করার পরও তিনি এদেশের কোনো আঞ্চলিক ভাষাই বুঝতেন না—বলা দূরে যাক। কোনো বিশিষ্ট স্থান, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা পুরাকীর্তি দেখার শখ তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না, যেতেনও না তিনি কোথাও। যদি চাপরাশি তাঁর টেবিলে কিছু রাখতে ভুলে যেত তাহলে তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে ডাকতেন, তারপর যে জিনিসটা তাঁর দরকার ইশারায় তা বুঝিয়ে দিতেন ;—কিন্তু দেশী ভাষা তিনি জানতেন না তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বকার উপায় ছিল না ; শুধু কটমট করে চাপরাশির

দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর বিড়বিড় করে ইংরেজিতেই বলতেন, "কাজটা আগেই করে রাখা উচিত ছিল।" কোনো পত্রবাহক তাঁর কাছে কোনো চিঠি নিয়ে এলে তাকে যদি অপেক্ষা করতে বলার দরকার হত তবে তিনি ছুটে গিয়ে স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন "অপেক্ষা করো" কথাটা দেশী ভাষায় কিভাবে বলতে হবে? স্ত্রী যা বলে দিতেন তিনি তাই প্রাণপণে মুখস্থ করতে করতে আসতেন—কোনোরকমে লোকটিকে কথাগুলি বলে দিয়েই তিনি যেন ভারমুক্ত হতেন। ছাত্ররা এইসব ব্যাপার নিয়ে হাসিঠাট্টা করত নিজেদের মধ্যে। কিন্তু আগেই বলেছি তারা তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভয়ও করত। মিঃ ইয়ংয়ের স্কুল পরিচালনায় তাই কোনো ত্রুটি দেখা দেয়নি।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মনে তবু আস্তে আস্তে চাপা অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল কেন? তার একটা কারণ অবশ্যই ব্যক্তিগত ছিল। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভালো ছাত্র, পরীক্ষায় ফার্স্ট হতেন—কিন্তু পি. ই. স্কুলে লেখাপড়ার কৃতিত্বকেই যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি ধরা হত না; খেলাধূলা, ডানপিটে ভাব ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকেও ছাত্রদের গুণ নির্ধারণের মাপকাঠি হিসাবে ধরা হত। সুভাষ খেলাধূলায় ভালো ছিলেন না, ঘুসোঘুষি প্রভৃতিতেও কখনো অংশ নেননি—ছাত্রদের চোখে তাঁর কৃতিত্বের পাল্লা তাই ভারী ছিল না, স্কুল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতেও তিনি খুব যোগ্য ছাত্র বলে বিবেচিত হতেন কিনা বলা শক্ত। নিজের সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র তাই খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পারতেন না, বরং একটা ব্যর্থতার গ্লানি তিনি অনুভব করতেন। নিজের ভিতরে একটা অসামান্যতা ও শক্তির বোধ তাঁর ছিল স্বভাবসঙ্গতরূপে; কিন্তু বাইরের জীবনে অন্যদের তুলনায় হীনপ্রভ বলে নিজেকে মনে হওয়ায় এই ব্যর্থতার চেতনা তাঁর মধ্যে উদিত হয়েছিল। নিজেকে সামান্য, ক্ষুদ্র, সাধারণ বলে অন্যদের কাছে প্রতীত হতে দেখে ঐ বোধ তাঁকে তাড়া করে

ফিরত। এই বোধ তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর পারিবারিক পরিবেশেই—স্কুলে এসে সেটাই আরও জোরদার হল। নিজের সম্পর্কে একটা নিচু ধারণা তাঁর হয়ে গেল। স্কুলের একেবারে প্রথম ধাপে ভর্তি হওয়ায় গোড়া থেকেই বড়দের সম্পর্কে একটা সমীহ ভাব তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল—আর বড়দের তুলনায় নিজেকে মনে হত তুচ্ছ। স্কুলের পরিবেশে তাঁর বেমানান লাগার এও একটা কারণ।

কিন্তু স্কুল যে তাঁর শেষ পর্যন্ত ভালো লাগল না, এ তার সবটা কারণ নয়। মূলে ছিল একটা ব্যাপক ও বৃহত্তর কারণ। তাঁর ভারতীয় সত্তা ও ভারতীয় প্রকৃতি ইংরেজিয়ানার পরিবেশকে সইতে পারল না। তাঁর বাড়িতে জানকীনাথের মতো স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন কর্তা—শরৎ বসুর মতো একজন ভাবী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন তাঁর দাদা। দেশের খবর বসু বাড়িতে সবই এসে পৌছত। সমস্ত দেশ যখন জাতীয় ভাব ও জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা আলোড়িত তখন তারই একজন ভবিষ্যৎ প্রাণপুরুষ—যাঁকে পরবর্তী কালে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতসাধকে রূপান্তরিত হতে দেখব—তাঁর পক্ষে ইংরেজিয়ানার পরিবেশকে নিজের প্রকৃতিসঙ্গত পরিবেশ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি লিখেছেন :

We had been living in two distinct worlds and as our consciousness developed we began to realise slowly that these two worlds did not always match. There was, on the one hand, the influence of family and society which was India. There was, on the other, another world, another atmosphere, where we spent most of our working days, which was not England, of course, but a near approach to it.

(An Indian Pilgrim, p. 23.)

অর্থাৎ, আমরা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র দুটি জগতে একসঙ্গে বাস করছিলাম ; আমাদের চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম যে এই দুটি জগৎ সব সময় একসঙ্গে খাপ খায় না। একদিকে ছিল পরিবার ও সামাজিক জীবন নিয়ে গড়া একটি জগতের প্রভাব—যা ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ;—আর একদিকে ছিল একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ ও ভিন্ন পরিবেশ, যা খাঁটি ইংলণ্ডের না হলেও ইংলণ্ডের অনুরূপ।

এই দ্বৈত জগতের দ্বন্দ্ব ছাত্রদের মনে, বিশেষত সুভাষচন্দ্রের মতো অন্তর্মুখী বালকের মনে একটা ব্যথা ও কাতরতা সৃষ্টি করেছিল। নিজেকে অসুখী ও বেমানান বলে তাঁর মনে হত ও কোনো একটা ভারতীয় স্কুলে যোগ দিতে তাঁর মন আকুলি-ব্যাকুলি করত। তিনি লিখেছেন :

It is posible that this feeling grew within me because I was too much of an introvert—ঐ, পৃষ্ঠা ২৪। এই বোধ আমার মধ্যে জন্মাবার কারণ হয়তো আমার অন্তর্মুখী স্বভাব।

ভারতীয় স্কুলে যোগ দেবার পক্ষে তাঁর দাদাদের প্ররোচনাও ছিল। তাঁরা পি. ই. স্কুল ত্যাগ করে কেউ বা ম্যাট্রিক, কেউ ইণ্টারমিডিয়েট, কেউ বা ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন সেসময় ; তাঁরা বললেন অভারতীয় স্কুলে থাকার কোনো মানে হয় না। এই দাদারা ছিলেন সবাই মনে প্রাণে ভারতীয়।

পি. ই. স্কুল ত্যাগ করার পক্ষে আরও একটা জরুরী কারণ ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীআশুতোষ মুখার্জি ভাইস-চ্যান্সেলার হবার ফলে তিনি এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন যে ভারতীয় ছাত্রদের ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী পরীক্ষায় মাতৃভাষায় আবশ্যিক ভাবে পরীক্ষা দিতে হবে। সুভাষচন্দ্রকে যদি কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসতে হয় তবে বাংলা তাঁকে শিখতেই হবে,—আর নতুবা তাঁকে ইংলণ্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হতে হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েয় অনুমোদিত পাঠ্যক্রমও পি. ই. স্কুলে অনুসরণ করা হত না। অতএব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি নিজের বিশ্ববিদ্যালয় বলে নিতে হয় তবে ভারতীয় স্কুলে ভর্তি হওয়া ছাড়া সুভাষচন্দ্রের আর উপায় ছিল না। আর নতুবা মনে প্রাণে সাহেব হয়ে বিলেতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হবার ব্রতে তাঁকে দীক্ষা নিতে হত।

এই সব কারণে পি. ই. স্কুল ত্যাগ করাই তিনি স্থির করেছিলেন। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, তার ফলও বেরোল। তখন ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ। সুভাষ হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে স্কুল ত্যাগের অনুমতি ও সার্টিফিকেট নিলেন। আসার সময় তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন। অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছেও বিদায় প্রার্থনা করলেন। এতদিনের পুরনো স্কুল—শৈশব-বাল্যের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বছর ও বহু স্মৃতিতে ভরা দিনগুলি যেখানে কাটিয়েছেন তাব জন্য, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকার জন্য কোনো বেদনাই তিনি অনুভব করলেন না। বিদায় ক্ষণটি হয়ে উঠল না বিয়োগ-বিধুর। চোখে দেখা দিল না একবিন্দু অশ্রু। ঐ বিদেশী ভাবাপন্ন স্কুল ও তার পরিবেশের প্রতি আর কোনো মায়াই তাঁর অবশিষ্ট ছিল না। বীতশোক সুভাষ সোজা হেঁটে বেরিয়ে এলেন স্কুল থেকে—তোমার সঙ্গে এতদিনের পুরাতন সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল হে বিদ্যালয়। যা অপ্রয়োজনীয়, জীবনের উদ্দেশ্যের অনুকূল নয়,—তাকে ফেলে যাবার মুহূর্তে সাময়িক মায়া ও মোহে আচ্ছন্ন হবার মতো হৃদয়-দৌর্বল্যকে সুভাষ প্রশ্রয় দেননি। তাঁর শৈশব চেতনাই তাঁকে মোহমুক্ত, মায়ামুক্ত করেছে। হে নিঃসঙ্গ পথের পথিক! এবার আত্ম-আবিষ্কারের পথে তোমার যাত্রা শুভ হোক!

চিত্তরঞ্জন দাস। সুভাষচন্দ্রের প্রথম স্কুল জীবনের শেষ দিনগুলিতে যখন তিনি সচেতন জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠছিলেন তখন তাঁর ভাবী রাজনৈতিক গুরু চিত্তরঞ্জন দাস কী করছিলেন? খোঁজ নেওয়া দরকার। কারণ জাতীয় জীবনের রঙ্গ-মঞ্চে সুভাষচন্দ্রের প্রবেশের সঙ্গে এই বিশাল পুরুষের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা বাদ দিয়ে সুভাষচন্দ্রের জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায় —দেশবাসীর মুক্ত দৃষ্টির সামনে নেতারূপে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশের অধ্যায়—আলোচনা করাই যায় না। সুভাষ যখন দেশাত্মবোধের প্রেরণায় তাঁর ইংরেজি স্কুল ছেড়ে দিলেন তখন সেই দেশপ্রেমিকদের রাজা দেশবন্ধু কী করছিলেন?

চিত্তরঞ্জন দাস কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন সে সময়ে। তাঁর বাবা ভুবনমোহন বৃহৎ পরিবারের কর্তা ছিলেন—বহু আত্মীয় স্বজন তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হত। কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের ফলে তাঁর আর্থিক অবস্থা মন্দের দিকে গিয়েছিল। তিনি এমনিতেই ঋণভার জর্জরিত হয়েছিলেন। তারপর এক বন্ধুর জন্য চল্লিশ হাজার টাকার জামিন হয়েছিলেন। বন্ধু টাকা না দেওয়ায় সমস্ত টাকা পরিশোধের দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর কাঁধে। চিত্তরঞ্জন ও তাঁর ঋণভারগ্রস্ত পিতা ১৯০৬ সালের জুন মাসে আদালতে দেউলিয়া বলে নিজেদের নাম ঘোষণা করেছিলেন। সে সময়ে অর্থের অনটনে এক দুঃসহ সময় যাচ্ছিল চিত্তরঞ্জনের—তাই আইন ব্যবসা ছাড়াও সিটি কলেজে লেকচারারের পদ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

সেই দুঃখের দিনেও তিনি কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁর দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল—মালঞ্চ (১৮৯৫) ও মালা (১৯০৪)। মালঞ্চের ৫৩টি কবিতার মধ্যে প্রতিটি কবিতাই সুরচিত ও কয়েকটি নিশ্চিতভাবে রসোত্তীর্ণ। এই গ্রন্থে গ্রথিত কবিতাগুলির মধ্যে "বারবিলাসিনী" নামে একটি

উজ্জ্বল কবিতা আছে, চিত্তরঞ্জনের বেদনাকাতর হৃদয়ের স্পর্শ আজও ঐ কবিতাটিতে অম্লান,—কিন্তু এই কবিতাটি তাঁর যৌবনকালে সামাজিক দুর্ণামের কারণ হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা এই কবিতাটি নিয়ে শুধু প্রতিবাদের বিপুল ঝড় তুলেই ক্ষান্ত হননি, চিত্তরঞ্জনের বিবাহ-উৎসবও তাঁরা বয়কট করেছিলেন। অথচ আজ অশ্লীলতা ও নীতিজ্ঞানহীনতার দায়ে এই কবিতাটিকে অভিযুক্ত করা নিতান্তই হাস্যকর ও ছেলেমানুষী মনে হয়। 'মালঞ্চে' কবির যে বিদ্রোহের সুর, অবিশ্বাস, সংশয়, জ্বালা ও যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ অনুভূতি ছিল—'মালা'য় তার বদলে দেখি শান্ত, গম্ভীর, মৌন বিষাদের সুর। কবির কণ্ঠস্বরে এসেছে গভীরতার স্পর্শ এবং একটা নতুন প্রত্যয়ের তটপ্রান্ত যেন তাঁব কবিদৃষ্টিব সামনে আভাসিত হয়ে উঠেছে। 'মালা'র একত্রিশটি কবিতায় কবির অতৃপ্ত, অশান্ত হৃদয় বিশাল, গাঢ় এক মৌনতাব মধ্যে অনির্বচনীয়ের অনুভবে স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে চেয়েছে।

বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্ত যখন প্রকাশিত হয়েছিল চিত্তরঞ্জন তখন দার্জিলিঙে ছিলেন। পূজার ছুটি উপলক্ষে আদালত বন্ধ ছিল,—তাই তিনি সপরিবারে দার্জিলিঙে অবকাশ যাপন করছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও সে সময়ে দার্জিলিঙে ছিলেন। সেখানেই এক জনসভায় চিত্তরঞ্জন ও নিবেদিতা বঙ্গবিভাগেব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁর রসা রোডের বাড়ি চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের প্রধান পরামর্শ ও কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কাশী কংগ্রেসের ঠিক আগে তাঁর বাড়িতে 'স্বদেশী মণ্ডলী' গঠনের কথা বলেছি। তিনি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি "অনুশীলন সমিতির" সহ-সভাপতি হয়েছিলেন অরবিন্দের সঙ্গে। বাংলায় যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রস্তাবনা, গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের একটি প্রধান ও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাঁরই আহ্বানে তাঁর ইংলণ্ডের ছাত্রজীবনের বন্ধু

অরবিন্দ বরোদার ৮০০ টাকা বেতনের সম্মানিত চাকরি ছেড়ে কলকাতায় জাতীয় বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ পদ মাসিক মাত্র ৭৫ টাকা বেতনে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন ১৯০৬ সালে বরিশাল কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। ঐ বছর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনের জন্য সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিতণ্ডা হয়েছিল। চরমপন্থীরা চেয়েছিলেন লোকমান্য তিলককে সভাপতি করতে। নরমপন্থীরা দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি হবার জন্য বিলাতে গোপনে নিমন্ত্রণপত্র পাঠালেন। কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি থেকে চরমপন্থীদের বিতাড়িত করবার ষড়যন্ত্র হল, চিত্তরঞ্জনও এই বিতাড়িতদের মধ্যে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে তিনি এমন কি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে পর্যন্ত আপসে আসতে রাজি আছেন, কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে কোনোরকম মিটমাট তিনি চান না, কেন না, তাঁর কথায়: Mr. C. R. Das is so queer

ষড়যন্ত্রে নরমপন্থীরাই সফল হয়েছিলেন। দাদাভাই নৌরজী কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে কলকাতায় এলেন। যে চিত্তরঞ্জন ছিলেন ছাত্রবয়সে দাদাভাই ও সুরেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ, এখন রাজনৈতিক কর্মধারার ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের বিরোধী;—তাঁর কাছে বেদনাবহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই ব্যাপারটি। চিত্তরঞ্জনের এই মানবিক মূল্যবোধের দিকটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য—কারণ রাজনৈতিক বিরুদ্ধ মতবাদীদের প্রতিও হৃদয়ের শ্রদ্ধা বজায় রাখার ধর্ম আধুনিক কালে বিকৃত হলেও সুভাষচন্দ্রের ঠিক এই গুণটি ছিল। মহাত্মাজীর প্রতি যে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও হৃদয়-দৌর্বল্যের পরিচয় চরম অন্যায় ও অপমানকর ব্যবহার পাবার মুহূর্তে তিনি দিয়েছেন তাতে তাঁর অনুরাগী ও সমালোচক উভয় পক্ষই তাঁর চরিত্রে দোষারোপ করেছেন, বলেছেন—ওটা রাজনীতিজ্ঞের উপযুক্ত কাজ হয়নি। কিন্তু সুভাষের

সঙ্গে এইখানে ছিল গুরু চিত্তরঞ্জনের মিল। রাজনৈতিক অঙ্ক চালনার মধ্যে বসেও মানব হৃদয়ের মাধুর্যকে তাঁরা হারাননি। দেশবন্ধুর কন্যা অপর্ণা দেবী তাই লিখেছেন: "বাবা খুব ব্যথিত হলেন, এবং আমাদের বাড়িতে লোকমান্য তিলক, খাপার্দে এবং ডাক্তার মুঞ্জে তাঁদের সহকর্মিগণসহ আসবেন জেনেও তিনি এ কংগ্রেস এড়াবার জন্যই মা'র উপর অতিথি সংকারের ভার দিয়ে ঠাকুরমা-দাদামণির সঙ্গে পুরুলিয়া চলে গেলেন। লোকমান্যর জন্য রসা রোডের বাড়ি রাতদিন লোকে লোকারণ্য ছিল। সারারাত স্বেচ্ছাসেবকেরা 'বন্দেমাতরম' বলে বাড়ি পাহারা দিত। কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেলেই পিতৃদেব কলকাতা ফিরে এলেন। লোকমান্য তারপরও কিছুদিন ছিলেন। তিলকের সঙ্গে বাবার স্নেহপ্রীতির নিবিড় সম্পর্ক ছিল, দুজনে দুজনকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়াও তাঁদের দুজনের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহু আলোচনা হতে দেখেছি, একথা বললে ভুল হবে না যে লোকমান্যের মহারাষ্ট্রও পিতৃদেবকে একান্ত আপনার জন বলেই গ্রহণ করেছিল।" (মানুষ চিত্তরঞ্জন, পৃ. ৫৯-৬০)

তিলক কলকাতায় ১৯০৬ সালে এসেছিলেন শুধু কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষেই নয়। চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলার চরমপন্থী দল "স্বদেশী মণ্ডলী" শিবাজী উৎসব ও মা ভবানীর পূজার আয়োজন করেছিলেন—তিলক তাতেও যোগ দেন। অরবিন্দ, বিপিন পাল, তিলক ও চিত্তরঞ্জন যে নবীন জাতীয়তাবাদ ভারতে প্রচার করতে চেয়েছিলেন তা ভারতের সনাতন ধর্মের জাগরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তাবাদ থেকে তা পৃথক। সুরেন্দ্রনাথ-প্রচারিত জাতীয়তাবাদ থেকেও তাঁরা মুক্ত ও স্বতন্ত্র ছিলেন তাই। ৬০ হাজার লোক সমভিব্যাহারে তিলক গঙ্গাস্নান করতে গেলেন এবং মাহেশের রথও দেখতে গেলেন—এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ঘটাবার কথা চিন্তা করে।

১৯০৬ সালের আর একটি প্রধান ঘটনা—ইংরেজি দৈনিক "বন্দেমাতরমের" প্রকাশ। আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক হিসাবে বিপিন পালের নাম প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকাখানির প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন অরবিন্দ। দেশবন্ধু নেপথ্যে ছিলেন পত্রিকার জন্য অর্থসংগ্রহের ভার নিয়ে। বস্তুত এই কালটিকে দেশবন্ধু-অরবিন্দ-বিপিন পাল এই ত্রয়ীয় মিলিং চরমপন্থী স্বরাজ সাধনার কাল বলে অভিহিত করা যায়। চরমপন্থী রাজনীতি, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, জাতীয় শিক্ষা, বন্দেমাতরম পত্রিকা এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁরা একত্রে কাজ করেছিলেন—উপরন্তু অনুশীলন সমিতির মতো বৈপ্লবিক সমিতিতে অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন একত্রে নেতৃত্ব দিতেন।

বরিশাল সম্মেলন। ১৮৮৬ সাল থেকে প্রতি বছর বাংলা দেশে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন চলে আসছিল। ১৯০৬ সালে বরিশালে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা স্থির হয়। বরিশাল সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার এ. রসুল। সদ্যগঠিত পূর্ববঙ্গের গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের সার্কুলারের বলে পূর্ববঙ্গে প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে। লাঠির আঘাত কারও কারও পক্ষে গুরুতর হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা নামে এগারো বছরের একটি বালককে পুলিশ লাঠি মারতে মারতে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল, তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বরিশাল সম্মেলনেই রাজনৈতিক শোভাযাত্রার ওপর প্রথম পুলিশী দমননীতি নেমে এসেছিল—আবার বরিশালেই প্রথম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ জন্মলাভ করে। বালক চিত্তরঞ্জন পুলিশের লাঠির ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েও এবং পুকুরের

জলে দাঁড়িয়ে অসহায় অবস্থায় মার খেতে থাকা সত্ত্বেও 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়া বন্ধ করেনি। সে সেদিন প্রথম যথার্থ সত্যাগ্রহীর আদর্শ তুলে ধরেছিল। বরিশালে পুলিশী অত্যাচার, জোর করে সম্মেলন ভেঙে দেওয়া ও সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার সারা বাংলা দেশে আগুনের হল্কা ছড়িয়ে দিয়েছিল। সারা ভারতেও প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার পর সুরেন্দ্রনাথ বাংলার মুকুটহীন রাজা রূপে জনচিত্তে সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। সুদূর পঞ্জাবের পত্রিকায় বাংলার এই ঘটনা উপলক্ষে কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল :

The scales have fallen from your eyes,-
On ! On ! where path of honour lies.
On ! On ! if needed, freely bleed,
For, patriot's blood is freedom's seed.

Punjabee, April 25, 1906.

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে বরিশাল সম্মেলন একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। সেদিন সেই ঘটনার ভিতর দিয়ে আমাদের অগ্নিশুদ্ধ হবার সুযোগ এসেছিল এবং আমাদের জাতীয়তাবাদ কতখানি দৃঢ় তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।"

অরবিন্দের গুপ্ত সমিতি। 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকার মাধ্যমে অরবিন্দ বাংলায় দ্বিতীয়বার গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গড়ার কাজ সুরু করেছিলেন। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় প্রকাশ্য নেতা ছিলেন বারীন্দ্র; অরবিন্দ ছিলেন নেপথ্যে চালকরূপে।

অরবিন্দ বরিশাল সম্মেলনে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন নীরবে। কিন্তু তাঁর মনের গোপনতলে একটি দৃঢ় সঙ্কল্প সেদিন জেগেছিল। তা হল পুলিশী অত্যাচারের মূল নায়ক গভর্ণর বামফিল্ড ফুলারকে হত্যা করতে হবে। হত্যার জন্য আয়োজন সম্পূর্ণ করতে বারীন ফুলারের গ্রীষ্মাবাস শিলংয়ে গিয়েছিলেন এবং হত্যার

দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় হেমচন্দ্র কানুনগোকে। এই উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য হেমচন্দ্র কানুনগোকে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে গোয়ালন্দগামী ট্রেনে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। শিলং, গৌহাটি, বরিশাল, রংপুর নৈহাটি প্রভৃতি নানা স্থানে ফুলারের ওপর বোমা মারার চেষ্টা হয়েছিল; সে চেষ্টা সফল হয়নি। অরবিন্দের নির্দেশে টাকার প্রয়োজনে রংপুরে স্বদেশী ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল।

অনুশীলন সমিতি। স্বদেশী আন্দোলনের খরপ্রবাহের মধ্যে অনুশীলন সমিতি সারা বাংলা দেশে প্রসার লাভ করে। পি. মিত্র ১৯০৫ সালে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে তাঁর বক্তৃতা প্রচার করেন ও বহু লোক সংগ্রহ করেন। তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন পুলিন দাস। ১৯০৬ সালে অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বমণ্ডলী এইভাবে গঠিত হয়েছিল:

পরিচালক - পি. মিত্র

সহ-সভাপতি - অরবিন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাস

কোষাধ্যক্ষ - সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র)

যুগ্ম সম্পাদক - সতীশচন্দ্র বসু ও পুলিন বিহারী দাস

অনুশীলন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার ভার সতীশচন্দ্র বসুর ওপর ও পূর্ববঙ্গ শাখার ভার পুলিন দাসের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল।

ঢাকা অনুশীলন সমিতি। পুলিন দাসের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গ শাখা, যার প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকায়,—সারা বাংলা দেশে ও পরে সমগ্র ভারতে ও বহির্দেশে বিস্তার লাভ করে। পি. মিত্র লোকান্তরিত হলে পুলিনবাবুই কার্যতঃ অনুশীলন সমিতির নেতা হন। তিনি দেশবাসীর মধ্যে ক্ষাত্রশক্তি জাগরণের জন্য অসি খেলা, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও ড্রিল শিক্ষা প্রচলন করেন। অনুশীলন সমিতির সভ্যদের দেবী মন্দিরে দেবীর সামনে শপথ বাক্য পাঠ করে দীক্ষা নিতে হত। এই সমিতি ছিল সশস্ত্র বিপ্লব পন্থায় বিশ্বাসী।

তাই সমিতি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে আবশ্যক জনবল, অস্ত্রবল ও ধনবল সংগ্রহে মন দিয়েছিল। নানা গোপন পথে তারা অস্ত্র সংগ্রহ করত। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় তাদের কয়েকটি বোমার কারখানাও ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল চন্দননগরের বোমার কারখানা—মতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এই কারখানাটির দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

যুগান্তর। অরবিন্দের নিজস্ব গুপ্ত বিপ্লবী দলও এই সময়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠে। ১৯০৬ সালে বারীন্দ্র পঞ্চাশ টাকা মূলধন সম্বল করে বের করেন 'যুগান্তর' পত্রিকা—নিবেদিতা ছিলেন তাঁর প্রেরণা ও পরামর্শদাত্রী। তাঁর ঘরে বসেই যুগান্তর' পত্রিকার পরিকল্পনা পাকা হয়েছিল। প্রথম থেকেই যুগান্তব খোলাখুলি বিপ্লবেব কথা লিখতে সুরু করেছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক, লেখকদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, বারীন্দ্র প্রভৃতি। উপেন্দ্রনাথ এই যুগান্তর পত্রিকার সময়কার কথা লিখতে যেয়ে বলেছেন: "সত্য সত্যই তখন একটা জ্বলন্ত বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমরাই সত্য, ইংরেজের তোপ, বারুদ গোলাগুলি, পল্টন, মেশিনগান - ওসব শুধু মায়ার ছায়া! এ ভোজবাজীর রাজ্য, এ তাসের ঘর—আমাদের এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে। নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম; মনে হইত যেন দেশের প্রাণ-পুরুষ আমাদেব হাত দিয়া তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেছেন।" (নির্বাসিতের আত্মকথা)। পত্রিকার নামে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবী গোষ্ঠী যুগান্তর দল নামে পরিচিত হয়।

বাংলায় অরবিন্দ। ১৯০৬ সালের ১৫ই আগষ্ট অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বরোদার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি স্থায়ীভাবে বাংলায় বাস করতে সুরু করেন। তাঁর

বৈপ্লবিক রাজনীতির ফলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদে বেশিদিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি—এক বছর পরই তিনি সেখানে পদত্যাগ পত্র দেন।

নরমপন্থা ও চরমপন্থা। চরমপন্থীরা সকলেই একমতাবলম্বী ছিলেন না—অরবিন্দ ও বিপিন পালের মধ্যেও মত বিরোধ ছিল। বিপিন পাল ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীনেই ভারতের স্বায়ত্তশাসন চাইতেন। তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও বয়কট আন্দোলনের উদ্ভাবক ও সমর্থক হলেও কোনো সহিংস পন্থায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু চরমপন্থীদের মিল ছিল এইখানে যে আবেদন-নিবেদন ও বক্তৃতার বদলে তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন এবং শুধু শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে রাজনীতিকে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের সমস্ত জনসাধারণকে নিয়ে তাঁরা বিদেশী শাসকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাইতেন। কাশী কংগ্রেসের পর কলকাতা কংগ্রেসেও নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিবাদ ঘটেছিল, কিন্তু মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে এই বিবাদ তীব্র ও তিক্ত রূপ নেয়। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে মেদিনীপুরে যখন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিপিন পাল তখন কারাগারে থাকায় অরবিন্দই চরমপন্থীদের প্রকাশ্য নেতা রূপে দেখা দেন। চরম ও নরমপন্থীদের মতভেদের কারণে এই সম্মেলন ভেঙে যায় ও অরবিন্দ একটি নতুন জাতীয় দলের পুরোবর্তী বাংলার নবীন নেতা রূপে আবির্ভূত হন।

মুসলিম লীগ। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার নবাব সলিমুল্লার বাড়িতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা-সভায় ফজলুল হকও ছিলেন। লীগের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে মুসলমানদের সরিয়ে রেখে ইংরেজের কাছ থেকে তোষামোদের সাহায্যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করা। তিন মাসের মধ্যেই সলিমুল্লা কুমিল্লায় যেয়ে মুসলমানদের উত্তেজিত করে হিন্দুহত্যায় নামিয়ে দেন। কুমিল্লার

পর জামালপুরেও মুসলমানরা হিন্দুহত্যা ও নারীহরণ শুরু করে। সরকার তাদের বাধা দেয়নি। অরবিন্দ অগ্নিবর্ষী লেখনীর মাধ্যমে প্রতিরোধ রচনায় হিন্দু সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।

ফ্রেজার ও অ্যালেন। বারীন্দ্র 'যুগান্তর' পত্রিকার আসর ছেড়ে মাণিকতলার বাগান বাড়িতে যেয়ে বোমার দল গঠনে মনোনিবেশ করেছিলেন এই সময়ে। ছোটলাট ফ্রেজারেব ট্রেণ ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা বারীন্দ্রের দলই করেছিল। অন্য একটি দল ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেনকে গুলি করেছিল।

সুরাট কংগ্রেস। সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরের শেষে। তিলক ও অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থীদের নেতা। তাঁরা কংগ্রেসের এই অধিবেশন ভেঙে দেন। একটি সর্বভারতীয় নতুন জাতীয় দল তার ফলে সৃষ্টি হয়—গণ-আন্দোলন পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব এই দলই নেয়। নরমপন্থীরা সুরাটে চরমপন্থীদের কোণঠাসা করে নিজেদেব আবেদন-নিবেদনমূলক রাজনৈতিক প্রোগ্রাম পাশ করাবাব চেষ্টা করাব ফলেই কংগ্রেসেব এই প্রকাশ্য ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী। মিঃ কিংসফোর্ড যখন কলকাতায় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তাঁর অত্যাচারী প্রকৃতির জন্য তখনই তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। তারপর তিনি মজঃফরপুরে বদলি হয়ে যান। বারীন্দ্র তাঁকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে বোমাসহ পাঠান। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বোমা ফাটে, কিন্তু ভুলের ফলে মিসেস ও মিস কেনেডি নিহত হন। যেদিন হত্যাকাণ্ড ঘটে তার পূর্ব দিনের 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "Revolution, bare and grim, is preparing her battlefield moving down the centres of order which were evolving a new cosmos and building up the materials of a gigantic downfall and a mighty new

creation. We could have wished it otherwise. But God's will be done!" অরবিন্দের অগ্নিগর্ভ লেখনীমুখে বিপ্লবের আহ্বান ক্রমাগত বেজে উঠছিল—কিন্তু এই দিন তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মতো কথাগুলি লিখেছিলেন। বাংলায় বিপ্লবের রণ দামামা ঘোষিত হল কিশোর ক্ষুদিরামের লক্ষ্যভ্রষ্ট বোমার বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন, প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তারের আগেই নিজের জীবন নাশ করেন। একদিন পর ৩২, মুরারি পুকুর রোডের মাণিকতলা বাগান পুলিশ অবরোধ করে বারীন্দ্রের দলটিকে বোমা ও অন্যান্য অস্ত্র সমেত গ্রেপ্তার করেন। অরবিন্দও গ্রেপ্তার হন।

বোমার মামলা। মাণিকতলা বোমার মামলা নামে খ্যাত মামলাটি এর পর সুরু হয়। গ্রেপ্তার হবার পর বারীন্দ্র পুলিশের কাছে তাঁর বিপ্লবায়োজনের সমস্ত কথা স্বীকার করেন—অরবিন্দের নামটি গোপন করা ছাড়া সংশ্লিষ্ট আর সবার নামই তিনি প্রকাশ করে দেন। কারণ গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনে করেছিলেন: My mission is over তার কথায়: "আমাদের দফা ত এই খানেই রফা হইল, এখন আমরা যে কি করিতেছিলাম তাহা দেশের লোককে বলিয়া যাওয়া দরকার।" ও "আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতক হস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে, বুঝি এ মরণভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না।" এই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে বারীন্দ্র তার দলের সবার নামও বলে দেন এক অরবিন্দ ছাড়া। তার ফলে পুলিশ সব কর্মীদের গ্রেপ্তার করে—এদেরই মধ্যে একজন ছিল নরেন গোঁসাই। নরেন যখন জানতে পারে যে বারীন্দ্রবাবু তাঁর নাম পুলিশকে বলার ফলেই সে গ্রেপ্তার হল তখন প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে সে অরবিন্দও বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত একথা পুলিশের কাছে প্রকাশ করে ও নিজের প্রাণরক্ষার জন্য রাজসাক্ষী হয়ে যায়। তাই বিপ্লবীদের রাগ তার

ওপর পড়ে ও জেলের ভিতরই তাকে হত্যা করার সঙ্কল্প হয়। ১লা সেপ্টেম্বর নরেনকে জেল হাসপাতালে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেন সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্ত। জেলের মধ্যে পিস্তল কীভাবে এসেছিল আজও তা রহস্যাবৃত হয়ে আছে। পরে বিচারে সত্যেন ও কানাই উভয়েরই ফাঁসি হয়। এই সমস্ত ঘটনায় সারা ভারতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিপ্লবীরা দেশবাসীর মাথার মণি হয়ে ওঠে।

মামলা সুরু হয় সেসন কোর্টে জজ মিঃ বীচক্রফটের কাছে। দেশবন্ধু এই মামলা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে অমানুষিক পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিচারকের রায়ে অরবিন্দ মুক্তি পেয়েছিলেন। ১৯০৯ সালের ৯ই মে বিচারের রায় বেরিয়েছিল। দণ্ডিতেরা আপীল করেছিলেন, আপীল বিচারের পর আবার রায় বেরিয়েছিল নভেম্বরে। নিম্নলিখিত কয়েকজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান যাত্রা করেন ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে: বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতিভূষণ সরকার, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় ১১ই আগস্ট।

যে পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল সেই নন্দলাল ব্যানার্জীকেও বিপ্লবীরা কলকাতায় খুন করে। সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করেছিলেন চারুচন্দ্র বসু—তাঁরও ফাঁসি হয়েছিল। গোয়েন্দা সামসুল আলম নিহত হন বীরেন্দ্র দত্তগুপ্তের গুলিতে—দত্তগুপ্তেরও ফাঁসি হয়। এর পর কয়েক বছর যুগান্তর দলের কার্যকলাপ আর দেখা যায়নি। সেদিক থেকে ১৯০৯ সালের শেষে বাংলাদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টার একটা অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ের নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি তখনো গোপনে তাঁর প্রস্তুতি পর্ব চালাচ্ছেন। তিনি তখন সরকারী চাকরি করতেন। সামসুল

আলমের হত্যার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট সন্দেহে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল, কিন্তু প্রমাণাভাবে ১৯১১ সালে তিনি ছাড়া পান।

বোমা, পিস্তল তথা বিপ্লববাদের সঙ্গে যুক্ত না হলেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই কজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়, যথা—শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিন বিহারী দাস ও ভূপেশচন্দ্র নাগ। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরেই এঁরা বাংলা দেশ থেকে নির্বাসিত হন। ফলে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও স্বাধীনতার সংগ্রামে একটা স্তব্ধতার ভাব এসে উপস্থিত হয়।

বিদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টা। আগেই বলেছি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ১৯০৫ সালে লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটি স্থাপন করে তার মুখপত্র স্বরূপ ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বিনায়ক দামোদর সাভারকর, হরদয়াল ও মদনলাল ধিঙ্গড়া একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী লণ্ডনে গড়ে তুলেছিলেন। ইংরেজ সরকার শ্যামজী কৃষ্ণবর্মাকে গ্রেপ্তার করবে এরকম সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় শ্যামজী প্যারিসে চলে যান—তখন লণ্ডনে ভারতীয় বিপ্লবীদের নেতা হন সাভারকর। তাঁর সহচর মদনলাল ধিঙ্গড়া লণ্ডনে ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করেন। ওয়াইলির কাজ ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করা—তাই এই শাস্তি। ধিঙ্গড়ার ফাঁসি হয়েছিল। সাভারকরও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ১৯১০ সালে।

তিলক। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ পেয়ে 'কেশরী' পত্রিকায় তিলক The Country's Misfortune নামে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। আদালতের বিচারে সেই প্রবন্ধ রাজদ্রোহমূলক বলে বিবেচিত হওয়ায় তাঁর ছয় বছরের জন্য

দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১৯০৮ সালের জুলাইয়ে তাঁকে মান্দালয়ে পাঠানো হয়েছিল। সুভাষ পরবর্তীকালে এই মান্দালয়েই প্রেরিত হবেন। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য সময়ে তিলক দেশে ছিলেন না।

বালক সুভাষ কৈশোরের পথে পা বাড়াবার মুখে য়ুরোপীয় স্কুল ত্যাগ করে ভারতীয় স্কুলে প্রবেশ করেছিলেন। বহিরঙ্গ জীবনের এই ঘটনাটি তাঁর অন্তর্জীবনের বিপুল পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। যে সময়ে সুভাষচন্দ্রের চেতনার বিকাশের একটা পর্ব শেষ হয়ে আর একটা পর্ব উন্মীলিত হয়ে যাচ্ছিল সেই সময়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবান্দোলনেরও একটা অধ্যায় সমাপ্তিতে এসে পৌঁছায় পরবর্তী অঙ্কের যবনিকা উন্মোচনের প্রতীক্ষা নিয়ে কাল তখন স্তব্ধ হয়ে আছে। ব্যক্তি ও জাতির চলার ছন্দ এইভাবে যখন মিলে যায় তখন ঐ ব্যক্তির জীবনের ইতিহাসেরই একটা প্রক্ষেপ [illegible] উভয়ের [illegible]। সে ব্যক্তির জীবনে তখন ঐশ্বরিক দীপ্তি এসে লাগে [illegible] জাতির অগ্রগতির স্বপ্ন ও [illegible] মহত্তম সম্ভাবনা নিয়ে সেই ব্যক্তি তখন দিব্য মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্রের জীবনে এই মাহেন্দ্র লগ্ন তার জন্মক্ষণেই স্থির হয়েছিল—তাই সেই সংকেতটিকে তিনি নিজে অনুভব করতে শুরু করেন। জীবনের আসন্ন পর্বে সেই অনুভূতির ক্রম অনুসরণ করে তিনি নিজেকে খুঁজে পাবার, আত্ম আবিষ্কারের দুরূহ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর আত্ম-আবিষ্কারের মধ্যে আমাদের জাতির আত্ম-আবিষ্কারের সূত্রটিও নিহিত ছিল। সুভাষ চরিত্র বোঝার পক্ষে তার জীবনের আসন্ন এই অধ্যায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তার চেতনা ও আত্মশক্তি বিকাশের পক্ষে সমস্ত অবরোধ যেন এর পর অপসারিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের পূর্ণাবয়ব মূর্তিখানি যেন কৈশোরের সেই দিনগুলির মধ্যে অকস্মাৎ ক্ষণতরে উদিত হয়েছিল অবশ্যই লোকদৃষ্টির আড়ালে। সে কাহিনী রোমাঞ্চকরও বটে।

আত্ম-আবিষ্কার

সুভাষ ভর্তি হলেন র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে। সরকারী স্কুল, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সবাই ছিল ভারতীয়। সেখানে সংস্কৃত ও বাংলা পড়ার ব্যবস্থা ছিল, দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি কোনো বিরুদ্ধ ভাব ছিলনা। সুভাষের হৃদয় তখন দেশের ভাবধারাকে আত্মসাৎ করে নেবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল, কাজেই এই নতুন স্কুলের পরিবেশটি তাঁকে দিল তৃপ্তি ও শান্তি—একটা পরিপূর্ণতার আনন্দ ও আত্মপ্রত্যয়।

আত্মপ্রত্যয়ের অভাবই ছিল এতদিন তাঁর জীবনের প্রধান সমস্যা। তাঁর জীবনের যে কোনো মূল্য আছে, কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, কোনো বিশেষ সার্থকতা আছে এ বোধ তাঁর ছিলনা। লেখাপড়ায় ভালো হলেও স্কুলে তিনি বিশিষ্ট একজন বলে স্বীকৃতি পাননি, কেননা মিশনারি স্কুলে ক্লাসে ফার্স্ট হওয়াকে ছাত্ররা বিশেষ দাম দিত না; ধনীদের ছেলেরাই সেখানে পড়ত, কাজেই পিতার বিত্ত ও প্রতিষ্ঠাও সুভাষচন্দ্রকে বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত করেনি; ভারতীয় বলে পারিবারিক মর্যাদারও কোনো মূল্য সহপাঠীদের কাছে ছিলনা। সুভাষের আসল ত্রুটি ছিল খেলা-ধূলার প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ অনীহা। খেলাধূলায় বিশিষ্ট হলে কিংবা ডানপিটে হলে মিশনারি স্কুলে ছাত্রদের সমীহার পাত্র হওয়া সম্ভব ছিল—কিন্তু সুভাষ ছিলেন শান্ত, মৃদু, লাজুক ও নিঃসঙ্গ। তাঁর চাপা প্রকৃতি ও সংযত, ধীর ব্যবহার ছাত্রমহলে তাঁকে নিস্তেজ ও কৌতূহলের অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করেছিল। কী বাড়িতে, কী স্কুলে কোথাও কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সুভাষ এতদিন সমর্থ হননি। কারও দৃষ্টির দর্পণেই তাঁর

অসাধারণত্বের লক্ষণ প্রতিফলিত হয়নি। আত্মপ্রত্যয়ের অনুভূতি থেকে সুভাষ তাঁর বাল্য বয়সে বঞ্চিতই ছিলেন।

র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে সুভাষ ভর্তি হয়েছিলেন ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে। তাঁর বয়স তখন বারো বছর পূর্ণ হয়ে গেল। এইবার কৈশোরের ঋতুপত্র তাঁর জীবনে অঙ্কুরিত হতে সুরু করল। সেই মুখেই এই নতুন স্কুলের পরিবেশ তাঁকে তাঁর স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত চরিত্র সম্পর্কে প্রথম সচেতন হবার সুযোগ এনে দিল।

কটকের বাঙালী বা ভারতীয় সমাজে জানকীনাথ বসুর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা ছিল। স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয় পক্ষেরই কাছে সুভাষ সেজন্য বিশেষ সমীহা লাভ করলেন। মিশনারি স্কুলে সাত বছর কাটানোর ফলে সুভাষ ইংরেজি শিখে এসেছিলেন চমৎকার। ইংরেজি বলতে ও লিখতে তিনি সমান দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। সেযুগে—এবং এখনও—ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা যে কোন ব্যক্তিকে আমাদের সমাজে অসাধারণ মর্যাদা এনে দেয়। ক্লাসের ছাত্রদের কাছে সুভাষ তো আসা মাত্রই একজন অতি বিশিষ্ট ছাত্র বলে স্বীকৃতি পেলেন। শুধু ইংরেজি ভাষায় পটুত্ব নয়, ছাত্ররা যখন তাঁর অসাধারণ মেধা ও নিষ্পাপ চরিত্রের পরিচয় পেল তখন সুভাষকে এককথায় তারা তাদের হীরো বা নেতার আসনে বসাল। লেখাপড়ায় যে ছাত্র ভালো এই স্কুলে তার মর্যাদা ছিল -কেননা সব ভারতীয় স্কুলেই খেলাধুলা অপেক্ষা লেখাপড়াকেই সেসময় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। শিক্ষকরা সুভাষের প্রথম পরিচয় পেতেই বুঝেছিলেন যে ক্লাসের পরীক্ষায় তিনি ফার্স্ট হবেন। প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফল বেরোতেই দেখা গেল যে তাঁদের ধারণাই সত্য হয়েছে। সুভাষ সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন—স্কুলের আরও নিচু শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে স্বভাবতই তিনি হয়ে উঠলেন শ্রদ্ধার পাত্র, উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের কাছেও অবহেলা-যোগ্য রইলেন না। বংশ, প্রতিভা ও চরিত্র সুভাষের ব্যক্তিত্বকে যে দীপ্তি দান করেছিল, স্কুলের শিক্ষক ও

ছাত্রদের সপ্রশংস দৃষ্টিতে তা প্রতিবিম্বিত হয়ে সুভাষকে এনে দিল আত্মপ্রত্যয়। নেতৃত্বের যে সংস্কার নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তা অনুকূল পরিবেশ লাভ করে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হতে লাগল। তিনি নিজেই লিখেছেন এই সময়কার কথা এইভাবে: "যে নতুন আবহাওয়ায় আমি বাস করতে ও বিচরণ করতে লাগলাম তা আমাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করল। মনে হল আমারও কিছু মূল্য আছে এবং আমি তুচ্ছ জীব নই। আমার মধ্যে যে ভাব জেগে উঠল তা গর্বের ভাব নয়, আত্মবিশ্বাসের ভাব। এর আগে পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসের অভাবই ছিল আমার প্রধান অভাব। আর আত্মবিশ্বাসই হল জীবনে সাফল্য লাভের মূল চাবিকাঠি।"

স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা নিজেদের বেশ খানিকটা বড় মনে করার সুযোগ পায়—নিচু ক্লাসের ছাত্রদের চোখে তারা হয়ে ওঠে সমীহার পাত্র। সুভাষের পক্ষে সেটা মজার অভিজ্ঞতা হলেও একটা দুঃখ তাকে স্কুলে যোগ দিয়েই নতুন করে পেতে হল। বাংলা তিনি জানতেন না। মাতৃভাষা বলে বলতে পারতেন স্বচ্ছন্দে, কিন্তু লিখতে পারতেন না শুদ্ধভাবে। বর্ণ-পরিচয় ঘটলেও, মিশনারি স্কুলে চর্চার অভাবে বাংলা বানান ও ব্যাকরণ দুইই তাঁর অনায়ত্ত ছিল। নতুন স্কুলে আসার আগে বাংলা বই কোনোদিনই তিনি পড়েননি। বর্ণ-পরিচয়ের বেশি আর তাঁর বাংলা জ্ঞান এগোয়নি। যেদিন ক্লাসে বাংলার শিক্ষক 'গরু' (কিংবা ঘোড়া) সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে ছাত্রদের আদেশ করলেন, সুভাষ সেটা লিখেছিলেন বটে কিন্তু শিক্ষক মহাশয় যখন তাঁর রচনা ছাত্রদের পড়ে শোনালেন তখন কী শিক্ষক কী ছাত্রগণ কেউই হাস্য সংবরণ করতে পারেনি। বানান প্রায় সবক'টি ভুল, কোনো বাক্যও সম্পূর্ণ নয়, শুদ্ধ তো নয়ই। শব্দ জ্ঞানেরও ছিল একান্ত অভাব। শিক্ষক মহাশয় রচনাটি পড়ে নিজে এত হেসেছিলেন যে ছাত্রদের মজার ভাগ না দিয়ে পারেননি। তিনি এক

একটা অংশ পড়েন আর তার সঙ্গে যোগ করে দেন নিজের হাস্যোদ্রেককারী মন্তব্য—ছাত্ররা হাসিতে ফেটে পড়ে;—সুভাষ নিজের অজ্ঞতার বহর দেখে নিজেই হতভম্ব, নীরব, মুখ লজ্জায় লাল। অধোবদন হয়ে একটা কথাই তিনি বারবার চিন্তা করতে লাগলেন যে লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও তাঁর ত্রুটি আছে এবং বাংলা না জানাটাও অপরাধ। যে ছাত্ররা তাঁকে দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত ছিল, এমনকি তাঁর নিকটবর্তী হতেও যাদের সাহসে কুলোত না তাদের সবার কাছে তাঁর নিদারুণ অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে পড়ায় ও সকলের সম্মিলিত হাস্যধ্বনি তাঁকে বিদ্রূপবিদ্ধ করায় সুভাষের সেইক্ষণে মনস্তাপের আর অবধি ছিল না। মনে হল তিনি ধূলোয় মিশিয়ে যাচ্ছেন। এরপর বেশ কিছুকাল যাবত বাংলা ক্লাশের নামে তাঁর জ্বর আসত। সন্ত জাগ্রত আত্মসচেতনতার ফলে অপমানটা ভারী হয়ে ঠেকেছিল, হজম করে ফেলাও ছিল শক্ত। তাই এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য বাংলা তিনি ভালো করে শেখার সঙ্কল্প নিলেন। নিজের ঘরে, গোপনে যত্নের সঙ্গে বাংলার চর্চা করার ফলে বার্ষিক পরীক্ষায় ক্লাসের মধ্যে বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর তিনিই পেয়েছিলেন। সকলেই এতে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

পি. ই. স্কুলে সাত বছর একাদিক্রমে পড়া সত্ত্বেও কোনো ছাত্রের সঙ্গেই সেখানে সুভাষের স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। র‍্যাভেনশ স্কুলে এসে সেই নিঃসঙ্গ একাকিত্বের পর্ব তার শেষ হল। সব ছাত্রদের সঙ্গে, স্কুলের সমগ্র পরিবেশের সঙ্গেই এখানে তিনি একাত্মতা অনুভব করেছিলেন—কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

সুভাষ র‍্যাভেন্স স্কুলে ভর্তি হবার তিন চারদিন আগে তাঁর ক্লাসেই ভর্তি হয়েছিল আর একটি ছেলে, চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস নিজে পরীক্ষা করে উঁচু ক্লাশগুলিতে নতুন ছাত্রদের ভর্তি হবার অনুমতি দিতেন। চারুচন্দ্রকে পরীক্ষা করে বেণীবাবু সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তার সুশ্রী চেহারা, অসাধারণ

বুদ্ধিমত্তা, এমনকি প্রতিভার ছাপ তার মুখাবয়বে দেখে বেণীবাবু মনে করেছিলেন, চারুই হবে ক্লাশের ফার্স্ট বয়। তিন চার দিন পর সুভাষ যখন এলেন, বেণীবাবু তাঁকেও পরীক্ষা করলেন। চারুবাবুর মুখে সেদিনের ঘটনার বর্ণনা শুনে তাঁর ভাই এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন: "১৯০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি। কটকের কাঠজুড়ি নদীর ধারে র্যাভেন্স কলেজিয়েট স্কুল। প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের ঘর থেকে স্কুলে ভর্তি হবার জন্য পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এল প্যাণ্ট-কোট পরা ফুটফুটে একটি ছেলে। একজন শিক্ষক ছেলেটিকে সঙ্গে করে ক্লাস সেভেনের কক্ষে নিয়ে এলেন। তারপর সেই ক্লাসের শিক্ষক মহাশয়কে তিনি বলে দিলেন—এই ছেলেটি আজ এই ক্লাসে ভর্তি হল।

ক্লাসের শিক্ষক মহাশয় ও ক্লাসশুদ্ধ ছেলে একবার নবাগত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, চেহারা বটে! যেমন টকটকে রং, তেমনি সুস্থ, সবল, লম্বা চেহারা। তার ভেতর থেকে যেন একটা তেজ ফুটে বেরুচ্ছে। তার চোখে একটা জ্যোতি। আর চেহারায় ফুটে উঠেছে একটা আভিজাত্যের ছাপ। তার পরণে প্যাণ্ট-কোট। বয়স বছর বারো।....শিক্ষক মশাই আর ক্লাসের ছেলেরা নূতন ছেলেটির সুন্দর চেহারা, ফুটফুটে ফর্সা রং, বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ আর তার ব্যক্তিত্ব দেখে নির্বাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শিক্ষক মশাই বুঝলেন, এতদিন পরে স্কুলে একটা ছেলে ভর্তি হল বটে!....নূতন ছেলেটি ভর্তি হবার পর বেণীবাবু চারুচন্দ্রকে বললেন,—ভেবেছিলাম তুমিই ফার্স্ট হবে। কিন্তু তোমার একজন কম্পিটিটর এসেছে, দেখেছ? চারুচন্দ্র বললেন, —হ্যাঁ স্যার, দেখেছি।" (সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়: সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, পৃঃ ১৬-১৯)

ভর্তি হবার সময় সুভাষের যেমন বাংলা জ্ঞানের অভাব ছিল, সংস্কৃত তিনি একেবারেই জানতেন না। সংস্কৃত হরফের সঙ্গেও তাঁর

পরিচয় ছিল না। বার্ষিক পরীক্ষায় সুভাষ অন্যান্য বিষয় ছাড়াও বাংলায় পেলেন সর্বোচ্চ নম্বর, আর সংস্কৃতে একশোর মধ্যে একশো। বেণীমাধববাবু প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি সুভাষকে একশোর মধ্যে একশো নম্বর দিলেন কেন। পণ্ডিত মশাই উত্তরে বলেছিলেন যে একশোর মধ্যে একশো দশ দেওয়া যায় না বলে বাধ্য হয়েই তিনি মাত্র একশো দিয়েছেন। পূর্বোক্ত সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রন্থমতে অবশ্য ঘটনাটি ঘটেছিল অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে ওঠার বার্ষিক পরীক্ষার সময়।

চারুচন্দ্র ছাড়া সুভাষের অন্তরঙ্গ আর একজন বন্ধু ছিলেন জগন্নাথ দাস চৌধুরী। তিনি বাঙালী নন, ওড়িয়া। চারুচন্দ্রের বাবা রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন র‍্যাভেনশ কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। জগন্নাথ দাসচৌধুরী ছিলেন কটকের ভৃঙ্গারপুরের জমিদারের ছেলে। চারুচন্দ্র পরবর্তী কালেও সুভাষের অন্তরঙ্গতা হারাননি। জগন্নাথ দাস ১৯২৪ সালে বার্লিন গিয়েছিলেন দর্শন পড়তে। আর ফেরেননি। ১৯৩৭ সালে একবার মাত্র কয়েক মাসের জন্য দেশে এসেছিলেন। বার্লিনে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করে দর্শন শাস্ত্রের চর্চায়ই তিনি সারাজীবন কাটিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে বোমার আঘাতে বার্লিনেই তিনি মারা যান। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য বহুজনের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন।

চারু, সুভাষ ও জগন্নাথ—এই তিন বন্ধু সবসময়ে একসঙ্গে বেড়াতেন বলে লোকে এঁদের ত্রিমূর্তি বলে ডাকত। তাঁরা একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন, একসঙ্গে চারুচন্দ্রের বাড়িতে বসে গল্প করতেন, একসঙ্গে বেড়াতেন। সুভাষ সে সময়ের কথা প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন: নতুন স্কুলে এসে অন্ততঃ কয়েকজনের সঙ্গে আমার স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

সুভাষ ও তাঁর বন্ধুরা খেলাধূলা বেশি পছন্দ করতেন না। তাঁরা ভালো ছাত্র ও ভালো ছেলে—দুইই ছিলেন। ড্রিল ছাড়া অন্যান্য

খেলাধূলার প্রতি সুভাষের আকর্ষণ ছিল না। তাছাড়া খেলাধূলায় যোগ দেবার পক্ষে তাঁর একটা অসুবিধাও ছিল। সাধারণত ছেলেরা স্কুলের ছুটি হলে বাড়ি চলে আসে, তারপর জলযোগ শেষ করে খেলার মাঠে যায়। সুভাষ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর আর বেরোতে পারতেন না। বাবা মা বাইরে খেলার মাঠে ছেলেদের যেতে বারণ করতেন। তাঁরা দুজনেই অবশ্য প্রতিদিন বিকালে গাড়ি করে নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন। সেই সুযোগে ছেলেরাও বাইরে যেত—খেলার মাঠে লুকিয়ে যাওয়া খুবই সহজ ছিল। বাবা মা জেনে ফেললে সামান্য বকতেন মাত্র। খেলার মাঠে যেতে তাঁরা ছেলেদের নিষেধ করতেন সম্ভবত দুটি কারণে,—এক, এতে লেখাপড়ার ক্ষতি হবে, দুই, খেলার মাঠের পরিবেশ, তথা বন্ধুদের সঙ্গ স্বাস্থ্যকর নয়। সুভাষ ইচ্ছা করলে বাবা মার দৃষ্টি এড়িয়ে মাঠে যেতে পারতেন, কিন্তু যাননি। সে সময় তাঁর পিতৃমাতৃভক্তি নিখাদ ছিল। তিনি পিতাঃ স্বর্গঃ, পিতাঃ ধর্মঃ কিংবা মাতৃভক্তির স্তব তখন মুখস্ত করতেন—বিশ্বাসও করতেন ঐ সব কথায় মনে প্রাণে। পিতামাতাকে তিনি দেখতেন প্রত্যক্ষ দেবতা রূপে।

সুভাষ তাই বিকালবেলা কাটাতেন তাঁদের বাড়ির বাগানে। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া ছিল এই তরিতরকারি ও ফলের বড় বাগানটি। তিনি এবং আর যারা বাড়ির বাইরে খেলতে যেতনা তারা, সবাই মিলে মালীর সহযোগে বাগানে জল দেওয়া, চারাগাছের গোড়া নিড়ানো, কেয়ারি সাজানো, মাটি চষা ইত্যাদি কাজ করতেন। বাগানের কাজে সুভাষ মেতে যেতেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের দ্বার এরই মাঝ দিয়ে তাঁর কাছে খুলে গেল। জীবনের এই পর্বে সুভাষের হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিতন্ত্রীগুলি ক্রমেই বেজে উঠতে লাগল একে একে। নিজেব গহ্বে তিনি প্রবেশ করতে লাগলেন। কিশোর সুভাষের পক্ষে সে ছিল এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

বাগান-করা ছাড়াও বাড়িতে ব্যায়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা ছিল ;

সুভাষ নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। তাঁর শরীর তাই সুঠাম রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে পেরেছিল।

প্রাদেশিকতার বিষবাষ্প থেকে তাঁর পারিবারিক ও স্কুলের জীবন ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে বাঙালী ও ওড়িয়া দুই-ই ছিলেন; ছাত্রদের মধ্যেও দুই প্রদেশের ছেলেরাই ছিল। কোনো অপ্রীতিকর বা অসদ্ভাবের ঘটনা সেজন্য ঘটেনি। প্রাদেশিক মনোভাব তখন জাগেনি, নবোদিত জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় সকলেই নিজেকে সে সময় এক ভারত মাতার সন্তান বলে মনে করত। জানকীনাথ বসুর বহু বিশিষ্ট ওড়িয়া পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, ওড়িশার জনসাধারণের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। আগেই বলেছি, স্কুল স্থাপন প্রভৃতি জনসেবামূলক কাজে এবং দরিদ্রসেবার মতো নিত্য কর্মে জানকীনাথের ক্লান্তি ছিল না; তিনি আন্তরিক ভাবেই ওড়িশার জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করতেন ও তাঁর সাধ্যমতো গঠনমূলক কাজে সহায়তা করতেন। ওড়িয়ারাও তাঁকে সেজন্য ভালোবাসত। জানকীনাথেব মুখে কোনোদিন ওড়িয়া বা ভারতের অপর কোনো প্রদেশবাসীদেব সম্পর্কে কটাক্ষপূর্ণ বা শ্লেষাত্মক কোনো মন্তব্য শোনা যায়নি,—সবাইকে তিনি ভারতবাসী বলে সমান মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি ছিলেন গম্ভীর ও রাশভারি মানুষ; কোনো উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য তাঁর মুখে জোগাত না। তবু যাঁরা তাঁর কাছে আসতেন তাঁরা অনুভব করতে পারতেন তাঁর আন্তরিকতা ও হৃদয়ের ব্যাপ্তি। তাঁকে সবাই যেমন সমীহ করত, তেমনি ভালোবাসত। কটকের বসু পরিবারে প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট মনোভাব তাই স্থান পায়নি। সুভাষ যে তাঁর জীবনে উদার ভারতীয়তাবাদের আদর্শ লাভ করেছিলেন, প্রাদেশিকতার মোহ তাঁকে পায়নি, সেজন্য তিনি তাঁর বাবার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা পোষণ করতেন। বাবাই ছিলেন তাঁর সকল ভারতবাসীর প্রতি সমভাবাপন্নতার পথ-প্রদর্শক।

এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেখা দিয়েছিল আদর্শের অনুসন্ধান। একটা আদর্শকে সচেতন ভাবে বরণ করে জীবনকে তারই ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রয়াস অস্ফুটভাবে ইতিপূর্বেও তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল ;—যখন খেলার মাঠ ও সহপাঠীদের সঙ্গ বর্জন করে ঘরে বসে তিনি সংস্কৃত নীতিবাক্য মুখস্ত করতেন, পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম ইত্যাদি নীতিবাক্য পালন করার চেষ্টায় প্রলোভন দমন করেও পিতৃ আজ্ঞা অনুসরণ করতেন—তখনই তিনি যে একটা আদর্শ বা নীতির আশ্রয় নিয়ে চলার পক্ষে অনুকূল সংস্কার নিয়ে জন্মেছেন তা বোঝা গিয়েছিল। র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের উপযুক্ত পরিবেশে ও বিশেষত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের জীবনাদর্শের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসাব ফলে সুভাষের অন্তরের সুপ্ত সংস্কার অঙ্কুরিত ও বিকশিত হতে সুরু করে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের প্রথম আদর্শ পুরুষ তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। তাঁর নাম ছিল বেণীমাধব দাস। জীবনের সমুচ্চ আদর্শ স্থির করে তাকেই লক্ষ্য রেখে বেণীমাধব অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই আদর্শের প্রতিবিম্বনে তাঁর জীবনও দ্যুতিময় হয়েছিল। তাঁর মুখের কথা বা উপদেশ শোনার প্রয়োজন ছিল না, তাঁর সান্নিধ্যই অন্যকে উজ্জীবিত করে তুলত। একদিন তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন স্কুলের সব ক্লাস ঠিকমতো চলছে কিনা, সুভাষ ক্লাসে বসে দেখলেন তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠ রূপ। দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। একটা দুর্বার আকর্ষণ তিনি অনুভব করলেন তাঁর ব্যক্তিত্বের বাঙ্ময় নৈতিক আবেদনের প্রতি। যেন একটা জীবন্ত আদর্শের প্রতিরূপ স্কুলের বারান্দা দিয়ে হেঁটে ফিরছিল। কোনো ব্যক্তির প্রতি উদ্বেলিত শ্রদ্ধা সুভাষ ইতিপূর্বে কখনো অনুভব করেননি, জানতেন না যে ওরকম কোনো জিনিস আছে। কিন্তু বেণীমাধব দাসকে দেখে তাঁর অন্তর আপনি নম্র নত হয়ে এল, যেন এই মানুষটিকে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করা যায়। কেন হৃদয়ের স্বতঃস্ফূরিত শ্রদ্ধা এইভাবে জেগে উঠেছিল

সুভাষ সেদিন তা বুঝতে পারেননি ; সেই বিশ্লেষণী শক্তি বারো বছর বয়সের ছাত্রের থাকা সম্ভব নয়। বেণীমাধবের ব্যক্তিত্ব সুভাষচন্দ্রের মনের অবচেতন স্তরে সাড়া তুলেছিল, কিংবা বলা যায়, তাঁর পূর্ব সংস্কার হঠাৎ যেন নাড়া খেয়ে জেগে উঠেছিল। মনের সচেতন স্তরে তিনি এইটুকু মাত্র বুঝেছিলেন যে বেণীমাধব অন্যান্য শিক্ষকদের মতো নন ; তিনি তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র ; সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনি উর্ধ্বলোকে বিচরণ করেন। সুভাষ নিজের অন্তরের নিভৃতে ভাবলেন, যদি জীবনে আদর্শের পথ অনুসরণ করতে হয় তবে বেণীমাধবকে অনুসরণ করলেই তিনি সফলকাম হতে পারবেন।

এর আগে সুভাষ তাঁর নিজ জীবনের আদর্শ নির্ণয় করতে পারেননি। কোন লক্ষ্যকেই তিনি নির্দিষ্টভাবে বরণ করেননি। ভবিষ্যতে কী হতে চান, গভীরভাবে এ প্রশ্নের মুখোমুখি তিনি হননি ; সামান্যভাবে জিজ্ঞাসিত হলে অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট উত্তর ছাড়া আর কিছু দেবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। পি. ই. স্কুলে থাকা কালে, তাঁর বয়স যখন দশ,—একদিন ক্লাশের একজন শিক্ষক ছাত্রদের একটি রচনা লিখতে বলেছিলেন, যার বিষয়বস্তু হবে ছাত্ররা উত্তরজীবনে কে কী হতে চায়। সুভাষ তাঁর রচনায় অনেক কিছু একসঙ্গে হবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন—জজ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার, কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট। রচনাটি পড়ে শিক্ষক মহাশয় হেসে ফেলেছিলেন,—একসঙ্গে কি সব হওয়া যায়, না একবার কমিশনার হবার পর পদাবনত হয়ে কেউ ম্যাজিস্ট্রেট হয়? এই অস্পষ্ট, ভ্রান্ত ও মিশ্র চিন্তাধারার কারণ, সুভাষ বাড়িতে তাঁর বড় দাদাদের মুখে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশা ও পদের ভালো-মন্দ ব্যাখ্যা শুনতেন ; সবটা বুঝতেন না। কিন্তু কথাগুলি বিক্ষিপ্ত ও টুকরো টুকরো ভাবে কানে লেগে থাকত। তাঁর বাড়ির পারিবারিক আবহাওয়াতে সরকারী বড় চাকুরে হবার উচ্চাশাই প্রশ্রয় পেত। তাঁর মায়ের সম্পর্কিত ভাই স্যার বি. সি.

মিত্র ছিলেন বাংলার অ্যাডভোকেট জেনারেল। তিনি একবার কটকে ভগ্নীপতি গৃহে এসেছিলেন। তাঁর মর্যাদার বহর দেখে বালক সুভাষেরও বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে পদমর্যাদা ও সম্মানে তাঁর বাবার চেয়েও মামার আসন উঁচুতে। পদমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হবার প্রতিই ছিল বাড়ির আর সবার ঝোঁক—শিক্ষিত বাঙালী উচ্চবিত্ত পরিবারে সাধারণত এইটিই ছিল নিয়ম। কটকের বসু পরিবারে আই. সি. এস হওয়াই উচ্চাশার চরম সীমা নির্ধারিত ছিল। বাংলার শিক্ষিত সমাজেই তখন আই. সি. এস হওয়া ও হাতে স্বর্গ পাওয়া ছিল সমার্থক। কিন্তু এই সব চিন্তা ও উচ্চাশা সুভাষকে আন্দোলিত করতে পারেনি, তাঁর মন সাড়া দেয়নি এসব মন্ত্রণার প্রতি। তাঁর মন অন্য কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল—এবং সেই কথাটি যে কী তার প্রথম আভাস দিয়েছিলেন বেণীমাধব।

বেণীমাধব বাবু নিচু ক্লাসে পড়াতেন না, মাত্র নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতেন। কাজেই তাঁর কাছে পাঠ নেবার জন্য সুভাষ ব্যাকুল হলেও দুবছর সেজন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু নবম শ্রেণীতে উঠেও বেণীমাধব বাবুর কাছে সুভাষ বেশীদিন পড়ার সুযোগ পাননি। কিছুদিনের মধ্যেই সরকারী নির্দেশে বেণীমাধব বাবুকে কটক থেকে বদলি হয়ে চলে আসতে হয়েছিল কৃষ্ণনগরে। চারু বাবুর মতে এই বদলির পিছনে একটি রাজনৈতিক কারণও ছিল—এবং সেই কারণের জন্য সুভাষচন্দ্রই দায়ী। ব্যাপারটি ঘটেছিল এইরকম।

বেণীমাধব বাবুকে সুভাষ আদর্শের প্রতিমূর্তি বলে জ্ঞান করার পর কতগুলি বিষয়ে তাঁর মনে নতুন চিন্তা দেখা দেয়। বিলিতী ভাবের বদলে দেশী ভাবকে তিনি বেশি মূল্য দিতে সুরু করেন। স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রের পরা ধুতি জামা, আর তাঁর মতো দু-চার জন ছাত্র মাত্র কোট প্যাণ্ট পরে সাহেব বালক সেজে স্কুলে আসে—সুভাষের এটা বড় বেমানান লেগেছিল। ইংরেজের

অনুকরণ করাকে তিনি অপছন্দ করতে সুরু করেন। হঠাৎই একদিন তিনি পোশাক বদল করে ফেললেন, ক্লাসে আবির্ভূত হলেন ধুতি জামা পরে। বেণীবাবু সুভাষের পোশাক বদলের ব্যাপারটি লক্ষ্য করে খুশি হয়েছিলেন,—এই বালকটির প্রতি তাঁর হৃদয়ে যে স্নেহ সঞ্চিত হচ্ছিল তা বেড়ে গেল। বাড়িতে বাবা জানকীনাথও পুত্রের বেশ-পরিবর্তন লক্ষ্য করে একদিন তাঁকে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন এই পরিবর্তনের কারণ কী। সুভাষ পিতার চিরগম্ভীর মূর্তিকে শ্রদ্ধা ও ভয় দুই-ই করতেন। তবু বুকে সাহস এনে নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন—এই আমাদের নিজেদের পোশাক। সব ছেলেই তো এই পোশাক পরে স্কুলে যায়, আমিই বা কেন সাহেবী পোশাক পরে যাব।

জানকীনাথ বালক পুত্রের ব্যক্তিত্বকে ও তার সিদ্ধান্তের নৈতিকতাকে অস্বীকার বা অবহেলা করতে পারেন নি। তিনি নীরবে পুত্রের যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যের সেই শুরু। এরপর চিরদিনই পুত্রের সিদ্ধান্তই পিতাকে মানতে হয়েছে, বাধা দিয়েও কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই সময় আরও একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১১ সালের ১১ই আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিবসটি বিশেষভাবে স্মরণ ও উদযাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি ছাত্রদের কাছে। তাঁর প্রস্তাবে সবাই সম্মত হয়েছিল। র‍্যাভেন্স কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের হোস্টেলের আবাসিক ছাত্ররা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সেদিন উপবাস ব্রত পালন করলেন। হোস্টেলে উনুন সেদিন জ্বলেনি। স্বদেশী গান ও শহীদদের বীরত্বগাথা স্মরণের মধ্য দিয়ে, দেশপ্রেমের পবিত্র মন্ত্র প্রাণে অনুভব করার অনুষ্ঠানের আয়োজন দিয়ে শহীদ ক্ষুদিরামের পুণ্য স্মৃতিদিবস পালন করেছিল ছাত্ররা। সুভাষের নেতৃত্বরূপের অঙ্কুর সেই প্রথম দেখা গেল।

বেণীমাধব নীরবে, প্রসন্ন হাসিতে ছাত্রদের এই শুভকর্মের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। সুভাষের প্রতি তাঁর আকর্ষণের মাত্রা এই ঘটনায় আরও বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কলেজের একজন অধ্যাপক ছাত্রদের এই স্বদেশব্রতে বিরক্ত বোধ করেছিলেন। তিনি কটকের ডিভিশনাল কমিশনারকে ঘটনাটি সম্পর্কে বিবরণ দেন। কমিশনার ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনুসন্ধানে ম্যাজিস্ট্রেট বুঝলেন যে ছাত্রদের ক্ষুদিরাম-দিবস পালনের জন্য বেণীমাধব বাবু তাদের ভর্ৎসনা করা দূরে থাকুক, উৎসাহ ও প্রেরণাই জুগিয়েছেন। অচিরেই তাই সরকারী নির্দেশ এল যে বেণীবাবুকে বদলি হয়ে কৃষ্ণনগর যেতে হবে।

যাবার দিনটি যত এগিয়ে এল সুভাষের হৃদয় ততই বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বেণীমাধব বাবুর পদপ্রান্তে বসেই সুভাষ এই কথা প্রথম শিখেছিলেন যে জীবনে নৈতিক মূল্যবোধই আর সব কিছুর চেয়ে দামী: নীতির স্থান আর সবের উর্ধ্বে। বইয়ে পড়া কবিতা ঃ

পদ মর্যাদা—মোহরের ছাপ আঁকা তো শুধু,
আসল সোনা সে আর কেউ নয়, মানুষ নিজে।

এ যে বাস্তব জীবনেও সত্য তা বেণীমাধবের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা থেকেই সুভাষ বুঝেছিলেন। পারিবারিক পরিবেশে তিনি যেসব চিন্তা ও জীবনোদ্দেশ্যের পরিচয় পেয়েছিলেন তাতে তিনি তৃপ্ত হননি। বেণীমাধবই তাঁকে প্রথম ভিন্ন কথা শুনিয়েছিলেন, ভিন্ন একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে তাঁর উন্মুখ হৃদয়ের দ্বারে দূর বিসারিত স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলেন। সুভাষের তখন বয়ঃসন্ধির সময়। যৌন-চেতনার বিকাশ ঘটছে। বাসনার শতদল হৃদয়বৃন্তে পাপড়ি মেলছে। একটা ধ্রুব আদর্শকে আঁকড়ে না ধরলে জীবনের শক্তি ও উদ্দেশ্যবোধ এই সময়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে—গঠমান চরিত্র

তখন আক্রান্ত হয় নানা দুর্বলতা ও মোহ দ্বারা। সুভাষের মতো বালক-কিশোরের পক্ষে এই সময়টা দুর্যোগপূর্ণ, মহতী বিনষ্টির সম্ভাবনায় আবিল ;—এই সময়ে জীবনে বেণীমাধবের মতো মানুষের আবির্ভাব ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো সুভাষকে ধন্য করেছিল।

তাই বেণীমাধবের বিদায় সুভাষকে ব্যথাতুর করে তুলেছিল। বেণীবাবু ক্লাসে ঢুকে তাঁর বদলির নির্দেশের কথা জানিয়ে ছাত্রদের কাছে বিদায় চেয়েছিলেন। খবরটা আগেই সবার জানা ছিল, তাই ঘটনার আকস্মিকতা কাউকে বিমূঢ় করেনি। কিন্তু বিদায় নিতে এসে বেণীবাবু আবেগে রুদ্ধকণ্ঠ হয়েছিলেন। ছাত্রদেরও চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

বেণীবাবু ছাত্রদের সম্বোধন করে বলতে সুরু করলেন: "ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন"....এর পরের কথাগুলি শোনার মতো মানসিক অবস্থা সুভাষের ছিল না। সেই সংযত, ধীর, চাপা, গম্ভীর কিশোরের দুটি আয়ত চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠতে লাগল কান্না; কিন্তু ক্লাসভর্তি ছাত্রের দৃষ্টি তাঁকে লজ্জা দিল। সুভাষ চোখ মুছে সংযত করে নিলেন নিজেকে। তারপর স্কুলের সমস্ত ক্লাস ছুটি দিয়ে দেওয়া হল। ছাত্রেরা একে একে চলে গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ঘরের কাছ দিয়ে যাবার সময় সুভাষ দেখলেন বেণীমাধব বাবু একা দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়। ছাত্রদের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে নীরব বেদনায় উদাস মনে তিনি কী হয়তো ভাবছিলেন। সুভাষের চোখে তাঁর চোখ পড়ল। দুজনেরই আবেগ আর বাধা মানল না। সুভাষ অঝোরে কাঁদতে সুরু করলেন। শোক কিংবা বিচ্ছেদ-বেদনার অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে সেই প্রথম। বিচলিত ভাবের পর নিস্পন্দ, জড়বৎ, স্থাণু হয়ে গেলেন তিনি। বেণীমাধববাবু সমস্ত দৃশ্যটি দেখলেন। সুভাষের কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহে তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন: "সুভাষ, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

পরদিন স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্ররা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে একটি প্রকাশ্য সভার আয়োজন করেছিলেন। সুভাষ ছিলেন সেই সভায় একজন বক্তা। বক্তৃতা দেবার অভিজ্ঞতা হয়েতো সেই তাঁর প্রথম নয়, কারণ ক্ষুদিরামের মৃত্যু বার্ষিকী পালন উপলক্ষে কিংবা তার আগেও হয়তো ছাত্রদের কাছে তিনি বক্তৃতা করেছেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিনের বক্তৃতা দেবার অভিজ্ঞতাটি ছিল ভিন্ন প্রকারের। অন্তরে কান্না তাঁকে মথিত করছে, বাইরে শান্ত ও স্বাভাবিক ভাব বজায় রেখে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের গুণকীর্তন করে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে—ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত তিনি কী ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন, সুভাষের নিজের কাছেই তা রহস্যময়। উপস্থিত ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই বেণীবাবুর বিদায়কে একটা শোকাবহ ঘটনা বলে মনে করেননি। এ ঘটনার বিশেষ কোনো গুরুত্বও তাঁদের কাছে ছিল না। তাঁদের এই নিরাসক্তি সুভাষকে অবাক করেছিল। সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে বেণীমাধব বাবু ভাষণ দিতে উঠে যে কয়েকটি কথা বলেছিলেন সুভাষ তার সব শোনেন নি। প্রথম দু-একটি কথাই তাঁর অন্তরকে বিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বেণীবাবু বলছিলেন যে প্রথমে যখন তিনি কটকে আসেন তখন তিনি ভাবতেই পারেননি যে কটকে তিনি এত স্নেহপ্রীতি লাভ করবেন। বলতে বলতে তাঁর গম্ভীর আনন আবেগদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে সেই মুখখানি সুভাষের জ্যোতির্ময় বলে মনে হয়েছিল, তাঁর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে সেদিন তিনি অসাধারণ পুরুষ রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

বেণীমাধববাবুর বিদায় সম্পর্কিত আরও কয়েকটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সুভাষচন্দ্রের আত্মচরিতে এই ঘটনাগুলির উল্লেখ না থাকায় এগুলির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, বিশেষত অন্য সাক্ষ্য প্রমাণও যখন

অনুপস্থিত। তবে সুবোধবাবুকে ঘটনাগুলি বলেছেন সুভাষচন্দ্রের স্কুলজীবনের অন্তরঙ্গতম বন্ধু চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। চারুবাবুর প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা, উভয়ের কথা বিচার করলে, তাঁর কথাকে অমূলক বলে মেনে নেওয়া কঠিন হয়। এজন্যই এই ঘটনাগুলি সত্য বলে ধরে নেওয়া চলে। তবু আমাদের কাছে প্রমাণ না থাকায় আমরা এই ঘটনাগুলি সরাসরি সুবোধবাবুর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—সত্যতা প্রমাণের দায়িত্ব তাঁর বলেই : "কটক স্টেশনে সেদিন বাঙালী ছাত্ররা বেণীবাবুকে বিদায় দেবার জন্য দলে দলে উপস্থিত হল। সুভাষচন্দ্র বেণীবাবুর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিলেন। বেণীবাবুও সুভাষচন্দ্রকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন,—সুভাষ, তুমি যেন একজন মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে পার, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

বেণীবাবুর পায়ের ধূলো নেবার জন্য ছেলেদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়ে গেল। বেণীবাবুও প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে ট্রেণ চলতে শুরু করল। বেণীবাবু ট্রেণের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেরা সকলে হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার জানাল।

দেখা গেল বেণীবাবুর চোখে জলের ধারা বইছে। আর সুভাষচন্দ্রের চোখ দিয়ে ছিন্নসূত্র মুক্তমালার মত একটি একটি করে মুক্তা যেন ঝরে পড়ছে।

অনেকের চোখই সেদিন শুষ্ক ছিলনা।

বেণীবাবুকে অন্যায় করে কটক থেকে বদলী করে দেবার জন্য সুভাষচন্দ্র স্কুলে এক বিরাট ঝড় তুললেন। তিনি এর প্রতিবাদ জানালেন। বেণীবাবুর বড় ফটো কলেজ হলে টাঙান হল। সেখানে দেওয়ালের গায় শ্বেত পাথরের এক টেবলেটে বেণীবাবুর গুণাবলী লিখে রাখা হল।

আজও স্কুলের হলে সেই প্রস্তর-ফলক কিশোর সুভাষচন্দ্রের গুরুভক্তির নিদর্শন হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই লেখার মধ্যে বেণীবাবুর প্রতি সুভাষচন্দ্রের স্নেহ ভালবাসা আজও মূর্ত হয়ে ফুটে আছে। সেটি সুভাষচন্দ্রেরই রচনা। সেই রচনার ভেতর দিয়ে সুভাষচন্দ্র যেন তাঁর গুরুর চরণে তাঁর ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

বেণীবাবুর বদলীতে ছেলেদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। ছেলেদের মধ্যে ধর্মঘটের চেষ্টা হতে লাগল। সেটা দমন করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এই স্কুলে নারায়ণপ্রসাদ মহান্তি নামে একজন উড়িয়া প্রধান শিক্ষক দিলেন। এই স্কুলে এর পূর্বে কখনও উড়িয়া প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হননি। সুতরাং উড়িয়া ছাত্ররা এই প্রথম একজন উড়িয়া প্রধান শিক্ষক পেয়ে খুব খুশি হল। ফলে বাঙালী ছাত্ররা যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল উড়িয়া ছাত্ররা তাতে যোগ দিল না। সুতরাং সুভাষের নেতৃত্বে বাঙালী ছাত্রদের ধর্মঘট সফল হল না। বাঙালী ও উড়িয়া ছেলেদের মধ্যে এইরকম একটা বিভেদের সৃষ্টি করে স্কুলে ধর্মঘট বন্ধ করা হল। গভর্ণমেণ্টের divide and rule নীতি সফল হল।

তখন গভর্ণমেণ্ট সুভাষচন্দ্রকে এই স্কুল থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সহযোগী চারুচন্দ্রকেও।

মাত্র ষোল বৎসর বয়সে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এই ধর্মঘটের চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। আর সেই বয়সেই তাঁর ওপর গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল।

একদিন স্কুলে ছাত্রদের এক বিতর্ক সভা হচ্ছে। তর্কের বিষয় —"ইতিহাস পাঠের উপকারিতা।" এ বিষয়ে কিছু বলতে উঠে চারুচন্দ্র বললেন—ইংরেজের ইতিহাস পড়ে দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানা যায় না। দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে দুই চিত্রের সঙ্গেই পরিচয় থাকা প্রয়োজন। যেমন এন. এন. ঘোষের "ইংল্যাণ্ডস ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া" পড়তে হবে, সেই সঙ্গে পড়তে হবে সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা।"

নিষিদ্ধ পুস্তক "দেশের কথা" পড়বার প্রস্তাব করাতে হেডমাষ্টার চারুচন্দ্রের উপর অসন্তুষ্ট হলেন। গভর্ণমেণ্টের কাছে চারুচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের নামে রিপোর্ট গেল। দুজনকে অন্তরীণ করবার চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে "দেশের কথা" পড়বার একটা গোপন আগ্রহ জেগে উঠল।

বাঙ্গালী ছেলে স্কুলের সব ক্লাসেই অল্পবিস্তর ছিল। তারাই ছিল স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে। সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন, সব বাঙালী ছেলেই এই স্কুল থেকে ট্রান্সফার নেবেন। তখন গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হয়ে বাঙালী ছেলেদের বিরুদ্ধে আর কিছু করতে সাহস করল না। কিশোর সুভাষচন্দ্রকে গভর্ণমেণ্ট সেই সময়েই চিনতে পেরেছিল কি ধাতু দিয়ে এই বালক গঠিত। আর এই অঙ্কুর একদিন যে বিরাট মহীরুহে পরিণত হবে তার সম্ভাবনাও সেই দিনই জানা গিয়েছিল।" (সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, পৃঃ ১৫-২৮)

ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল কিনা আমরা জানিনা, এবং এ সম্পর্কে কিছুটা সংশয়ও থেকে যায়। কারণ সুভাষ সেসময়ে ছিলেন লাজুক, অন্তর্মুখিন, জীবনের আদর্শ সন্ধানে ব্যাকুল কিশোর —ধর্মঘট প্রভৃতির জন্য ব্যস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে কতটা সম্ভব ছিল সন্দেহ হয়। বিশেষত এত বড় ঘটনার কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত তিনি তাঁর আত্মচরিতে দেননি—সেটা অস্বাভাবিক মনে হয়। তাই এই ঘটনাগুলির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।

বেণীবাবুর বিদায়ে সুভাষের জীবনের আলো যেন নিভে গিয়েছিল। স্কুলের পরিবেশ তাঁর আর ভালো লাগত না, কোন শিক্ষকই তাঁকে প্রেরণা দিতে পারেননি, পড়াশোনাও মনে হত একঘেয়ে; একজন মানুষের অনুপস্থিতি তাঁর গোটা স্কুলজীবনকেই বিস্বাদে ভরে দিয়েছিল। কিন্তু স্কুলে যাওয়া বন্ধ করার উপায় ছিল না, পাঠও তৈরী করতে হত, পরীক্ষায় বসতেও হত। জীবনের একটানা প্রবাহ বয়ে চলে যায় কারও সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার

অপেক্ষা না রেখে। সুভাষের ভাষায়: The wheel of life grinds on regardless of our joys and sorrows—কথাটা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বিদায় প্রসঙ্গেই লেখা।

বেণীমাধববাবু চলে গেলেও সুভাষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান উভয়ের মধ্যেই চলতে লাগল। বেণীবাবু তাঁর পত্রের মারফৎ সুভাষের সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষে সহায়তা করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতি পূজারী—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপভোগে বিভোর। তাঁর কাছে দীক্ষা ও প্রেরণা নিয়ে সুভাষ তাঁর বিষাদক্লিষ্ট দিনগুলিকে প্রকৃতি-উপাসনায় ভরিয়ে তুলেছিলেন। একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য সমন্বিত স্থান খুঁজে নিয়ে প্রতিদিন বিকালে তিনি নির্জনে একাকী বসতেন। নদীর তীরে, পাহাড়ের উঁচুতে বা কোনো নির্জন প্রান্তরে অস্তগামী সূর্যের রক্তাভ আলোয় তিনি প্রকৃতির ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতেন। প্রকৃতি তার সৌন্দর্যরহস্য সুভাষের সমাহিত চিত্তের কাছে উন্মোচিত করেছিল। সুভাষ সংগ্রামবাদী হবার আগে সৌন্দর্যবাদী হয়েছিলেন—অনেকেরই কাছে এ তথ্য অজানা। তাঁর প্রকৃতি ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাই অনেকেরই ভুল ধারণা আছে।

বেণীবাবু উপদেশ দিয়েছিলেন: "প্রকৃতির কাছে নিজেকে সঁপে দাও। প্রকৃতির নিত্য পরিবর্তিত রূপের মধ্য দিয়ে তার ভাষা শুনে নাও।" প্রকৃতির ধ্যানে তিনি নিজে পেয়েছিলেন মানসিক শান্তি, আনন্দ ও মনোবল। নির্জন বাগানে ফুল, সবুজ কিশলয়, গাছ—এসবের মাঝে সুভাষ একাকী বা দুএকজন বন্ধুসহ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শহরের সাজানো বাগান ছেড়ে তিনি চলে যেতেন শহরের বাইরে পল্লীর প্রাকৃতিক পরিবেশে। প্রকৃতির অবহেলিত ও গোপন সৌন্দর্য তিনি উপলব্ধি করতে শিখলেন। প্রকৃতির গূঢ়

রহস্যময় ভাষা তিনি হৃদয়ের মাঝে শুনলেন। "তখন বুঝলাম কবি কেন বলেছেন :

ছোট্ট মেঠো ফুলটি নদীর তটে
তার কাছে তা হলদে ফুলই বটে,
তবু যেন একটু কিছু আরো।" —সুভাষ লিখেছেন

সে সময়কার প্রথা প্রসঙ্গে।

প্রকৃতির আহ্বান তাঁকে কাব্যের রসোপলব্ধিতেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। ওয়ার্ডস্বার্থ প্রকৃতির কবি বলে বন্দিত; সুভাষ তাঁর কাব্যের ভক্ত হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের আনুকূল্যে সংস্কৃত ভাষাও তাঁর মোটামুটি আয়ত্ত হয়েছিল,—রামায়ণ, মহাভারত বা কালিদাসের কাব্যে বিশেষ করে প্রকৃতি বর্ণনার অংশগুলি মূল সংস্কৃতে পড়ে সুভাষ আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন। প্রথম কৈশোরে সুভাষের চিত্ত সৌন্দর্যরসে দ্রবীভূত ও আপ্লুত হয়েছিল—প্রকৃতি ও কাব্য হয়েছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁর সেই সৌন্দর্য পিপাসু মন কি ভবিষ্যতের রাজনীতির আবর্তের মাঝে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল? অনেকেরই অভিমত কতকটা সেইরকম। কিন্তু উত্তরজীবনে এই সৌন্দর্যবোধ ছিল তাঁর সমস্ত আচরণ, পদক্ষেপ ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ওতপ্রোত—কুৎসিতের প্রকাশ তাঁর হাসিতে, ভাষণে, অন্তরঙ্গ আলাপে, রাজনৈতিক কর্মে বা এমনকি স্বগত চিন্তায়ও ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। সৌন্দর্য উচ্ছ্রিত হত তাঁর চলার ছন্দে, তাঁর কর্মের বিন্যাসে, তাঁর ভাষাপ্রয়োগে। অতিশয় প্রতিকূল পরিস্থিতি, সঙ্কট ও দুর্যোগের মধ্যেও তাঁর আচরণে পরিমিতি ও সৌন্দর্যের অভাব কখনো ঘটেনি। সুভাষের শৈব চেতনাই অসুন্দরের উপাসনা থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে;—তাঁর সমকালীন সঙ্গী বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল এইখানে।

বেণীবাবুর কথাতেই আবার ফিরে আসা যাক। এই গুরুর কাছে সুভাষ তাঁর ঋণ কোনোদিন ভুলতে পারেননি। আত্মজীবনীর

পৃষ্ঠায় গুরুর প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন গুরুর কাছেও তা পরম সন্তোষের কারণ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্ক কোনোদিন ছিন্ন হয়নি। দেশনায়ক হবার পরও সুভাষ বারবার বেণীমাধববাবুর বাড়ি এসেছেন, তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাই-বোনের মতো ব্যবহার করেছেন, অন্নগ্রহণ করেছেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে। বেণীবাবুও তাঁর শিষ্যের গর্বে ছিলেন আজীবন আত্মহারা। গুরু-শিষ্যের সেই নিবিড় সম্পর্কের বর্ণনা দিয়েছেন বেণীমাধববাবুর পুত্র বিমলচন্দ্র দাস তাঁর "স্মৃতি তীর্থের ঘাটে ঘাটে" গ্রন্থে ও কন্যা বীণা ভৌমিক "স্মৃতিতীর্থ" গ্রন্থে। বীণা সেই ছোট বেলার দিনগুলি প্রসঙ্গে লিখেছেন: "মার চিঠির বাক্সে সেই বালক সুভাষের কয়েকখানি কাঁচা হাতের লেখা চিঠি পেয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়তাম।"

কিন্তু শুধু প্রকৃতি ও কাব্যের সৌন্দর্য ও বস উপভোগেই সুভাষের দিন কাটলনা। তাঁর অন্তরে দেখা দিল গভীরতর জিজ্ঞাসা; জীবনের মৌল উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ভাবিত হলেন। একজন সদ্য কিশোরের পক্ষে জীবন ও জগতের রহস্য ভেদ কবা সম্ভব ছিলনা, তাঁর জিজ্ঞাসাগুলির উত্তবও মেলেনি, কিন্তু সুভাষ সত্যেব রুদ্ধ দ্বারে ব্যাকুলভাবে করাঘাত কবতে সুরু করেন জীবনের সেই প্রভাত-বেলায়। এইখানেই তাঁর অনন্যসাধারণত্বের পরিচয়। তিনি নিজেই এই সময়ের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন: "I was at this time entering on one of the stormiest periods in my psychical life which was to last for five or six years. It was a period of acute mental conflict causing untold suffering and agony, which could not be shared by any friend and was not visible to any outsider." তিনি প্রবেশ করলেন অন্তর্জীবনের তীব্রতম ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক পর্বে—পাঁচ ছয় বছর ধরে সেই পর্বটি স্থায়ী হয়েছিল। মানসিক দ্বন্দ্বেরও সে ছিল এক চরম সঙ্কটপূর্ণ কাল, অসহনীয় যন্ত্রণা ও বেদনা

তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে নীরবে, কোনো বহিঃপ্রকাশ না রেখে,—এমনকি কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছেও নিজেকে অনাবৃত করে হৃদয়ের ভার তিনি লাঘব করেননি। কেননা সে ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। সুভাষ বরাবরই ছিলেন অতিশয় চাপা প্রকৃতির লোক,—তাঁর হৃদয়ের গোপন সংঘাত ও আলোড়নের কথা তাঁর মুখ দেখেও কেউ বুঝতে পারতনা।

জীবনের মূল উদ্দেশ্য কী? জীবনের সার সত্যই বা কী?—এই ছিল সুভাষের জিজ্ঞাসা, যদিও সবসময়ই সে জিজ্ঞাসা তাঁর মনের কাছে পূর্ণ স্ফুট ছিলনা। প্রকৃতি-পূজা তাঁর জীবনের উত্তরণে কতকটা সহায়তা করেছিল, বিশেষত তাঁকে সমাহিত-চিত্ত করে তুলেছিল—এবং একাকী নির্জনে বসে আত্মভাবনায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বেণীবাবুর দৃষ্টি প্রকৃতির সৌন্দর্যরসপানে বিভোর হয়ে তাতেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সুভাষের দৃষ্টি প্রকৃতির ধ্যানে স্নিগ্ধ, মার্জিত ও পরিশীলিত হয়ে নিজের স্বরূপ রহস্যের দিকে চলে গেল। তাঁর অন্তর্নিহিত শিবচেতনার উন্মীলনের এটাই ছিল স্বাভাবিক গতি ও পরিণতি।

আপাততঃ তাঁর মনের গোচরে সমস্যাটা দাঁড়াল দুটি বিরুদ্ধ আকর্ষণের দ্বন্দ্বের আকারে। বাহ্যজীবন ও পার্থিব বস্তু সচেতনতা একদিকে, আর একদিকে ক্রমবর্ধমান এই প্রতীতি যে জীবনের অন্বেষা আরও গাঢ়তর ও গভীরতর কোনো ভাবোপলব্ধির অপেক্ষা রাখে। একে অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সংঘাত বলবনা,—এ কিশোর সুভাষের হৃদয়রঙ্গপীঠে বিকাশোন্মুখ দুই বিপরীত চেতনা, বিপরীত ভাব, বিপরীত উপলব্ধির লড়াই। মর্ত্যলোক সত্য, না, ঊর্ধ্বলোক সত্য? জীবনের ভোগ-বাসনা, আরাম বিলাস, সত্য, না, ত্যাগমূল্যে স্বীকৃত দিব্যাভিসারই সত্য? বস্তুপুঞ্জের প্রতি আসক্তি সত্য, না, শিবচেতনার উন্মীলনের দাবী সত্য?

এই দ্বন্দ্বে সুভাষের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই দ্বন্দ্বকে

যে মিটিয়ে নেওয়া যায়, উভয় দিকই যে সত্য ও তাদের সামঞ্জস্যই যে পরিপূর্ণ সত্য,—একথা বোঝা সে বয়সে তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। বিশেষত সুপ্ত দিব্য-চেতনার জাগরণের প্রথম ভাগে জড় মাত্রকেই বাধা মনে হয়, একমাত্র চেতনার দাবীকেই সত্য বলে মনে হয়,—এবং সেই কারণে অন্তর্জীবনের সমস্যার সমাধানে একটা একগুঁয়েমি ও অসহিষ্ণুতার ভাবও আসে। আর সুভাষের মতো কিশোর, যাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল এক লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে সবেগে ধাবিত হওয়া, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপস না করা,—তাঁর পক্ষে দ্বন্দ্বটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলনা; মানবপ্রকৃতির বাস্তব দাবীগুলি একদিকে, আর সেই প্রকৃতিকে উত্তরণের অভীপ্সা আর একদিকে—এই দুইয়ের সমান প্রবল আকর্ষণের সম্মুখীন হয়ে সুভাষ উত্তরণের জন্যই একমাত্র চেষ্টিত হয়েছিলেন;—কিন্তু প্রকৃতির টান না চাইলেও থাকে, তার প্রভাব চেতনে, অবচেতনে পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে, ছাড়াতে গেলেই ব্যথা দেয়, যাদু করে, অনতিক্রম্য মনে হয় তার আকর্ষণ, আর উর্ধ্বের অভিসারে আত্মনিবেদিত কিশোরের পক্ষে সেটাই অসহনীয়, পরম যন্ত্রণাকর, দুর্লঙ্ঘনীয় বাধা বলে মনে হয়। সুভাষের অন্তর্দ্বন্দ্বের এই ছিল স্বরূপ।

বয়স যখন বারো থেকে চোদ্দোর কোঠায় যৌন-চেতনার উন্মেষ তখন ঘটে যায়। প্রাকৃতিক নিয়মবশে যৌনবোধ ও যৌন-আকাঙ্ক্ষা তখন দল মেলতে সুরু করে। সুভাষের জীবনেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু তিনি সহজভাবে, অন্যান্য সাধারণ কিশোরদের মতো. এ সমস্যাকে মেনে নিতে পারেননি। যৌন চেতনাকে নিজ দেহের মধ্যেই অবস্থিত একটা সর্পিল অস্তিত্ব বলে মনে করেছিলেন তিনি। ওটা বন্ধনের কারণ, মায়ার পাশ, একটা পাপের ছায়া;—ওকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে হবে, দমন করতে হবে, ছিন্ন করতে হবে ওর মূল, এই কথাই তাঁর মনে হয়েছিল। লক্ষ্য ও সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেলে সুভাষ তা থেকে পিছপা হতে জানতেন না, ভ্রষ্ট

হতেন না পথ থেকে ; সমস্যা যত দুরূহই হোক তিনি অটুট মনোবল নিয়ে তার মুখোমুখি হতেন। কিন্তু সেই বয়সে ব্যাপারটা ছিল কতকটা দৈত্যের সঙ্গে লড়াইয়ের মতো, লড়াই যে করে তার সমস্ত দেহ মন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে একটা অস্বাভাবিক ও দুর্নৈতিক শক্তি তাঁর ভিতরে মাথা তুলেছে, যাকে তাঁর সত্তার ভিতর থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে, নিক্ষেপ করে ফেলতে হবে সজোরে,—কিংবা নিজের ভিতরেই তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে। যৌনচেতনা মানবজন্মের একটা সংস্কার, সত্তার বহু গভীরে এর মূল প্রোথিত,—বিশ্বের জীবজীবনের সূচনা থেকে এই আদিম সংস্কার ও প্রবৃত্তি ধারাবাহিকভাবে জীবন থেকে জীবনের মধ্যে প্রবাহিত, সঞ্চারিত ও প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে ; এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, এর দখলকে হটিয়ে দেওয়াও প্রায় অসম্ভব মনে হয়, অন্ততঃ জীবনের প্রথম পর্যায়ে এর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি কেউই পায়না। কিন্তু এই যৌন-চেতনার মুখোমুখি হয়ে সুভাষের শিব-চেতনা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ;—সুভাষ একে স্বাভাবিক অতএব অপরিহার্য বলে তাই মেনে নিতে পারেননি। সুভাষচরিত্রের গঠনের বৈশিষ্ট্য এই থেকেই অনুমান করা যায় ; অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের প্রতি এই যে আগ্রহ ও নিষ্ঠা, ভারতীয় শাস্ত্রচিন্তানুসারে, এ থেকেই বোঝা যায় শিবসত্তা নিয়েই তাঁর জন্ম হয়েছিল। বিবেকানন্দ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ ঠিক একই উক্তি করেছিলেন, তাঁরও ব্রহ্মচর্যের প্রতি ধ্রুব আগ্রহ দেখে। সুভাষ লিখেছেন যে যৌনচেতনার স্রোতে গা ভাসাতে বা তাকে অনিবার্য বলে সহজভাবে মেনে নিতে কিংবা বাহ্য জীবনের মোহগুলিকে বরণ করে নিতে যদি তিনি চাইতেনও তবু বরণ করতে তিনি পারতেন না—there was something within which would not let me go. "আমার ভিতরেই ছিল এমন কিছু যা আমাকে সে পথে যেতে দিত না।"—এই কিছুটাই তাঁর সত্তার জন্মগত বৈশিষ্ট্য, প্রচলিত ভাষায় একেই বলে

জন্মান্তরীণ সংস্কার। তাঁর এই নিজস্ব সংস্কার বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত আদিম প্রবৃত্তির সংঘর্ষ বেধেছিল তাঁরই হৃদয়ে; তীব্র ও গভীর যন্ত্রণায় কাতর সুভাষ শুধু একটা কথাই ভাবছিলেন যে যে পথ ধ্রুব বলে তিনি জেনেছেন সে পথে চলতে তিনি নিশ্চিতভাবে সমর্থ হচ্ছেন না কেন, কেন অন্য পথের হাতছানি এসে পৌঁছচ্ছে, নিজের ভিতরে মোহ ও দুর্বলতার এই প্রশ্রয় কেন? নিজেকে যত দুর্বল মনে হল আত্মবিজয়ের সংগ্রামকে মনে হল ততই কঠোর; নিজের শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণ এই যে তাঁকে পথ দেখাবার ও পবিচালনা করার কেউ ছিল না,—তিনি যে একটা অসাধারণ ও অমানুষিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন একথাটা কেউ তাঁকে বুঝিয়ে দেয়নি। বৃথাই তাই আত্মগ্লানি অনুভব করেছিলেন তিনি। তাঁর নিজের উক্তি এই: "যেহেতু আমি ছিলাম দুর্বল তাই এ লড়াইও ছিল তীব্র। জীবনেব লক্ষ্য স্থির করা আমার কাছে ততটা কষ্টকব ছিলনা, যতটা ছিল সেই একমাত্র লক্ষ্যে সমগ্র মনকে নিবদ্ধ কবা। জীবনেব যে উদ্দেশ্য সর্বাপেক্ষা আমার কাম্য ছিল সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও বিপরীত বা অবাধ্য ইচ্ছাগুলিকে বশে এনে মানসিক শান্তি ও সমাবস্থা লাভ করতে আমাব অনেক দিন সময় লেগেছিল; ক রণ মন যত উন্মুখই হোক না কেন, প্রাকৃতিক দুর্বলতাও ছিল। আমার মনের জোর অপেক্ষাকৃত বেশি হলে নিঃসন্দেহে এই সকল সমস্যার আরও সহজে সমাধান করা সম্ভব হত।"

অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রকাশের মত সুভাষের এই বেদনাময় দিনগুলিতে তাঁব জীবনে এক দিব্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটল। তিনিই সুভাষেব প্রথম গুরু ও আজীবন সহচর—তাঁর অশরীরী কিন্তু ভাবময় উপস্থিতি সুভাষকে নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে টেনে তুলল। যে দুর্বলতাবোধে ক্রমাগত তিনি পীড়িত হচ্ছিলেন তা কেটে গেল,—বরং আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের অনুভবে

তাঁর মন ভরে উঠেছিল। অন্তর্জীবনের সেই সঙ্কটময় কালে যেন নিয়তির ইঙ্গিতে এই সাহায্য তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছিল,—তাঁর ভাষায়: One day by sheer accident I stumbled upon what turned out to be my greatest help in this crisis. ঘটনাটা ঘটেছিল এই রকম। সুভাষচন্দ্রের একজন আত্মীয় এই সময় কটকে নতুন এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সুভাষকে একদিন যেতে হয়েছিল। তাঁর পুস্তক-সংগ্রহের দিকে চোখ বোলাতে যেয়ে সুভাষ হঠাৎ স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর সাক্ষাৎ পান। সন্ন্যাসীর নামটা পরিচিত, ছবিও হয়তো ইতিপূর্বে দেখেছেন, তাঁর কীর্তিকলাপের কিছু কিছু কথাও হয়তো শুনে থাকবেন, কিন্তু তাঁর রচনা ও বাণী পাঠের সুযোগ কখনো হয়নি। কৌতূহলী সুভাষ বইখানি টেনে নিয়ে দু একটা পাতা ওলটাতেই চমকিত হলেন, শরীরে শিহরণ অনুভব করলেন, তাঁর একান্ত প্রয়োজনের কথাগুলি বইয়ের পাতায় এভাবে পাওয়া যেতে পারে তা ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে। তিনি চেয়ে নিলেন কয়েকখানি বই, বাড়ি নিয়ে গেলেন সেগুলি,—পড়তে সুরু করলেন অধীর আগ্রহে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কিশোর সুভাষের প্রথম পরিচয় ঘটল।

সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন যে সুভাষচন্দ্রের হাতে যিনি স্বামীজীর বই তুলে দেন তাঁর নাম কৃষ্ণচন্দ্র সেন। তিনি অন্য স্কুলের একজন শিক্ষক। তিনি নাকি সুভাষচন্দ্র, চারুচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে তাদের স্বামীজী ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে কয়েকখানি বই পড়তে দেন। সুভাষচন্দ্রের আত্মচরিতের বর্ণনা এই ঘটনার সঙ্গে মেলেনা বলে এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়। সুভাষচন্দ্রের মতে তাঁর আত্মীয়ের নামও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ছিলনা, তিনি মিত্র বংশজ ছিলেন ও তাঁর আত্মাক্ষর ছিল S. C।

বেণীবাবুর শিক্ষা তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল সৌন্দর্যানুভূতি ও নৈতিক চেতনা; কিন্তু বেণীবাবু এমন কোনো আদর্শের সন্ধান দিতে

পারেননি যার বেদীমূলে নিজের সমগ্র সত্তাকে উৎসর্গীকৃত করা যায়। That Vivekananda gave me—'বিবেকানন্দ আমাকে সেই আদর্শ দিলেন'—লিখেছেন সুভাষচন্দ্র।

সুরু হল বিবেকানন্দের রচনাবলী অধ্যয়নের পালা। সে অধ্যয়নে সুভাষ তন্ময় হয়ে গেলেন। তাঁকে সবচেয়ে উদ্দীপ্ত করল বিবেকানন্দের ভারতবর্ষে প্রদত্ত বক্তৃতামালা ও তাঁর পত্রাবলী। কী ছিল এই বক্তৃতা ও পত্রে?

স্বামীজীর এই বক্তৃতা ও পত্রগুলিতে ছিল চরম আশার বাণী, একটা নব জাগ্রত জাতির অভ্যুদয়ের পথে যাত্রা করার নির্দেশ ও প্রেরণা, ব্যক্তির জীবনকে মহত্তম আদর্শের ভিত্তিতে গঠন করার আহ্বান। সুভাষের হৃদয়ের আর্তি ও তাঁর নবোন্মেষিত চেতনার পক্ষে স্বামীজীর কথাগুলি ছিল তৃষ্ণার জলের মতো তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্যদায়ী; সুভাষ তার ভিতর থেকেই তাঁর চলার পথের নির্দেশ ও প্রেরণা একই সঙ্গে পেলেন। মাদ্রাজে স্বামীজী একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন: "আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হোন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বছর ভুললে কোন ক্ষতি নেই! এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—এই আমাদের জাতি;—সর্বত্রই তাঁর হাত, তাঁর ক·, সকল স্থান ব্যেপে আছেন তিনি। কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে আমরা ধাবিত হব, আমাদের চারদিকে যে দেবতাকে, যে বিরাটকে প্রত্যক্ষ করছি তাঁর পূজা না করে?" এই বক্তৃতার শেষভাগে স্বামীজী মাদ্রাজের যুবকগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন: "হে যুবকগণ! আমার সমস্ত আশা তোমাদের ওপর। তোমরা কি তোমাদের জাতির আহ্বানে সাড়া দেবে? যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তবে আমি বলছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জ্বল হবে। নিজেদের ওপর প্রবল বিশ্বাস রাখো, যেমন বাল্যকালে আমার ছিল, আর সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই আজ আমি দাঁড়িয়েছি। তোমরা প্রত্যেকে

নিজেদের ওপর এই বিশ্বাস রাখো যে অনন্ত শক্তি প্রতি আত্মাতেই আছেন—তাহলে তোমরাই ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে।" তারপর যে কথাগুলি স্বামীজী বলেছিলেন, সুভাষ মনে করতে পারতেন যে সে তাঁকেই উদ্দিষ্ট করে বলা: "This is the time to decide your future—while you possess the energy of youth, not when you are worn out and jaded, but in the freshness and vigour of youth Work; this is the time, for the freshest, the untouched and unsmelled flowers alone are to be laid at the feet of the Lord, and such He receives. Rouse yourselves, therefore, for life is short." আর দেরী কোরোনা, হে সদ্য প্রস্ফুটিত কিশোর,—বইয়ের পাতার ভিতর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীজী যেন বললেন সুভাষকে,—এই তো তোমার জীবন গঠনের সময়, লক্ষ্য স্থির করার সময়, নিঃশেষ আত্মনিবেদনের এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ। দেবতা অনাঘ্রাত, অস্পৃষ্ট, সদ্য কোটা ফুলই তো গ্রহণ করেন। ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার হব—এরকম সামান্য উচ্চাশাকে সম্বল কোরোনা—দাও, নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দাও দেশ ও জাতির উত্থানের জন্য, মানবজাতির সেবার জন্য। "A far greater work is this sacrifice of yourselves for the benefit of your race, for the welfare of humanity." সুভাষের মর্ম স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল এই বাণীতে, তাঁর আত্মধর্মের পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি। সর্বত্যাগের আদর্শ ভিন্ন আর কোনো স্বল্পাদর্শে তাঁর হৃদয়ের তৃপ্তি সম্ভব ছিলনা, কারণ ঐ সংস্কার নিয়েই তাঁর জন্ম হয়েছিল।

স্বামীজীর পত্রাবলীর ভিতর এই যে একটা আবেদন ছিল—My Brave Boys-দের সম্বোধন করে ১৯শে নভেম্বর ১৮৯৪ সালের পত্রখানিতে যেমন তিনি লিখছেন: Feel, my children, feel:

feel for the poor, the ignorant, the downtrodden, feel till the heart stops and the brain reels and you think you will go mad—then pour the soul out at the Lord and then will come power, help and indomitable energy. Struggle, struggle was my motto for the last ten years. Struggle, still say I.—সুভাষের কাছে এইটাই ছিল সবচেয়ে সার্থক আবেদন। হাঁ, তিনিও নিজেকে স্বামীজীর একজন brave boy বলে মনে করতে পারতেন,—করেছিলেনও হয়তো। 'অনুভব কর, হে কিশোর, তোমার দেশজননীর অস্তিত্বকে নিজের সমগ্র সত্তাব মধ্যে অনুভব কর, পাগল হও তাঁর কথা ভেবে, আব নিজের আত্মাকে নিবেদন কর তাঁরই পায়ে ;—সংগ্রাম কব, হে বীর তরুণ, ওঠো, জাগো, সংগ্রাম কর।' জীবনের এক চরম সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিলগ্নে সুভাষের জীবনাকাশে বিবেকানন্দ প্রায় অলৌকিক ভাবে উদিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, কোন পথ সুভাষের নিজস্ব ধ্রুব পথ, আর কী লক্ষ্য সাধনের জন্যই বা তিনি জগতে এসেছেন। গুরু ও দিশারীর চরণে আভূমি প্রণাম করে সুভাষ হয়তো বা সেদিন বলেছিলেন : তোমার আদেশই যেন অনুসরণ করতে পারি, হে প্রভু।

সুভাষ বলেছেন, স্বামীজী দেশবাসীকে কর্তব্য পথের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বামীজীর আদর্শের সার কথা ছিল 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' —অর্থাৎ নিজের মুক্তিসাধন ও জগতের কল্যাণব্রত উদযাপন। অবশ্য তিনি একথাও বলেছেন যে নিজের মুক্তিসাধনের চিন্তাও স্বার্থচিন্তা—অতএব তাও বর্জন করতে হবে ; মানব কল্যাণের বেদীতে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করতে হবে সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে। সারা মধ্যযুগ ধরে ভারতে সন্ন্যাসের আদর্শ ছিল জীবের মুক্তি সাধন,—সাধক ও তপস্বীরা এর চেয়ে বেশি কিছু বুঝতেন না। ইয়োরোপের

সন্ন্যাসাদর্শও ছিল একই সুরে বাঁধা। সন্ন্যাসীর কাছে সমাজচিন্তা ও মানবহিতৈষণার প্রয়াস বর্জনীয় ছিল। আধুনিক যুগে এই ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা ভোগবাদ বা মিল, বেন্থামের উপযোগিতাবাদের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামীজী এই আত্মসর্বস্ব চিন্তা ধারার ঘোরতর প্রতিবাদ স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছিলেন। সামান্য পশুকে রক্ষার জন্য বুদ্ধদেব নিজেকে বলি দিতে গিয়েছিলেন—বিবেকানন্দ বলেছেন এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ জীবনে হতে পারে না। সুভাষ স্বামীজীর এই শিক্ষাটিকেই সর্বতোভাবে বরণ করে নিলেন।

কিন্তু মানবজাতির সেবার আদর্শকে বরণ করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ একথাও বুঝলেন যে মানবজাতি স্বদেশ ও স্বজাতিকে বাদ দিয়ে গঠিত নয়। স্বামীজীও সেই মতই পোষণ করতেন। আমরা আগেই সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। নিবেদিতার সেই যে বর্ণনা : "স্বামীজীর ভালবাসার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছিল তাঁর দেশমাতৃকার চরণে। ভারতের যে কোনো প্রান্তের একটি ক্রন্দন-ধ্বনিও তাঁর হৃদয়ে সাড়া তুলত।"—সুভাষের কাছে এইটিই স্বামীজীর যথার্থ পরিচয় বলে সেদিন মনে হয়েছিল। স্বামীজীর বাণী : "উচ্চকণ্ঠে বল ভাই—দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"—সুভাষকে মথিত করেছিল। স্বামীজী বলেছিলেন যে ইতিহাসের চক্রাবর্তনে একদিন ব্রাহ্মণ রাজত্ব করেছে, ক্ষত্রিয় রাজত্ব করেছে, আসন্ন ভবিষ্যতে শূদ্র রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হবে। তার অর্থ জনসাধারণের জাগরণ ঘটবে এই যুগে ও তারাই সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার পাবে। সুভাষ সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে স্বাগত জানাবেন। স্বামীজী মানুষের আত্মশক্তির জাগরণকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতেন। সুভাষ স্বামীজীর কাছ থেকে আত্মবিশ্বাসে দীক্ষা নিলেন। বাল্যে এই জিনিসটিরই তাঁর অভাব ছিল—এখন সে অভাব পূরণ হয়ে গেল। আত্মশক্তির বোধও তাঁর মধ্যে ক্রমশঃ স্ফুট হয়ে উঠল।

পনেরো বছরের কিশোর সুভাষের জীবনে বিবেকানন্দের প্রবেশ একটা ব্যাপক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল—তাঁর জীবনের ধারাই তাতে ওলট-পালট হয়ে গেল। বেণীমাধব দাসকে আর জীবনের ধ্রুবতারা বলে তিনি মনে করতে পারলেন না। স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব ব্যক্তিত্ব ও তাঁর আদর্শের সামগ্রিক রূপকে ঠিক সে সময়েই তিনি অনুভব করতে পারেননি, কিন্তু স্বামীজীর শিক্ষার ছাঁচে তাঁর মন ঢালাই হয়ে গেল, তিনিই হয়ে উঠলেন তাঁর প্রিয়, আরাধ্য, বরণীয় গুরু। যে সব প্রশ্ন তাঁর মনের মধ্যে জাগত, বেণীমাধবের আদর্শ ও শিক্ষায় সে সব প্রশ্নের উত্তর সব সময় সন্তোষজনক ভাবে মিলত না। বিবেকানন্দই তাঁকে সকল প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দিলেন। বেণীমাধবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ভেবেছিলেন, দর্শন চর্চাতেই তিনি ভবিষ্যতে নিজেকে নিয়োগ করবেন। এখন বুঝলেন শুধু মনোবিলাস তাঁর ধর্ম নয়, দার্শনিক প্রতীতি তথা জীবনের বিশ্বাসকে প্রতি পদে কর্মে রূপান্তরিত করাই হবে তাঁর স্বকীয় পথ। আর সেই পথই বিবেকানন্দের অনুমোদিত।

বিবেকানন্দ সম্পর্কে জানতে বুঝতে যেয়ে সুভাষ তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কেও অবহিত হলেন। রামকৃষ্ণচরিত্রের প্রধান আকর্ষণ এই ছিল না যে তিনি স্বামীজীর গুরু ;—তিনি নিজেই অনুপম, অনবদ্য, দিব্যপুরুষ। তিনি বই লেখেননি, বক্তৃতা করেননি, লেখাপড়াও জানতেন অতি সামান্য। তিনি তাঁর লোকোত্তর জীবন মানবজাতির আদর্শ রূপে উপস্থিত করেছেন। তাঁর শিক্ষার সার কথা ত্যাগ,—যাকে তিনি সরল ভাষায় বলতেন, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ। জগতে ভোগের বহু বিষয় আছে, কিন্তু সবার মূলে আছে অর্থ ও নারী ; তিনি বলতেন, অন্য বস্তু ত্যাগ ত্যাগ নয়, যদি না কাম ও কাঞ্চন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ হয়ে যায়। তাঁর মুখে এই সব কথা অকাট্য সত্য বলে মনে হত, কারণ এ তাঁর মুখের কথা মাত্র ছিল না, এ ছিল তাঁর জীবনের সত্য। রামকৃষ্ণ বলতেন ভগবান পেতে হলে,

সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে, হৃদয়কে করতে হবে শুদ্ধ ও নির্মল; কামের ছায়া থাকলেও হৃদয়ের দর্পণে সত্যের প্রতিবিম্বন ক্ষুণ্ণ হবে। কামকে তাই রূপান্তরিত করতে হবে ভক্তিতে—জগতের সকল নারীর মধ্যে জগন্মাতাকে দেখে প্রণাম করতে হবে। নারীকে বিশ্বজননীরূপে দেখাই তাঁর উপদেশের সার কথা।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শকে সুভাষ বরণ করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি কিশোর দল গঠনের প্রয়োজনও তিনি অনুভব করলেন। কিংবা বলা যায়, তাঁর চার পাশে দল আপনিই গঠিত হয়ে গেল। ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন একাকী ও নিঃসঙ্গ; দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে স্থিরভাবে কোনো আদর্শকেই গ্রহণ করতে পারেননি বলেই অন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল তারও বিকাশ এতদিন হয়নি। বেণীমাধবের উচ্চারিত আদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করলেও তা তাঁকে গতিময় করে তুলতে পারেনি; জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শলাভের আকুতি মাত্র সম্বল করে তিনি তখন নীরবে, নির্জনে, সঙ্গোপনে অপেক্ষা করছিলেন। আদর্শ যেদিন ধ্রুবতারার মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর চিন্তাকাশে, সেদিন সুভাষের সহজাত নেতৃত্ব প্রতিভাও স্ফুরিত হয়ে উঠল। তাঁর ব্যক্তিত্ব একটা নতুন রূপ নিতে সুরু করল। তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের মূল রহস্য ছিল আদর্শের বেদীতে তাঁর নিজেকে নিঃশর্তে ও সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করার মধ্যে নিহিত। তাঁর শক্তি ও আকর্ষণী ক্ষমতার জন্ম হয়েছিল তাঁর নিঃশেষ আত্মোৎসর্গের মধ্যে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের এই নবীন সেবকের গোটা সত্তাই ছিল আমূল পবিত্র; পবিত্রতাই ছিল তাঁর জীবনের ভিত্তি। তাঁর চারপাশে যেন একটা পবিত্রতার মণ্ডল বিরাজ করত। সেই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। এরপর যখন তিনি এমন একটা আদর্শকে বরণ করলেন যে আদর্শ শুধু নিজের ব্যক্তি জীবনেই নয়, সমাজ জীবনে ও জাতীয় জীবনেও

তীব্র গতি সঞ্চার করতে পারে এবং তার রূপায়ণের একটা ব্যাপক সম্ভাবনা ও তাগিদ তিনি উপলব্ধি করলেন—তখন স্বভাবতই তাঁর চারপাশের জনমণ্ডলী থেকে তিনি এই আদর্শের অনুসারী একটা দল গঠন করে ফেলতে সক্ষম হলেন। আদর্শের অনুসরণ যেদিন তাঁর জীবনে দৃঢ় ও নির্দিষ্টভাবে সুরু হল, ঠিক সেদিনই তাঁর ভিতর থেকে আবির্ভূত হল একজন নতুন নেতা। সুভাষের মধ্যে শিব তাঁর নয়ন উন্মীলন করলেন।

সুভাষের নেতৃত্বে একদল কিশোর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এই ভাবেই রক্ষিত হয়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ক্রম অনুসরণ করে সুভাষজীবনকে কেন বোঝা দরকাব আগেই সেকথা বলেছি; ঘটনার পারম্পর্যটুকু শুধু এখানে লক্ষ্যণীয়। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পূর্বাহ্ণে তাঁর আদর্শের পতাকা বহনেব দায়িত্ব তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে; স্বামীজীব হাত থেকে সেই পতাকা গ্রহণ করেছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতাব মৃত্যু যখন আসন্ন, কিংবা মৃত্যু হয়েছে, তখন অদৃশ্য দৈবেব বিধানে বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেই পতাকা স্কন্ধে তুলে নিলেন সুদূর কটকের নিভৃত পরিবেশে লালিত এক অনভিজ্ঞ, অজ্ঞাত কিশোর। বিস্ময়ের বিষয়ই বটে। ভারতবর্ষের চলমান ইতিহাসের ছন্দ এই ঘটনা-সন্নিবেশের মধ্যে অনুভব করা যায়।

সন্ন্যাসীরা যখন ধুনি জ্বালিয়ে তার চারপাশে বসে, তখন পরমার্থ প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়ে তারা আলোচনা করে না। সুভাষ ও তাঁর কিশোর অনুসারীরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শকে কেন্দ্র করে যখন সমবেত হলেন তখন তাঁরা ঐ আদর্শেব প্রসঙ্গ ভিন্ন আর সব কথা যেন ভুলে গিয়েছিলেন। স্কুলে ও স্কুলেব বাইরে যখনই যেখানে তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাতের সুযোগ ঘটত তখনই তাঁরা আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ে যেতেন—কিন্তু বিষয় থাকত ঐ

একটিই। ক্রমে ঐ বিষয়ে আলোচনা তাঁদের এমন নেশার মতো পেয়ে বসল যে অল্প সময়ের জন্য পারস্পরিক সাক্ষাতের খণ্ডিত অবকাশে আলোচনা করে তাঁদের পক্ষে আর তৃপ্ত থাকা সম্ভব হল না; তাঁরা দীর্ঘতর অবকাশ লাভের উদ্দেশ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন বহুদূরে, কিংবা কোথাও হয়তো বসে যেতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অবিরাম প্রবাহে চলত আলোচনার ধারা। কোনো বন্ধু হয়তো সুন্দর ভক্তিসঙ্গীত গাইত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে; সকলেরই একটা উদ্দীপনা এসে যেত সেই গান তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে।

ক্রমে তাঁদের এই নতুন সঙ্ঘটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁদের সম্পর্কে কথা বলাবলি হতে লাগল। প্রত্যেকের বাড়িতেও অভিভাবকরা ছেলেদের চলাফেরা ও আচরণের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। স্কুলের অন্যান্য বন্ধু ও সহপাঠীরা এ নিয়ে বিদ্রূপাত্মক কোন কথাই বলতে পারত না; সুভাষের গোষ্ঠীর ছাত্ররা সবাই ছিল স্কুলের সেরা ছাত্র, তাদের ক্লাসের পরীক্ষায় তারা প্রথম স্থানগুলি দখল করে রাখত। কিন্তু অভিভাবকদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে এড়ানো সম্ভব ছিল না। বাড়িতে সুভাষকেও নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর উত্তরে অভিভাবকরা সন্তুষ্ট হননি। প্রথমে তাঁরা তাঁকে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন—বলেছিলেন, এভাবে বাইরে বহু সময় নষ্ট করলে ক্লাসের পড়া তুমি পড়বে কখন, এবং তাছাড়া বাইরে এত আড্ডা দেওয়াও তো উচিত নয়। সুভাষ নিষেধ শোনেননি, ফলে তাঁকে ভর্ৎসনা নিতে হয়েছিল মাথা পেতে। কিন্তু সুভাষ যেমন ছিলেন ধীর ও নম্র, তেমনি তাঁর আদর্শনিষ্ঠাও ছিল জ্বলন্ত। পিতামাতার নিষেধ বাক্যের চেয়ে আদর্শ অনুসরণের আহ্বানই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। নিজের মুক্তি সাধন এবং জগতের কল্যাণব্রত পালন—এই ধ্রুব আদর্শের বেদীতে উৎসর্গীকৃত সুভাষ পিছন ফিরে পিতামাতার আদেশ ও নির্দেশের দিকে চেয়ে বসে থাকতে পারেননি; ভাগ্যে গঞ্জনা জুটলেও

তাকেই তিনি সেদিন পরম পাথেয় বলে মনে করেছেন। বাবা মা দেখলেন, যে সুভাষ একদিন পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম—ইত্যাদি শ্লোক আওড়াত ও তাঁদের একান্ত বাধ্য ছিল, আজ তার চরিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে;—তার স্বভাবে কোন উগ্রতা না এলেও সে ঋজুভাবে নিজের মতকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়ায়; কোনো শিষ্ট বাক্য বা আদেশ তাকে বিচলিত করতে পারে না। দেখে তাঁরা অবাক হলেন।

সুভাষের জীবনে সুরু হল চরম সংঘাতের কাল। সংঘাত একদিকে ছিল অন্তরে, আর একদিকে ছিল বাইরে। বাইরের সংঘাতের কথা বলেছি,—পিতামাতা, পরিবার ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সেই সংঘাত বাধত। একই সময়ে অন্তরের সংঘাতও তীব্র আকার ধারণ করেছিল। রামকৃষ্ণ যে পবিত্রতা ও ত্যাগের আদর্শ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হলে নিজের নিম্নতর সত্তার সমস্ত আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়। এক উঠতি বয়সের কিশোরের পক্ষে সে প্রত্যাখ্যান প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন কামনার শতদল তার মধ্যে কেবল বিকাশ লাভ করতে সুরু করেছে, তার রোমাঞ্চ পুলকে তার সারা সত্তা তখন স্পন্দিত ও অধীর; জীবন ও জগত তার কাছে সন্ত কাটা গোলাপের মতো নতুন, সজীব, সতেজ ও মধুর; ব্যর্থতা, গ্লানি, হতাশা ও তিক্ততার অভিজ্ঞতাও তার মধ্যে নেই। মোহভঙ্গের কারণ ঘটেনি বলেই জগতকে সে যে মোহদৃষ্টিতে দেখছে সে বোধও তার নেই; দেহ মনের শক্তি ক্রমেই বিকাশ লাভ করছে বলে অবসাদ বা বিষণ্ণতার অনুভূতি থেকেও সে মুক্ত। এই বয়সে নিজের ভিতরে কোন শক্তির মন্ত্রণাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে তা বুঝে ওঠাই দুরূহ, প্রত্যাখ্যান তো ততোধিক দুঃসাধ্য। কিন্তু রামকৃষ্ণের পথের যে অনুসারী হতে চায় তাকে সেই দুরূহ ও দুঃসাধ্য কাজ সমাধা করতেই হবে, এবং সুভাষের মতো আন্তরিক ও একাগ্রনিষ্ঠ কিশোর

এ বিষয়ে স্তোকবাক্যে নিজেকে ভোলাতে বা মাঝপথে আপস করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তাঁর অন্তরের সংগ্রাম হয়েছিল রক্তক্ষয়ী, সুদুঃসহ, নিদ্রাহরা। বাইরের এবং অন্তরের যুগপৎ সংগ্রামে সুভাষের কিশোর হৃদয় পীড়িত, আলোড়িত, দগ্ধ হয়েছিল।

সুভাষ লিখেছেন, সংগ্রামের কোন দিকটা—বাইরের অথবা ভিতরের—তাঁর পক্ষে অধিক যন্ত্রণাকর হয়েছিল তাঁর পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। কারণ দুটিই ছিল সমান তীব্র ও সংক্ষোভময়। তায় সুভাষ ছিলেন কোমল, স্পর্শকাতর, ভাবময় কিশোর। প্রতিটি ঘটনা তাঁর হৃদয়ে আলোড়ন তুলত, সমস্ত ব্যথা ও কাতরতা নীরবে সহ্য করা ভিন্ন তাঁর পথ ছিলনা। পিতামাতাও যত তাঁকে স্বীয় পথ অনুসরণ করা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইতেন, তিনিও ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন ও নিজের মত ও পথকে আঁকড়ে ধরতেন। যখন হাজার বুঝিয়েও সুভাষকে কথা শুনতে বাধ্য করা যেতনা, তখন তাঁর মা কেঁদে ফেলতেন। বাঙালী ঘরের মায়েদের ওটাই স্বভাব। মায়ের চোখের জল সুভাষকে দুঃখভাবাক্রান্ত করত, কিন্তু তিনি কখনো সেজন্য সঙ্কল্পচ্যুত হননি। এটাই ছিল আবার তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। মায়ের বেদনা তিনি সহ্য করতে পারতেন না,—কিন্তু উত্তরকালে একদিন নিস্তব্ধ নিশীথে দুর্গম বিপদ সঙ্কুল যাত্রায় প্রবাসের পথে তিনি যখন পা বাড়িয়েছিলেন, সেদিনও মায়ের ক্রন্দনাতুর মুখের প্রতিচ্ছবি তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। বৃহত্তের আহ্বান যেদিন যে বেশেই এসেছে, সেদিনই সুভাষ ক্ষুদ্র, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের আকর্ষণ ছেড়ে যেতে ইতস্ততঃ করেননি। প্রিয়জনকে, বিশেষত বাবা মাকে দুঃখ সেজন্য যতটুকু দিতে হয়েছে তার চেয়ে অনেকগুণ দুঃখ তিনি নিজেই অন্তরের নিভৃতে বহন করেছেন। তাঁর নবীন কৈশোরেই তাঁর এই নিয়তি-লিপির আভাস পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময়ই তিনি অনুভব করেছিলেন যেন তিনি এক দুর্নিবার স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছেন, তাঁর জীবনবিধাতাই

সে স্রোতের নিয়ামক এবং সমস্ত বাধা, নিষেধ, অনুরোধ বা মিনতি সেই স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে যাবে।

বাড়িতে কেউই তাঁর মনের এই চিত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলনা, সহানুভূতি বা সহমর্মিতা পাননি সেদিন কারও কাছ থেকেই। তাঁর সব স্বপ্ন ছিল একান্তভাবে তাঁরই স্বপ্ন, ভাইবোনদের মধ্যেও কেউ তার অংশভাগী হয়নি। তাই পারিবারিক পরিবেশ সেদিন তাঁর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মনে হত। তাঁর মনের দরজা খুলত একমাত্র বাড়ির বাইরে বন্ধুদের কাছে ; তারাই ছিল তার সহধর্মী, আশা ও স্বপ্নের সঙ্গী। বাড়ির বাইরেই সুভাষের সময় তাই আরও কাটতে লাগল, এবং ফলে বাড়িতে সংঘর্ষের মাত্রাও তাই বেড়ে গেল।

মাঝখান থেকে সুভাষের লেখাপড়ায় ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। পড়াশোনায় তাঁর মন বসতনা, পাঠ্য বই নীরস বলে মনে হত, পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার চিন্তাও তিনি করতেন না। কিন্তু তাঁর এত বছরের একাগ্র অধ্যয়ন ও প্রতিভাই স্কুলে তাঁর সুনাম রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল :—এখন সামান্য পড়েও ভালো ফল করতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। এখন তাঁর অভিনিবেশের একমাত্র বিষয় হয়ে উঠল আধ্যাত্মিক সাধনা ও যোগাভ্যাস। কিন্তু যোগসাধনার জন্য চাই গুরু, সেদিন সুভাষের তা মেলেনি। তিনি ব'কের বাজার থেকে খুঁজে খুঁজে জোগাড় করে এনেছিলেন যোগসাধনা সম্পর্কে কতগুলি বই, ভেবেছিলেন সেই বইগুলির নির্দেশ মতো নিজেই যোগ সাধনা করতে পারবেন। কিন্তু প্রথমত সেটা সম্ভব নয়, দ্বিতীয়ত বাজারের বইগুলি সাধারণত যোগসিদ্ধ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিদের দ্বারা লেখাও নয়। বাজার প্রচলিত বই পড়ে যোগাভ্যাসের ফল ভালো না হয়ে খারাপই হয়ে থাকে সাধারণত। ব্রহ্মচর্য ও কামদমন বিষয়ে যেসব বই সুভাষ পেয়েছিলেন, সেগুলির নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করতেন, মনঃসংযোগ ও ধ্যান বিষয়ক বইগুলিও তিনি বারবার পড়ে বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ করতেন। যোগ,

বিশেষত হঠযোগ, তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল ও হঠযোগ সাধনের জন্য প্রাণপণ যত্নও তিনি করেছিলেন। যোগসাধনার বিষয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তিনি করতেন এবং তার ফলে তাঁকে অনেকে বায়ু বা ছিটগ্রস্ত বলেও মনে করত। যোগাভ্যাসের পথে ভুল প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে অনেক সময় লোক সত্য সত্যই পাগল হয়ে যায়। সুভাষের মতো একাগ্র, তন্নিষ্ঠ সাধকের পক্ষে সে বিপদের সম্ভাবনা সত্যই খুব বেশি ছিল।

. যোগ সাধনা করতে যেদিন তিনি শুরু করেন, সেদিন একটা বড় সমস্যা তিনি এই দেখেছিলেন যে একটা নিভৃত ঘর বা স্থান পাওয়া দুষ্কর। সাধনা করতে হবে সকলের চোখের আড়ালে, নতুবা অবাঞ্ছিত, অপ্রীতিকর মন্তব্যে ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপে লোকে চঞ্চল, অস্থির করে তোলে। তাছাড়া বহুজনের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে মনঃসংযোগ করাও যায়না। তায় সুভাষ ছিলেন অতীব লাজুক। তাই তিনি একটা উপায় স্থির করলেন, সন্ধ্যার পর অন্ধকারে নিভৃত ঘরের একটি কোণে বসে যোগাভ্যাস করতে হবে। কিন্তু সেই অবস্থাতেও একদিন তিনি ধরা পড়ে গেলেন। একদিন সন্ধ্যায় ঘরের আলো নিভিয়ে চুপচাপ এক কোণে বসে তিনি ধ্যান করছেন, এমন সময় বাড়ির একটি ঝি সেই ঘরে বিছানা কবতে এসে অন্ধকারে তাঁর গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। অন্ধকারে মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে সে ভূত, চোব নানারকম ভেবে হাউমাউ লাগিয়ে দিল এবং বাড়ির লোকজন এসে পড়ে সুভাষকে যোগাভ্যাসরত অবস্থায় দেখে ফেলল। আসলে এসব ব্যাপার বেশিদিন চাপা রাখা যায় না।

. মনঃসংযোগের নানারকম ধরণ ও অবলম্বন ছিল। একটা সাদা পর্দা বা দেয়ালের মধ্যখানে একটা কালো বৃত্ত এঁকে পলকহীন দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনকে সম্পূর্ণ শূন্য করে দেবার অভ্যাস সুভাষ করতেন। নীল আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার অভ্যাসও তিনি প্রায়ই করতেন। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন

হয়েছিল মধ্য দ্বিপ্রহরের জ্বলন্ত সূর্যের দিকে সম্পূর্ণ খোলা চোখে একভাবে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস। নানাভাবে সংযম পালনের অভ্যাসও তিনি করতেন,—যেমন, আহার সংযম ও বাক সংযম। শীত ও উষ্ণতা সমভাবে সহ্য করার চেষ্টাও তিনি করতেন। সূর্যোদয়ের আগে শয্যাত্যাগ করাও ছিল তাঁর অন্যতম পালনীয় বিধি। আর সবগুলি নিয়ে ততটা আপত্তির সম্মুখীন না হলেও, আহারের ব্যাপার নিয়ে ঝি সারদা ও মায়ের অনুরোধ ও মিনতির শেষ ছিল না। ছেলে যদি মাছ, মাংস ও ডিম বর্জন করে শুধু সামান্য নিরামিষ আহার গ্রহণ করে ও আহারের পরিমাণও কমিয়ে দেয় তবে মা ও মায়ের মতো স্নেহাতুরা নারী তা কী করে সহ্য করবে? কিন্তু সুভাষেরও ছিল ধনুর্ভঙ্গ পণ।

সুভাষ অবশ্য সব ব্যাপারে গোপনচারিতাই পছন্দ করতেন। তারপর রামকৃষ্ণ বলতেন: ধ্যান করবে মনে, বনে, কোণে। ধ্যানের কথা জানবে শুধু গুরু, গুরু-ভাইয়েরা ও যোগপথের সঙ্গীরা। সুভাষের গুরু ছিলনা। কিন্তু সহকর্মীরা ছিল,—যোগসাধনা বিষয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা চলত। যোগসাধনার ফলে নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ হয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও ঐশী ক্ষমতা ও বিভূতি আয়ত্ত হয়,—বইয়ে এসব কথা পড়ে সুভাষ ও তাঁর বন্ধুরা ভাবতেন তাঁদের সাধনার ফলে এসব দেখা দিচ্ছে না কেন? তবে কি সাধনা ঠিকভাবে হচ্ছে না? এই প্রশ্নের উত্তরও তাঁরা অধীত বইগুলির মধ্যেই পেয়েছিলেন:—গুরু বিনা সাধন হয়না,—তাই গুরুর অভাবেই যত্ন ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও সাধনা যথাযথভাবে হচ্ছে না, ফলও তাই আশানুরূপভাবে দেখা দিচ্ছেনা।

সুভাষের চিত্তের ওপর কিন্তু এই যোগাভ্যাসের কতগুলি সুস্থ ফল দেখা গিয়েছিল। তাঁর আত্মপ্রত্যয় বেড়েছিল, আত্ম-সংযম বেড়েছিল, আর মন ভরে গিয়েছিল প্রশান্তিতে। ধীর, স্থির সুভাষ অটল, অবিচল হয়ে উঠলেন। গুরু বা প্রত্যক্ষ পরামর্শদাতার অভাব

হলেও, যোগসাধনার স্বল্প প্রয়াসেই তাঁর মধ্যে আত্মচেতনা ও আত্মসম্বিৎ জেগে উঠল : মন অন্তর্মুখী হবার ফলে স্ব-স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস তিনি পেলেন। তার ফলে আরও অন্তর্মুখী হবার ঝোঁক তাঁর মধ্যে বেড়ে গেল, অন্তরে জাগল অনির্বচনীয়ের জন্য অতৃপ্তি ও ক্ষুধা, তপস্যার আগ্রহ ক্রমে তাঁকে অধিকার করে বসল। সুভাষ বুঝলেন এ পথে গুরু ভিন্ন গতি নেই—তাই এখন তাঁকেই সন্ধান করতে লাগলেন। সুভাষের সঙ্গীরাও এই সন্ধান কার্যে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

কটকে অনেক সাধু সেসময় আসতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বা ছিলেন পরিব্রাজক, কেউ বা শুধু পুরীর জগন্নাথধামগামী—কেউ আশ্রম ও মঠবাসী, কেউ সর্বসংস্কারহীন পরম উদাসী। পুরীর যাতায়াতের পথে এঁরা এসে পড়তেন কটকে, আবার চলে যেতেন তাঁদের গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে। সুভাষের সঙ্গীদের মধ্যে যে কেউ এরকম সাধুর আগমনের কথা জানতে পারতেন, তিনিই অন্য সকলকে তা জানিয়ে দিতেন। তখন তাঁরা সদলে যেয়ে সেই সাধুকে ঘিরে বসতেন। এইভাবে অনেক সাধুকেই তাঁরা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার মধ্যে যে সব সাধুরা ছিলেন মুক্ত ও উদাসী প্রকৃতির, এমনকি আশ্রমের বন্ধনও যাঁদের মধ্যে ছিলনা, যাঁরা টাকা ও অন্য দ্রব্য দিলে ছুঁড়ে ফেলতেন, শিষ্য সংগ্রহের কামনা যাঁদের মধ্যে ছিলনা, তাঁরাই সুভাষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। তাঁরা যোগ শিক্ষা দিতে রাজি হতেন একমাত্র তাঁদেরই, যাঁরা সংসারী নন, সংসারের প্রতি যাঁদের আকর্ষণও নেই। যেসব সাধু মঠ, মিশন বা আশ্রমের অধিবাসী বা যাঁরা বিবাহিত, তাঁদের লক্ষ্য থাকে ধনী ভক্ত সংগ্রহের দিকে ; সুভাষ এঁদের মোটেই পছন্দ করতেন না।

একবার কটকে এসেছিলেন একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, কটকের একজন পশারশালী ডাক্তারের গুরু, একটি ভারতপ্রসিদ্ধ আশ্রমের মোহন্ত। তাঁর নব্বই বছর বয়স ও সৌম্যকান্তি কটকবাসীদের মনে

খুব সম্ভ্রমের উদ্রেক করেছিল, দলে দলে লোক ছুটেছিল তাঁর কাছে। সুভাষও সদলবলে উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে। সাধুকে প্রণাম করে তাঁর কাছে বসতে তিনি তাদের সঙ্গে মধুর স্বরে আলাপ করতে লাগলেন। তাঁর স্নেহপূর্ণ কথায় সুভাষগোষ্ঠীর সকলেই আকৃষ্ট হল। তাঁর শিষ্যরা স্তব পাঠ করছিল, সশ্রদ্ধভাবে কিশোরেরা সব শুনল। শেষে সাধুজীর উপদেশের মুদ্রিত কপি তাদের মধ্যে বিলি করা হলে, সবাই, অন্ততঃ সুভাষ সেই উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন।

উপদেশের প্রথম কথা ছিল, মাছ, মাংস, ডিম খেয়োনা। সুভাষের বাড়িতে নিরামিষ আহারের কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। কিন্তু সুভাষ আমিষ আহার গ্রহণে কিছুতেই আর রাজি হলেন না,—ফলে অনুরোধ, মিনতি, বিদ্রূপ, ভর্ৎসনা সবই জুটেছিল তাঁর কপালে। কিন্তু নিরামিষ আহার গ্রহণের সঙ্কল্পে শেষ পর্যন্ত তিনি অটল ছিলেন। দ্বিতীয় উপদেশ ছিল কয়েকটি বিশেষ স্তোত্র নিত্য আবৃত্তি করা। এই উপদেশটি পালন করতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তৃতীয় উপদেশটি পালন করা সহজ হয়নি। সাধুজী বলেছিলেন, প্রতিদিন প্রাতে ঘুম থেকে উঠে পিতামাতাকে প্রণাম করতে। সুভাষ এতে কোনোদিন অভ্যস্ত ছিলেন না, দ্বিতীয়ত তাঁর মধ্যে তখন বিদ্রোহী মনোভাব দানা বেঁধেছে। পিতামাতাকে প্রণাম করাটা যে পুণ্য সে বিশ্বাস তাঁর তখন ছিলনা, বরং লক্ষ্য সাধনের জন্য পিতামাতার অবাধ্য হতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তবু সাধুজীর উপদেশ পালনে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। একদিন প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে, মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে সোজা বাবার কাছে গিয়ে বাবার পায়ে তিনি প্রণাম করলেন। এই কাজটি করার জন্য সুভাষকে যতটা প্রস্তুত হতে হয়েছিল, জানকীনাথ আবার ততদূর অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তাঁর অবাধ্য পুত্র বিনা কারণে ও বিনা উপলক্ষে তাঁর পায়ে এসে প্রণাম করবে এ তিনি

ভাবতেও পারেননি। কাজেই বিস্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে ব্যাপারটি কী। সুভাষ তাঁর কার্য সিদ্ধি হয়ে যাওয়ায় আর দেরি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, বাবার প্রশ্নের উত্তরও দিলেন না। তিনি সোজা চলে গেলেন তাঁর মার ঘরে, সেখানে মাকেও ভক্তিভরে প্রণাম করে নিরুত্তরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এইভাবে চলেছিল দিনের পর দিন। সুভাষ এমন আচরণ কেন করছেন তা তিনি কাউকে বলেননি। বাবা, মা, ভাইবোন, পরিবারের আর সকলে, এমনকি ভৃত্যরাও চির অবাধ্য সুভাষের এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা কেউই জানতে পারেনি যে এই পরিবর্তনের পিছনে ছিল একজন সাধুর উপদেশ। তারা এও জানতে পারেনি যে এই উপদেশ পালনের জন্য সুভাষকে কতখানি মানসিক কষ্ট স্বীকার করে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়েছিল।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাসও কেটে গেল। সুভাষ তখন খতিয়ে দেখতে চাইলেন যে সাধুজীর উপদেশ পালনের ফল অন্তরের ক্ষেত্রে কী দাঁড়াল। কোনো ফলই ফলেছে বলে তাঁর মনে হল না। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিত্তি হল ত্যাগ; জীবনে ত্যাগকে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আত্মোপলব্ধির বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা হয়না; শুধুমাত্র কোনো বাহ্য কর্ম, মানবিক সংস্কারের দিক থেকে তার যত আবেদনই থাকুক না কেন, উপলব্ধির দ্বার খুলে দিতে পারেনা। এই বিচারের নিরীখে সাধুজীর উপদেশ, যা জীবনের বহিরঙ্গ আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করাতেই নিঃশেষিত হয়েছিল, অনাবশ্যক বলে প্রতীত হল এবং সুভাষ তৎক্ষণাৎ সে উপদেশ পালন বন্ধ করে দিলেন। তিনি ফিরে গেলেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আদর্শের গণ্ডীতে,—No realisation without renunciation—I told myself again. 'নিজেকে আবার আমি বললাম—ত্যাগ বিনা উপলব্ধি অসম্ভব'—এই তাঁর নিজের উক্তি।

সুভাষের এই সময়কার আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার একটি চিত্র এঁকেছেন সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেনঃ "একবার তোমরা আমার প্রেমময় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নাম মুখে নাও—একবার তাঁর নাম কর, তখন সুভাষচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারতেন না। তিনি অশ্রুর বন্যায় ভেসে যেতেন। তাঁর দুনয়নে ধারা বয়ে যেত। সুভাষচন্দ্রের সেই অশ্রুসজল ভক্তি-গদগদ মূর্তি দেখে কেউই অশ্রুরোধ করতে পারত না। সে এক অপরূপ দৃশ্য! সকলের অন্তরেই ভক্তির বন্যা বয়ে যেত। মনে হত যেন চৈতন্যদেব নব কলেবরে পুনরায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। এমন উপযুক্ত আধার দেখে রামদাস বাবাজী কীর্তনানন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠতেন। প্রেমময় হরিগুণ গানে সকলের প্রাণে প্রেমের প্রবাহ বয়ে যেত। সুভাষচন্দ্র প্রেমের বন্যায় ভেসে গেলেন।" (সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, পৃঃ ৩২)

সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের এই দিকটি প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে; তাঁর এই ভক্তিবাদী রূপটি তাঁর সংগ্রামী পরিচয়ের আড়ালে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু সুভাষের ভক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা শুধু ভাবাস্বাদন ও চোখের জল ফেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা; ক্রমেই তা গাঢ় ও গম্ভীর রূপ ধারণ করেছিল। বিবেকানন্দের নির্দেশ সে ব্যাপারেও তাঁর সহায়ক হয়েছিল। যোগ সাধনা করার ফলে মানুষ হয়ে ওঠে ব্যক্তিকেন্দ্রিক; নিজের মুক্তিচিন্তা, আধ্যাত্মিক উন্নতির আগ্রহ, সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হবার প্রয়াস—ইত্যাদি কারণে সমাজ সম্পর্কে তার ভাবনার অবসান ঘটে, দেশকালের বোধ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং আমাদের কালাগত সাধনমার্গগুলি মানুষকে জীবন ও জগতের আর সব ধারা ভুলে একমাত্র মুক্তিসাধনের জন্য তৎপর হতে বিধান দেবার ফলে সাধকরা নিজের মুক্তিভাবনা ভিন্ন আর কোন চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়না। সুভাষের সত্তার গঠন যদি সাধারণ মানুষের মতো হত তবে

তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা তাঁকে মুক্তিকামী ব্যক্তিকেন্দ্রিক যোগী বা ভক্তে পরিণত করত। কিন্তু তাঁর শৈব সত্তা ও শৈব চেতনা তাঁকে তা হতে দেয়নি। তিনি চিন্তা করলেন, যে ঈশ্বরলাভের জন্য তিনি এত ব্যাকুল, সেই ঈশ্বর আছেন জগতের সর্বত্র, সর্ব জীবের মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তির আবেশে চোখের জল ফেললেই তাঁর পূজা সম্পূর্ণ হয় না, এই বিশাল জীবজগতের সেবা করাও দরকার। স্বামীজীর সেই যে উক্তি, 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা,—সুভাষের হৃদয়ের আকুতি এই আদর্শকে বরণের মধ্যেই রূপ পেল। কিন্তু জীব বলতে আরও স্পষ্টভাবে তিনি মানবজাতিকেই বুঝলেন, এবং তাঁর স্বদেশ সেই মানবজাতিরই অঙ্গীভূত বলে, স্বদেশের সেবাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ সাধনীয় বলে স্থির করলেন। স্বদেশ ও স্ব-সমাজ একটা বিমূর্ত জিনিস নয়, তাকে নিয়ে ভাববিলাস চলেনা, তার সম্পর্কে শুধু তত্ত্বকথা ও বাগবিস্তারের প্রয়োজন হয় না, যদি সেবা করাই উদ্দেশ্য হয় তবে সে সেবা তন্মুহূর্তে ও বাস্তব উপায়ে করা সম্ভব। সুভাষ কথার চেয়ে কাজের মানুষ ছিলেন বেশিভাবে, তাই স্বদেশের ও চারপাশের পীড়িত, আর্ত মানুষের সেবায় ব্রতী হতে তাঁর বিলম্ব ঘটেনি: যখনই যোগ ও ভক্তি সাধনার সঙ্গে মানবসেবাকেও ঈশ্বরলাভের জন্য তপস্যার একটি অঙ্গ বলে তিনি স্থির করে নিয়েছিলেন, তারপর বাস্তবে সে চিন্তাকে রূপ দিতে আর তিনি ইতস্ততঃ করেননি।

বাড়িতে ভিক্ষুক, ফকির, সাধু যে আসত, সুভাষ যা জোগাড় করতে পারতেন মুক্ত হস্তে তা তাদের দিয়ে দিতেন। এই দানে তাঁর ছিল অপরিসীম তৃপ্তি। মাঝে মাঝে চকিতভাবে এই অনুভূতি তাঁর হত যে তিনি জগতে শুধু দানই করতে এসেছেন, গ্রহণ করতে আসেননি। সব দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান আত্মদান, এবং তাও নিঃশেষে ও বিনাশর্তে—একথাও অনুভব করতে বেশিদিন তাঁর বিলম্ব হয়নি।

ষোল বছরে পা দেবার আগেই, অর্থাৎ স্কুলে পড়ার শেষ দিকে

তিনি গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কটক শহরের কাছেই কোনো কোনো গ্রামে তাঁরা সদলবলে যেতেন এবং গ্রামবাসীদের সেবা করার উপায় খুঁজতেন। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে গিয়ে বালক-বালিকাদের পড়াবার অনুমতি চাইতেন তাঁরা; স্কুলের শিক্ষকরা সানন্দে সে অনুমতি দিতেন, গ্রামের লোকেরাও তাতে খুশি হত। কিন্তু কোনো গ্রামে ঢুকলে আবার ফল হয়তো হত বিপরীত। শহরের বাবুদের ছেলেরা দলবদ্ধ হয়ে গ্রামে ঢুকছে দেখে গ্রামের লোকরা সন্দেহ পরায়ণ হয়ে উঠত, তারাও দূরে দাঁড়িয়ে একত্রিত হত ও নবাগতদের প্রতি লক্ষ্য করত;—বাবুরা যত এগিয়ে আসত, তারাও আস্তে আস্তে তত পিছনে হঠে সরতে আরম্ভ করত। তারপর তাদের সঙ্গে কথাবার্তা স্বরু করাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠত, কারণ সে সুযোগই তারা দিত না। বাবুরা যে বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে, সেবার মনোভাব নিয়ে আসছে, সেকথা তারা বিশ্বাস করত না; কারণ এ অভিজ্ঞতা ছিল তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন। শহরের বাবুরা যে নিঃস্বার্থভাবে তাদের দরদে-দরদী হতে পারে এ ছিল তাদের কল্পনারও বাইরে। সুভাষের দল ক্রমে বুঝতে পারল গ্রামবাসীদের এই সন্দিগ্ধ মনোভাবের হেতু কী। ইতিপূর্বে বাবু যাঁরা এসেছেন গ্রামে, তাঁরা হয় এসেছেন রাজস্ব আদায়ের জন্য বা ঐ ধরণের কোনো প্রাপ্য আদায় করতে,—এবং সব সময়ই তাঁরা রূঢ় ও পীড়নমূলক ব্যবহার করে গেছেন; বহুকালের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে নবাগত শহরবাসী মাত্রকেই গ্রামের লোকরা সন্দেহের চোখে দেখতে শিখেছে। সুভাষের দলকেও গ্রামের লোকরা অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুভাবে নেয়নি, নিয়েছে শত্রুভাবে। সুভাষের পক্ষে এই অভিজ্ঞতা লাভ সেই সময়েই শেষ হয়নি, গ্রামসেবা করতে পরেও যখন গেছেন তখনও এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়েছে। কিন্তু প্রথম প্রথম এই অভিজ্ঞতা তাঁর মর্মান্তিক দুঃখের কারণ হয়েছিল।

স্কুল জীবনের শেষ দিকে রাজনৈতিক একটি গোষ্ঠীর সঙ্গেও সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ধীরে ধীরে কীভাবে বিকশিত হয়েছিল ইতিপূর্বেই সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিন্তু র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে আসার পরও ইংরেজ রাজত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য জানাতে বেশ কিছুকাল তাঁকে দেখা গিয়েছিল। ১৯১১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে একটি রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন। অন্তরের সায় এতে তাঁর কতখানি ছিল বলা যায় না, কেননা রচনাটি উৎরায়নি। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতভ্রমণে এসেছিলেন,--বড়দিনের সময় ছিলেন কলকাতায়। জানকীনাথ সপরিবারে কলকাতায় এসেছিলেন রাজদর্শনে, রাজাগমন উপলক্ষে অপরূপ সাজে সজ্জিতা কলকাতা মহানগরীকে দেখাও ছিল তাঁদের ইচ্ছা। সুভাষ খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁর সেবারের কলকাতা ভ্রমণ সাঙ্গ করেছিলেন— ব্রিটিশ রাজার আগমনকে একটুও সমালোচনার চোখে দেখেননি। দশ বছর পর ১৯২১ সালে প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতাগমন উপলক্ষে এই সুভাষই হবেন বিক্ষোভান্দোলনের অন্যতম পরিচালক ; —কলকাতায় হরতাল ও ধর্মঘট অনুষ্ঠানের তিনিই হবেন অন্যতম প্রধান সংগঠক।

১৯১১ সালের আগেই দেশপ্রেম তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছিল, কিন্তু রাজদ্রোহিতার ভাব তাঁর মনে দেখা দেয়নি। বাড়িতে নিজের ঘরে দেশের শহীদ ও নেতাদের ছবি কেটে দেয়ালে টানিয়ে মনে মনে তিনি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতেন, কিন্তু একদিন যখন তাঁদের আত্মীয় একজন পুলিশ অফিসার বন্ধু বাড়িতে বেড়াতে এসে ছবিগুলি দেখতে পেয়ে জানকীনাথের নিকট ঐভাবে ছবি রাখা সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ও জানকীনাথ সমস্ত ছবিগুলিই বালকদের গৃহে অনুপস্থিতিকালেই সরিয়ে ফেলেছিলেন,

তখন সুভাষ ঘরে ফিরে সমস্ত ব্যাপারটি জানতে পেরে দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করেননি, নীরবে দেশপ্রেমিকদের ছবির অপসারণ ব্যাপারটি মেনে নিয়েছিলেন। সুভাষের রাজনৈতিক চেতনা তখনো বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেনি।

কিন্তু ১৯১২ সালে একটা অভাবিত যোগাযোগ ঘটার ফলে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। সে বছর হেমন্তকুমার সরকার, তাঁর সমবয়স্ক একটি কিশোর, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে যে তাঁর সমান ক্লাসেই পড়ত,—হঠাৎ কটকে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল। আর সেই সাক্ষাতের ফলেই সুভাষের সামনে একটা ভিন্ন জগতের দরজা খুলে গিয়েছিল। হেমন্তবাবুর নিজের বর্ণনাই উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"শারদীয়া সপ্তমীর সুপ্রভাত। ইংরেজী ১৯১২ সালের একটি সকালে নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘরাশি অলসভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। কটক সহরের উড়িয়া বাজার পল্লীতে অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলি মশায়ের বৈঠকখানায় বসে আছি। এমন সময় একটি গৌরবর্ণ কৃশাকৃতি তরুণ কিশোর এসে তার ছোট্ট করদুটি জোড় করে নমস্কার করল। আমি অবাক হয়ে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে চিত্রাপিতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রভাতের শিশিরস্নাত কুসুমের মত তার পবিত্র মুখখানি, চোখে সোনার ফ্রেম্-দেওয়া চশমা, গায়ে ফিকে নীল রঙের বরফি-কাটা ছিটের লম্বা কোট, তার উপরে একখানি পাট করা সাদা চাদর, পরণে ধুতি এবং গায়ে কালো রঙের ফিতে-আঁটা সু। এই মূর্তি দেখে আমি মনে করলাম যে-মানুষ আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—এই সে। ভাবের আবেগে আমি তাকে প্রতি-নমস্কারটি পর্যন্ত করিনি। কিন্তু মুহূর্তের অবসরে তার পায়ে আমার জীবন নিবেদন করে দিয়ে মনে মনে অনুভব করলাম, এই সেই বালকবেশী মহাপুরুষ যে একদিন নিজের চরিত্র মহিমায় ও কর্মগৌরবে ভারতের মুক্তি আনবে।

অনেকক্ষণ পরে সুভাষ বললো, "মাষ্টারমশায় লিখেছেন—তুমি আমাদের বাড়িতে উঠবে, তা ওঠনি কেন ?"

আমি বললাম,—"ভাই, তোমরা বড়লোক যে আমার মত গরীবের সেখানে উঠতে ভয় করে।"

তার চোখ ভিজে উঠলো—"বড়লোকের ঘরে জন্মেছি বলে তুমি আমায় খোঁটা দিলে, আমার কি অপরাধ বলতো ভাই ?"

তারপরে দুজনে বসলাম কথা কইতে। সে কথা বহুদিন বহুমাস বহু বৎসরেও শেষ হয়নি।

এই কিশোরটি সুভাষচন্দ্র, আর এই মাষ্টারমশায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস।.......আমার বয়েস তখন বছর পনেরো। সুভাষেরও তাই। কৃষ্ণনগরে এসে বেণীবাবুর (বেণীবাবু কটক থেকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বদলি হয়ে এসেছিলেন) স্নেহদৃষ্টি আমার আমার উপর পড়লো। আমার শরীর ভালো না থাকায় তিনি পুরীতে চেঞ্জে যাওয়ার জন্যে আমার হাতে সুভাষকে একখানা পত্র দিয়ে কটকে পাঠালেন। আমার সম্বন্ধে পত্রখানিতে লেখা ছিল—A minute's talk will reveal to you his character. পুরীতে সমুদ্রের ধারে আমার থাকার ব্যবস্থা করতে তিনি সুভাষকে অনুরোধ করেছিলেন।

কিন্তু এটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি চেয়েছিলেন সুভাষের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ মেলামেশা। এবং সেই মেলামেশার মধ্য দিয়ে একটি যুগ্ম জীবন ধারার সৃষ্টি।.......

সুভাষের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ক্লাসের পড়াশুনা থেকে আমার মন উঠে গিয়েছিল। নূতন জীবনের আস্বাদে ও কল্পনার রঙীন নেশায় আমি একেবারে মশগুল হয়ে পড়েছিলাম।

প্রথম যেদিন সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল—সে-ও দৈনন্দিন জীবনের আচরিত পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। কখনও যে সকালে বাড়ির বার হয়না, সে দুপুর পর্যন্ত আমার সঙ্গে কুথায়

বিভোর হয়ে থাকলো। স্নেহময়ী মা তার জন্য খাবার নিয়ে বসে আছেন স্মরণ হওয়ায় সে দুপুরে বাড়ি ফিরে খাওয়া শেষ করেই আমার কাছে এল।

"জন্মতো : অক্রমেণ" গল্প করতে করতে অধিক রাত হয়ে গেল— আমরা হাঁটতে হাঁটতে জ্যোৎস্না প্লাবিত কাঠগুড়ি নদীর বাঁধের উপর বেড়াচ্ছিলাম। চারদিন কটকে থেকে ৺বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় সুভাষের নিকট বিদায় নিয়ে পুরী গেলাম।"

(হেমন্তকুমার সরকার : সুভাষেব সঙ্গে বারো বছর, পৃঃ ২—৫)

হেমন্তকুমার কটকে গিয়েছিলেন বেণীবাবুব কথায় বটে, কিন্তু কলকাতার একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দূত হিসাবেও তিনি সুভাষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবেছিলেন। এই গোষ্ঠীটি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। সুভাষ নিজেই লিখেছেন যে হেমন্তকুমারের কথায় তিনি অভিভূত হয়েছিলেন এবং কলকাতার সেই রাজনৈতিক গোষ্ঠীটির সঙ্গে যুক্ত হতে তিনি বাজিও হয়েছিলেন। এই যোগাযোগ তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকে তীব্র করার পক্ষে অনুকূল হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের স্কুল জীবন ক্রমেই পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে গেল। লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিলনা। স্কুলের শিক্ষকরা মনে করতেন যে তিনি মাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম দশটির মধ্যে একটি স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হবেন এবং তাব ফলে স্কুলের মর্যাদা বাড়বে। বাবা-মারও খুব আশা ছিল তাঁর সম্পর্কে। কিন্তু যখন সবাই দেখলেন যে সুভাষের মাথায় ক্রমেই উদ্ভট চিন্তার বাসা বাঁধছে, ক্রমেই তিনি নিজের খেয়াল অনুসারে চলাফেরা করছেন ও গুরুজনদের অবাধ্য হয়ে গেছেন তখন। সকলেই প্রায় তাঁর সম্পর্কে আশা হারিয়ে ফেলেছিলেন। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে তিনি ইচ্ছা মতো ঘুরে বেড়াতেন, ঘরে প্রায়ই থাকতেন না, রোগীর সেবা করা, গ্রামে ছাত্র পড়ানো, সাধু যোগী খুঁজে বেড়ানো, যোগ সাধনা করা—ইত্যাদি নানা

খেয়াল মেটাতেই তাঁর সময় কেটে যেত, পড়াশোনার অবসরই মিলত না।

তাঁর মধ্যে যে চিরন্তন বিদ্রোহী লুকিয়ে ছিল সে তখন মাথা তুলতে সুরু করেছে। সুভাষ প্রচলিত সকল ব্যবস্থাকেই প্রশ্ন করতে লাগলেন ও যা কিছু মিথ্যা ও অন্যায় মনে হল তারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। সাধু সন্ন্যাসীকে তিনি পছন্দ করতেন, কিন্তু সাধু যদি গৃহী হয় তাহলে তাঁকে তিনি পছন্দ করতেন না। ধর্ম তাঁকে আকর্ষণ করত, কিন্তু ধর্ম যেখানে ভীরুতা ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় সেখানে তিনি ছিলেন তার ঘোর বিরোধী। বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সেই পরম বাণী—অভীঃ, ভয়শূন্য হও। যা কিছু মনকে ক্ষুদ্র করে, দুর্বল করে, সঙ্কীর্ণ করে তিনি তা-ই কঠোরভাবে পরিহার করতেন। একদিন তাঁর একজন বন্ধু তাঁকে দুপুরে তাঁদের বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করে। তারা নিম্ন বর্ণভুক্ত ছিল বলে প্রভাবতী দেবী সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সুভাষকে নিষেধ করেন। সুভাষ মাকে দুঃখ দিতে কাতর হতেন, কিন্তু সেদিন মায়ের নিষেধ-বাক্য অগ্রাহ্য করে তিনি বন্ধুর বাড়িতে অন্নগ্রহণ করে এসেছিলেন। অবাঙালী বা মুসলমান বলেও কাউকে তিনি পৃথক জ্ঞান করতেন না। বহু অবাঙালী ও মুসলমানের সঙ্গে স্কুলে পড়া কালেই তাঁর সখ্যতা জন্মেছিল। মহরম প্রভৃতি মুসলমানদের অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতেন। তাঁর বাবা জানকীনাথও ছিলেন উদার, সমদর্শী, অসাম্প্রদায়িক।

জীবনের কৈশোর পর্বে সুভাষ একটা দৃঢ় প্রত্যয় ও সমুচ্চ আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন। স্থির, অটল চিত্তে তিনি সেই আদর্শের অনুসরণ করতে সুরু করে দিয়েছিলেন। কোনো বাধা নিষেধ, প্রলোভন বা হৃদয় দৌর্বল্য তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারেনি। আত্মবিশ্বাসে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কারণ এই সময়েই নিজেকে তিনি চিনতে সুরু করেছিলেন। তিনি যে গড্ডল ধারায় গা ভাসিয়ে দিতে

আসেননি, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছেন, তাঁর যে জীবনের একটা সুনির্দিষ্ট গতি ও লক্ষ্য আছে, একথা তিনি বুঝেছিলেন। সেই লক্ষ্যের উপযুক্ত হবার জন্য অতি সযত্নে ও সতর্কভাবে নিজেকে তিনি গড়ে তুলছিলেন। তাঁর সমস্ত আচরণ ও কর্ম ছিল তদভিমুখী —কোনো উদ্দাম, অসংযত কল্পনা বা অসম্বদ্ধ খেয়ালের বশে তিনি চালিত হননি। বয়োজ্যেষ্ঠরা এখানেই তাঁকে বুঝতে ভুল করেছিলেন। কিন্তু যে নিজেকে চিনতে পেরেছে অন্যের ভুল বোঝা তাঁকে দোলায়িত করতে পারেনা। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে এসে সুভাষের স্কুলজীবন যখন শেষ হল তখন প্রকৃতপক্ষে জড়তার ও অজ্ঞানতার একটা আবরণ তাঁর চিত্ত থেকে খসে গেল। তাঁর দৃষ্টি তখন স্বচ্ছ, উদার ও মোহমুক্ত। দূরদিগন্ত বিসারিত পথে তাঁর নিঃসঙ্গ যাত্রা সুরু করার জন্য তিনি তখন দেহে মনে প্রস্তুত। স্কুলের অধ্যায় শেষ হল, শেষ হল কটকের নিভৃতবাসের পর্ব। এবার যেতে হবে কলকাতায়—ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায়। সেখানে জাতীয় জীবনের বিপুল বিস্তৃত ধারার সঙ্গে নিজের জীবনকে একসূত্রে গাঁথতে হবে—সেই ধারার মধ্যে দাঁড়িয়েই আবার তাঁকে আত্মস্থও হতে হবে। তারপর একদিন নব যুগে, ঘোরতর সংগ্রামের মধ্যে, সুভাষ জাতির পরিচালক রূপে উদিত হবেন। দেশ ও কালের নতুন পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চরিত্রের সেই নবতর বিকাশ আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করব। কারণ তাঁর জীবনের আলোয় আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশ রহস্যকেও অনুধাবন করা সহজ হবে। সহজ হবে আমাদের আত্ম-পরিচয় আবিষ্কারের কাজ। লোকোত্তর পুরুষের জীবনকাহিনী আলোচনার তা-ই হয়তো সার্থক ফলশ্রুতি।

গ্রন্থপঞ্জী

Subhas Chandra Bose : An Indian Pilgrim

সুভাষচন্দ্র বসু : পত্রাবলী

R. C. Majumdar : History of Bengal

R. C. Majumdar : History of the Freedom Movement in India

R. C. Majumdar : British Paramountcy and Indian Renaissance

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা দেশের ইতিহাস

Tapan Kumar Roy Choudhury : Bengal Under Akbar and Jahangir

Ramkrishna Mukherjee : The Rise and Fall of East India Company

Ram Gopal : How the British Occupied Bengal

Bhupendra Nath Duttt : Indian Social Polity

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি

S. K. Das : The Economic History of Ancient India

K. K. Datta : Alivardi and His Time

R. P. Tripathi : Some Aspects of Muslim Administration

W. H. Carey : The Good Old days of Honourable John Company

H. G. Rainey : The Historical and Typographical Sketch of Calcutta

C. G. Nicholls : Field Book of Survey of a Part of Calcutta

Lokenath Ghosh : The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars

N. K. Sinha : The Economic History of Bengal

নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব
বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য
Lieut.-Col. Alexander Dow : The History of Hindostan
State of the English Government in Bengal
H. Verelst : A View of the Rise, Progress and Present
Vincent Smith : Akbar the Great Mogul
Encyclopaedia Britannia, Vol-VII
The Amrita Bazar Patrika
The Statesman
The Englishman
The Bengalee
স্বামী গম্ভীরানন্দ : যুগনায়ক বিবেকানন্দ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী
Sophia Dobson Collet : The Life and Letters of Raja Rammohon Roy, edt. by Biswas and Ganguly
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : রামমোহন ও শিল্পবিপ্লব
সাহিত্য সাধক চরিতমালা
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী
নবীনচন্দ্র সেন : নবীনচন্দ্র রচনাবলী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম গ্রন্থাবলী
Swami Vivekananda : The Complete Works of Swami Vivekananda
স্বামী বিবেকানন্দ : পরিব্রাজক
Sister Nivedita : Complete Works of Sister Nivedita
শ্রীম : শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
রাজা রামমোহন : রামমোহন গ্রন্থাবলী
গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী : শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ
গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী : ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ

হেমন্তকুমার সরকার : সুভাষের সঙ্গে বারো বছর
সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় : সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
প্রভাত কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লবের খসড়া
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী : জেলে ত্রিশ বছর
Kali Charan Ghosh : The Roll of Honour
Tarachand : History of the Freedom Movement in India
A. K. Majumdar : Advent of Independence
Valentine Chirol : Indian Unrest
O' Donnell : The Causes of Present Discontent of India.
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ : কংগ্রেস
হেমচন্দ্র কানুনগো : বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা
বিপিনচন্দ্র পাল : সত্তর বছর
Bipin Chandra Pal : Memoirs of My Life and Times
Bipin Chandra Pal : Swadeshi and Swaraj
Bipin Chandra Pal : Writings and Speeches
Surendra Nath Banerjee : A Nation in Making
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ : অগ্নিযুগ
যদুগোপাল মুখার্জি : বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি
Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee :
Sri Aurobindo's Political Theory